মাইকেল ওয়াইজ ■ হাসসান হাসসান

অনুবাদ: রাকিবুল হাসান

ISIS
ইনসাইড দ্য আর্মি অব টেরর

মাইকেল ওয়েইজ

হাসসান হাসসান

অনুবাদঃ রাকিবুল হাসান

অনুবাদকের কথা

বইটি কার জন্য? যদি আপনি আন্তর্জাতিক ঘটনা অনুসন্ধানে ব্রতী হন, কোন ঘটনার পর কোনটা, তো বইটি আপনার জন্য নয়। দুঃখিত। হ্যাঁ, আপনি যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আগ্রহী হন, তবে এই মুহূর্তে আপনার হাতে বিশ্বসেরা বইগুলোর একটি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলোয়াড়রা কিভাবে খেলে, কী দেখে সিদ্ধান্ত নেয়, কেমন সিদ্ধান্ত নেয়—সেসবের বিদঘুটে, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং একই সাথে জটিল দিকগুলো লেখক তুলে এনেছেন দারুণ মুনশিয়ানায়, ঝরঝরে গদ্যে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় বললে ISIS/আইএস একুশ শতকের প্রধান রাষ্ট্রহীন খেলোয়াড়দের একজন। বিষয়টি খুবই মজার। আইসিস নিজেকে রাষ্ট্র হিসেবে দেখে এবং একারণেই নিজেকে অন্যান্য দল ও গোষ্ঠির চেয়ে আলাদা ভাবে। এজন্য এদের নামের ভেতরও 'স্টেট' (রাষ্ট্র) শব্দ ব্যবহার করেছে যা আল কায়েদা, তালেবান কিংবা অন্যকোনো দল করেনি। কিন্তু বিশ্ব আইসিসকে স্টেট হিসেবে মানতে নারাজ, একে বরং রাষ্ট্রহীন হিসেবেই বিবেচনা করে। এই প্রবণতায় লুকিয়ে আছে আইসিস বনাম বিশ্বের দ্বৈরথের সূত্র।

আইসিসের উত্থানের স্বর্ণযুগ ছিল ২০১৩-২০১৪, কিন্তু এর বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত। জর্দানি যুবকদের এক দলের সাথে আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে অংশ নিতে আসা টগবগে তরুণ আবু মুসআব জারকাবি বুকে উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন নিয়ে আফগানিস্তানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আইসিসের বীজ রোপিত হয়েছিল। অঙ্কুরোদগম ও বিকশিত হতে পরবর্তী সময়টুকু লেগেছে।

তারপর বহু চড়াই-উৎরাই, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে আইসিস আজকের আইসিস হয়ে উঠেছে। কেমন ছিল সেসব বাঁকগুলো, কীভাবে তা বদলে দিয়েছে আইসিসকে, সাথে বিশ্বকে, সেসবের অন্তর্ভেদী বর্ণনা উঠে এসেছে এ বিশ্লেষণধর্মী বইয়ে।

দুজন লেখকই সিরিয়ার। দুজনই আইসিস-উত্থানের প্রত্যক্ষদর্শী। তাছাড়া হাসসান হাসসান বর্তমান সিরিয়া সংকট বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের একজন। আমার বিবেচনায় লেখকের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে নির্মোহ-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ যা কয়েক ধাপে ফিল্টারিং হয়ে আসা 'মূলধারার' মিডিয়ায় অনুপস্থিত। কারণ, সত্যটা সত্যের মতো করে বলতে, নিজের এজেন্ডার বিরুদ্ধে গেলেও অবিকৃত তথ্য উপস্থাপন করতে বুকের পাটা লাগে, নিখাঁদ সততা লাগে।

এটি আমার প্রথম অনুবাদ। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি সহজ ও সুখপাঠ্য করতে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে মৌলিকত্ব বিসর্জন দেয়া হয়নি। মূল বইয়ের তথ্যে কোনো কাটছাঁট, গ্রহণ-বর্জন করা হয়নি। সব ঠিক রেখেই চেষ্টা করেছি বইটি যেন 'অনুবাদ' না হয়ে বরং 'বই' হয়ে উঠে। সফলতা-ব্যর্থতার পরিমাপ পাঠকের ভাগে।

সামনে সুদীর্ঘ পথ। স্বপ্ন ভীষণ বড়। উপায়-অবলম্বনহীন, পাথেয়হীন, রিক্তহস্ত আমার একমাত্র পুঁজি মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ। দোয়ায় স্মরণ রাখার অনুরোধ করছি।

–রাকিবুল হাসান
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকের কথা

ISIS : ইনসাইড দ্য আর্মি অব টেরর এমন এক বই যার ভূমিকা পড়েই আপনি চমকে উঠবেন। আপনার ভেতরে তৈরি হবে গ্রহণ-বর্জনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এরপর যখন আপনি বইয়ের মূলপাঠে প্রবেশ করবেন, আপনি বুঝতেই পারবেন না কীভাবে বইয়ের অক্ষর আপনাকে কোথা থেকে কোথা নিয়ে যাচ্ছে।

বইটি পাঠ করার আগে পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, বইয়ের একেবারে শেষ বাক্যটি না পড়া পর্যন্ত বই নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসবেন না, কোনো মন্তব্য করা থেকেও বিরত থাকবেন। এ বইটিই এমন, যার প্রতিটি অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি অধ্যায় যেন প্রাসাদের একেকটি দেয়াল, একটি দেয়াল যার ভেঙে পড়লে পুরো প্রাসাদটিই ধসে পড়বে। এ কারণে বইটি পাঠ করতে হবে ভাবাবেগ বর্জন করে, কিছু তথ্য ও ঘটনা হয়তো আপনাকে আপনার পুরোনো বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে।

আমরা বাংলাদেশের অখ্যাত কোনো পাড়াগাঁয়ে বসে পৃথিবী আর বিশ্বরাজনীতি নিয়ে যে অলীক কল্পনার পাখনা মেলি, মূলত বাস্তবের পৃথিবী অনেক বেশি রূঢ়, অনেক বেশি জটিল। দুঃখজনক বিষয় হলো, সেই পৃথিবী আমাদের কল্পনার কোনো তোয়াক্কা করে না।

বইটির অনুবাদক রাকিবুল হাসানের এটি প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। কিন্তু বইটি পড়ার পর এ কথা আপনি নিঃসঙ্কোচে বলবেন, এটি কি সত্যিই অনূদিত গ্রন্থ, নাকি রাকিবুল হাসান নিজেই লিখেছেন?

আমরা অনুবাদকের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

–আসাদুল্লাহ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নবপ্রকাশ

পিডিএফ প্রস্তুতকারী

এই বইয়ের পিডিএফ ইমেইজ থেকে থেকে করা হলো। এটা সম্পূর্ণ নতুন রূপে কম্পোজ করার করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এটা অনেক সময়ের ব্যাপার। এই বইয়ের জন্য এতো বেশী সময় দেয়া আমার কাছে উচিত মনে হয়নি। তাছাড়া এই বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা ঠিক রাখার স্ক্যানকপি দেয়া হয়েছে।

পিডিএফ প্রস্তুতকারীঃ-
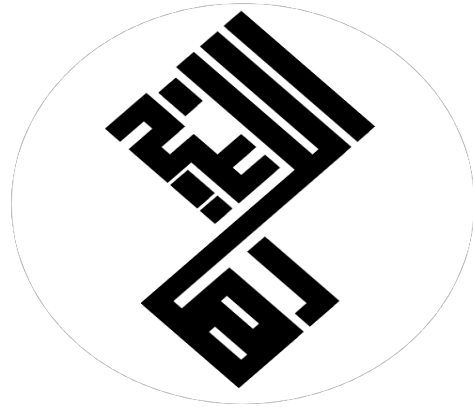
Content Zone
https://t.me/HitContent_2021
আল ইরহাবিয়্যাহ মিডিয়া
https://t.me/al_erhaibiah

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা

২০১১ সালের শেষ দিকে আবদুল আজিজ কুয়ান তার চাচাকে বলেছিল, তাকে রিয়াদ আল আসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। রিয়াদ আল আসাদ সিরিয়ান এয়ারফোর্সের একজন কর্নেল। বিপ্লবের শুরুতেই তিনি বাশারের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। আবদুল আজিজ বাহরাইনের ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর। সিরিয়ার সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। বাবা-মায়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই সে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল।

২০১২ সালের শুরুর দিকে সে ঘর পালায়। প্রথমে ইস্তাম্বুল, সেখান থেকে অন্যান্য বিদেশি যোদ্ধার মতো ১৩ ঘণ্টার বাস জার্নি করে তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্তের রেইহানলি শহর। তারপর সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে আলেপ্পোর বর্ডার ক্রস করে পা রাখে স্বপ্নের সিরিয়ায়। আলেপ্পোতে তখন বিপ্লবীদের শাসন।

কয়েক সপ্তাহ একটি মডারেট বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে লড়াইয়ে অংশ নেয়। কিন্তু তাদের দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা দেখে সে দল ত্যাগ করে। একে একে বহু ইসলামি গোষ্ঠীর সঙ্গে ভিড়ে। আহরার আশ-শাম, আল কায়েদার সিরিয়ান শাখা—জাবহাতুন নুসরা, সবগুলোতেই কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। নির্ভীক ও ধর্মপ্রাণ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পায় সে। এসব সত্ত্বেও একসময় কোনো কারণে তার মোহমুক্তি ঘটে। পাশাপাশি বাবা-মাও চাপ দিচ্ছিলেন বাহরাইনে ফিরতে। ২০১২ সালের শেষ দিকে সে বাড়ি ফিরে যায়। মা সন্তানকে হাতের নাগালে পেয়ে সর্বপ্রথম যে কাজটা করেন, তার পাসপোর্ট নিয়ে নেন।

'বাহরাইনের রাস্তায় হাঁটলে নিজেকে কারাবন্দী মনে হয়,' বছরখানেক পর এভাবেই লেখকের সঙ্গে তার অনুভূতি বলছিল। অ্যাডভেঞ্চারাস, টানটান উত্তেজনাকর যুদ্ধের দিনগুলো তাকে এখনো ভীষণ টানে। 'আমার দমবন্ধ লাগে, মনে হয় সর্বদা কেউ নজরদারি করছে। জগৎ-সংসার তুচ্ছ মনে হয়। আমি মুক্তবিহঙ্গের মতো থাকতে চাই। আমি আবার রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে চাই। মানুষ শাহাদাতের তামান্নায় জীবন উৎসর্গ করছে। সেটাই তো সম্মানের জীবন।'

আবদুল আজিজ কুয়ানের পরিবার ১৯৮০-এর দশকে পূর্ব সিরিয়া থেকে বাহরাইনে এসেছিল। সচ্ছল জীবনের সব উপকরণই বাবা তাকে দিয়েছিল। 'তার

বাবা তাকে খুব আদর-যত্নে বড় করেছে,' এক আত্মীয়ের স্মৃতিচারণা। 'তাকে কোনো কিছুর অভাব বোধ করতে দেয়নি। সমাজের উচ্চাসনে দেখতে চেয়েছিল।' সেই আত্মীয়ের ভাষায় আবদুল আজিজ ছিল শান্তশিষ্ট, মার্জিত ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন।

তার মাকে পটিয়ে পাসপোর্ট পুনরায় হাতিয়ে নেওয়ার আগে তিন মাস বাহরাইনে ছিল সে। পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার তিন দিন পরই সিরিয়ার উদ্দেশে চম্পট দেয়। এবার যোগ দেয় ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড শামে (আইসিস)। এটি ছিল তখনকার সবচেয়ে সংগঠিত, শক্তিশালী ও উদীয়মান বিদ্রোহী গ্রুপ। পরবর্তী সময়ে আবদুল আজিজ বলেছিল, বাহরাইনে থাকতেই আইসিসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার, তাদের কিছু সদস্যের সঙ্গে স্কাইপ আলাপও হয়েছিল। আইসিস-মতাদর্শী ইসলামিক দলগুলোর সঙ্গে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কাজে এসেছে। এ ছাড়া আইসিস ছিল বিদেশি যোদ্ধাদের আখড়া। ধীরে ধীরে আইসিসে আবদুল আজিজের উত্থান ঘটে। প্রথমে সে স্থানীয় আমির ও অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। পরে সংগঠনের বার্তা আদান-প্রদান ও স্বীয় আমিরের পক্ষে মৌখিক বাইয়াত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে।

২০১৪ সালের গ্রীষ্মে আইসিস সিরিয়া ইরাকের বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেয়। তখন সে সিরিয়া-ইরাক সীমান্তবর্তী শহর আলবু কামালে তিনটি এলাকার নিরাপত্তাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পায়। এই শহরটি ছিল তার মতো বিদেশি যোদ্ধাদের প্রবেশপথ। আইসিসে এসে আবদুল আজিজ নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করে। সে নিজেকে আবিষ্কার করে লড়াকু, নিষ্ঠুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিসেবে।

দাসী হিসেবে তার ঘরে ছিল রূপসী এক ইয়াজিদি কন্যা, এগুলো ছিল ইরাকি কুর্দি পেশমেরগা ও অন্য কুর্দি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিয়া-ইরাক সীমান্তে সিনজার যুদ্ধে তার সাহসিকতার পুরস্কার। আইসিসের ম্যাগাজিন দাবিকের ভাষ্যমতে, সিনজার থেকে হস্তগত দাসীদের এক-পঞ্চমাংশ কেন্দ্রীয় নেতারা ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়, অবশিষ্টগুলো যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে আবদুল আজিজের মতো উঠতি নেতাদের ভাগে যায়।

সে আমাদেরকে তার 'সাবিয়্যাহ' অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ দাসীর একটি ছবি দেখিয়েছিল। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ এক মেয়ে। আইসিস নেতাদের হাতে যাওয়ার আগে মেয়েটি আবদুল আজিজের নিকট এক মাসের মতো ছিল। যৌনদাসী গ্রহণ সত্ত্বেও তার ধর্মাচার ও নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছে—এমনটা সে মনে করত না। তার এক সহযোদ্ধা জানায়, সংবাদ প্রচারের সময় সে টিভি পর্দা ঢেকে রাখত, যেন সংবাদপাঠিকাদের চেহারা দেখা না যায়। অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে কোরআন-

হাদিস পাঠ করত। উৎসাহভরে ‘দাওলা’র (আইসিসের স্টেট বা খিলাফাহভুক্ত অঞ্চল) কথা বলত।

যদি তার বাবা জাবহাতুন নুসরার সদস্য হতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের দেখা হতো তবে সে কী করত—এই প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব—‘আমি তাকে হত্যা করব।’ আবু ওবায়দা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। যে কেউ দাওলার দিকে হাত বাড়াবে, আমি তার হাত গুঁড়িয়ে দেব। বাহরাইনি আর্মি কিংবা সিকিউরিটি ফোর্সে কর্মরত তার আত্মীয়স্বজনকে সে মুরতাদ বলে অভিহিত করত। কারণ বাহরাইন আইসিসের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর আক্রমণে অংশ নিয়েছে।

সিরিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগে সে সৌদিতে এক বছর ইসলামি শরিয়ার ওপর পড়াশোনা করেছিল। হাইস্কুল থেকে ঝরে সৌদি চলে যায়। মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে এক বছরের শরিয়াহ কোর্স করে। তার পরিবারের এক সদস্যের ভাষায়—কোর্সের পর থেকে ধর্মকর্ম করে না এমন বন্ধুদের সে এড়িয়ে চলত। কদিন বাদেই আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুন্নি মুসলিমদের দুর্দশা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। জিহাদি কথাও শোনা যেত মাঝে মাঝে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সে অষ্টম আব্বাসি খলিফা মু’তাসিম বিল্লাহর নামানুসারে আবু মু’তাসিম উপনাম ধারণ করেছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী কর্তৃক এক নারীকে অবমাননার প্রতিশোধ নিতে মু’তাসিম বিল্লাহ বিশাল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, ইতিহাসে এই ঘটনা খুবই বিখ্যাত। আবদুল আজিজ বলত, সিরিয়া-ইরাকে সুন্নি নিপীড়নের প্রতিশোধ নিতে সে আব্বাসি খলিফার অনুকরণ করবে। তাই নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পরেও সুযোগ পেলেই সে ফ্রন্ট লাইনে চলে যেত। বলত, আমি এখানে শাহাদাতের অন্বেষায় এসেছি, বসে থাকতে নয়। সুতরাং সর্বত্র আমি তা খুঁজে বেড়াব।

২০১৪ সালের ২৩ অক্টোবর সে শাহাদাত লাভ করে। দার আজজুরের নিকটবর্তী আল হাওয়িকা গ্রামে সিরিয়ান সেনাবাহিনীর স্নাইপারের গুলিতে সে প্রাণ হারায়।

সাধারণত যোদ্ধারা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরপরই তাদের অসিয়তনামা লিখে রাখে, যা তাদের মৃত্যুর পর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আবদুল আজিজ তার মায়ের নামে সেই অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। ‘আপনি হয়তো টিভিতে দেখে থাকবেন নাস্তিকদের, রাফেজিদের (শিয়াদের বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ) খুব বাড় বেড়েছে। তারা মুসলিমদের নির্যাতন, হত্যা ও অবমাননায় খুব বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আল্লাহর শপথ, আমি মুসলিম ভাইবোনদের আর্তচিৎকার সহ্য করতে পারিনি। তারা সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করছিল অথচ কেউ

তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এ অবস্থায় আমি নির্জীব হয়ে বসে থাকতে পারিনি। আমি মু'তাসিম বিল্লাহর মতো এগিয়ে এসেছি। রাসুল সা.-এর পাশে জান্নাতে এক টুকরো জায়গা আমার আজন্মলালিত স্বপ্ন। আশা করি, আপনি আখিরাতে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

***

২০১৪ সালের জুনের মাঝামাঝিতে যখন আইসিস ইরাকের নিনাওয়া প্রদেশের রাজধানী মসুলে আক্রমণ শুরু করে, বিশ্ব তখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। খুব দ্রুত তারা বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে ওঠে, যার আয়তন প্রায় গ্রেট ব্রিটেনের সমান। মাত্র এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে আইসিস ইরাকের এই কেন্দ্রীয় শহরটি দখল করে নেয়। অথচ এর সুরক্ষায় আমেরিকার প্রশিক্ষিত ৩০ হাজার ইরাকি সেনা ও পুলিশ মোতায়েন ছিল। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের হামভি সাঁজোয়া যান ও আব্রাম ট্যাঙ্ক আইসিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে বিশ্ব মোড়লদের টনক নড়ে ওঠে। এরা কারা? শুধু একটি সংগঠন? নাকি কোনো নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যদল?

আইসিসের হাতে মসুলের পতনের পাঁচ মাস আগে প্রেসিডেন্ট ওবামা নিউইয়র্কারের ডেভিড রেমনিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাদেরকে 'জায়ভি স্কোয়াড'[১] বলে অভিহিত করেছিলেন। যারা এখন প্রায় ১০০ বছর ধরে গড়ে ওঠা সিরিয়া-ইরাক সীমান্তের প্রতিরক্ষাব্যূহকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, তাদের এই বাহ্যিক ও প্রতীকী বিজয় হলো ব্রিটিশ-ফরাসি ঔপনিবেশিক চুক্তির মূলে কুঠারাঘাত করে আরব বিশ্বকে পুনরেকত্রীকরণের সূচনা। এসব কৃত্রিম সীমারেখা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির আগেই টানা হয়েছিল। 'এই অঞ্চলের মানচিত্রে আমরা পশ্চিমাদের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট রাখব না।'

এখানে থাকবে শুধু খিলাফাহ। আইসিসের স্বঘোষিত নেতা আবু বকর আল বাগদাদি বলেছিল, যদি মুসলিমরা শক্তিশালী হতো, স্পেনে পুনরায় খিলাফাহর পতাকা উড়ত। এমনকি রোমেও।

***

এটি একটি আত্মকাহিনি। লেখকদ্বয়ের একজনের বাড়ি সিরিয়ার সীমান্ত শহর আলবু কামালে, যা দীর্ঘদিন ইরাকে বিদেশি যোদ্ধাদের প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত

---

[১] মার্কিন চিত্র পরিচালক জন শ্যাপিরোর সৃষ্ট একটি চরিত্র। (অনুবাদক)

হয়েছে। অন্যজন আলেপ্পোর উপশহর আল বাবের অধিবাসী, শহরটি সিরিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামের আঁতুড়ঘর এবং গণতন্ত্রকামী সিভিল সোসাইটির কেন্দ্রস্থল। কিন্তু এখন এটি আইসিসের অধীনে শরিয়াহ আইনে শাসিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের শীত ও গ্রীষ্মকালে বিশ্বজুড়ে টিভি চ্যানেলগুলোতে বারবার উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছি—আইসিসের উত্থান কোথা থেকে? এত স্বল্প সময়ে অকল্পনীয় শক্তির উৎস কী?

জেমস ফোলিকে দিয়ে শুরু হওয়া পশ্চিমা বন্দীদের প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদের ধারা, সে সময়ের অন্যান্য ভিডিও ও স্থিরচিত্র থেকে আমরা এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পারি। তবে এখানে যে প্রশ্নটা থেকে যায়, সেটা হচ্ছে আমেরিকা প্রায় এক দশক যাবৎ আইসিসের বিরুদ্ধে লড়ছে। সময়ে সময়ে নাম পাল্টে আইসিস বিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে ছিল আল কায়েদা ইন ইরাক (একিউআই), তারপর মুজাহিদিন অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল ও সবশেষে ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক।

এটা ছিল ১৯৮৫ সালের ভিয়েতকংয়ের মতো। যারা নাম উল্টেপাল্টে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ দখলে নিয়েছিল। রিগ্যান প্রশাসন থেকে সিএনএন, সর্বত্র তাদের ব্যাপারে কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউই ঠিকঠাক পরিচয় বের করতে পারেনি। শুধু জানত, তারা একটি গেরিলা যোদ্ধা দল। আইসিস ছিল তেমনই কিংবদন্তি।

প্রথম দিকে স্বৈরতান্ত্রিক, ধর্মীয় ভাবাদর্শে উজ্জীবিত ও সর্বসংহারী এই দলকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল, যার খেসারত এখন টানতে হচ্ছে। প্রতিপক্ষ প্রতিটি দেশই তাদের আদর্শ, কৌশল ও অভ্যন্তরীণ গঠনপ্রকৃতি নিয়ে মাথা কুটে মরছে। আইসিস কি কোনো বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ? সাত মাসের অবিরাম যৌথ বিমান হামলা ও প্রক্সির ফলে তারা কি এখন ভূমি হারাচ্ছে নাকি আরও বাড়াচ্ছে? ওবামা প্রশাসনের বর্তমান ইরাক-সিরিয়া পলিসির অধীনে তাদেরকে পরাজিত করার সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের আছে? চূড়ান্তভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব? নাকি সাবেক ডিফেন্স সেক্রেটারি লিওন পেনেটার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩০ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলতে থাকবে? আফ্রিকা ও খোদ পশ্চিমের অভ্যন্তরে সেঁধিয়ে যাবে? যেমনটা জানুয়ারি ২০১৫'র প্যারিস আক্রমণে পরিস্ফুট।

আমরা আইসিসের বর্তমান রূপ ও ক্রমবিবর্তনের ধারা—দুটোই যাচাই করার চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায়গুলোতে আইসিসের জটিল ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা, কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তা, সাবেক মার্কিন সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও কূটনীতিকদের অসংখ্য সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এটি করা হয়েছে। যারা ইরাকে আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল।

মূলত আন্তর্জাতিক জিহাদিজমের বিবর্তনের চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে আইসিস। কীভাবে জিহাদ করা উচিত এবং কাদের বিরুদ্ধে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এগুলো আবর্তিত হয়েছে। যেমন শিয়া, আলাভি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী আক্রমণের টার্গেট হবে কি না? নাকি বড় শয়তান আমেরিকা ও জায়ানিস্ট ক্রুসেডের বিপক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগের লক্ষ্যে আপাতত তাদের উপেক্ষা করা হবে?

এই ধারায় সবচেয়ে কট্টরপন্থী হচ্ছে জর্ডানের নাগরিক, আল কায়েদা ইন ইরাকের (একিউআই) প্রতিষ্ঠাতা আবু মুসআব আল জারকাবি। পক্ষান্তরে তুলনামূলক সবচেয়ে উদারপন্থী হচ্ছেন তার গুরু ওসামা বিন লাদেন। ১৯৯৯-তে আফগানিস্তানে প্রথমবারের মতো জারকাবি ও বিন লাদেন মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছে আইসিস এবং আল কায়েদার রসায়ন সুখকর হবে না। তবে তাঁরা যৌথভাবে ইরাকে যুদ্ধ করেছেন। শিয়া কর্তৃক সুন্নি নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছেন এবং মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন।

এর সবই ইরান ও আসাদ রেজিমের স্ট্র্যাটেজির প্রত্যক্ষ ফলাফল। আইসিসের জন্মবৃত্তান্ত জানা ব্যতীত তাদের সমকালীন স্বরূপ উদ্‌ঘাটন মুশকিল। যদিও এটা নির্ধারণ করা খুব দুরূহ যে ইন্টারন্যাশনাল জিহাদিজমের কোন ধারাটা দিন শেষে জয়ী হবে কিংবা আদৌ কেউ হবে কি না, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে পূর্বতন মিত্র আইসিসের সঙ্গে আল কায়েদার ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ তাদের উভয়ের সঙ্গে পশ্চিমাদের বোঝাপড়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

আমরা চলমান সিরিয়া-বিপ্লবের সুলুকসন্ধানে সচেষ্ট। দেখতে চেষ্টা করব কীভাবে আসাদ সরকার দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার দোরগোড়ায় (ইরাকে) আল কায়েদাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। আবার কদিন পর নিজেকেই বিশ্ব দরবারে আল কায়েদা আক্রান্ত ভিকটিম হিসেবে চিত্রিত করেছে, পাশাপাশি খাল কেটে সন্ত্রাসবাদের এই কুমির সিরিয়ার অভ্যন্তরে নিয়ে গেছে, পেলে-পুষে হৃষ্টপুষ্ট করেছে। সবশেষে আবু বকর আল বাগদাদি ও তার জল্লাদ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বর্তমান আইসিসকে বুঝতে চেষ্টা করব। এ ক্ষেত্রে আমরা নির্ভর করেছি বর্তমান ও সাবেক আইসিস সদস্য, স্পাই, স্লিপিং এজেন্ট এবং তাদের ভিকটিম—সিরিয়ান গোত্রনেতা, বিদ্রোহী গোষ্ঠী, অ্যাকটিভিস্ট এবং আইসিসের রাজধানী রাক্কার একজন দুর্দান্ত সাহসী স্কুলশিক্ষক, যিনি 'প্রচুর' তথ্য প্রদান করেছেন।

আইসিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক অফিস ও সদস্য সংগ্রহকেন্দ্র হচ্ছে 'জেলখানা'। দুর্ঘটনাবশত কিংবা পরিকল্পিত যা-ই হোক না কেন, এটা সত্য যে মধ্যপ্রাচ্যের জেলখানাগুলো বহু বছর যাবৎ জিহাদি সংগঠনগুলোর ভার্চুয়াল একাডেমি হিসেবে কাজ করছে। যেখানে ডাকসাইটে নেতারা জড়ো হওয়া,

পরিকল্পনা তৈরি করা, নিজেদের সুসংগঠিত করা, নেতৃত্বগুণ ঝালাই করে নেওয়া এবং গোটা এক প্রজন্মকে যোদ্ধা হিসেবে রিক্রুট করাসহ সবকিছুই অত্যন্ত নির্বিঘ্নে সেরেছেন। লৌহগরাদ তাদের নিরাপত্তাবর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

আইসিস শুধু একটি সন্ত্রাসী সংগঠনই নয়, কয়েক দশক ধরে ঝিমিয়ে পড়া আন্তর্জাতিক তেল ও অস্ত্র মাফিয়াচক্রের পুনর্জীবন দানকারী। পাশাপাশি এটি ছিল একটি নিয়মতান্ত্রিক সেনাদল, যারা বিশাল সেনাবাহিনী গঠন ও মোতায়েন করেছে। তাদের সামরিক নৈপুণ্যে মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যরাও হতভম্ব! তাদের সুদক্ষ ও করিতকর্মা গোয়েন্দা দল প্রতিপক্ষের ভেতর ঢুকে তথ্য সংগ্রহ ও উচ্চস্তরের অফিসারদের মধ্য থেকে সদস্য রিক্রুট করায় অসম্ভব পারদর্শী ছিল। মুখোমুখি সংঘাতে জড়ানোর আগে এভাবেই তারা প্রতিপক্ষ দলগুলোকে কুপোকাত করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রপাগান্ডা চালানো ও এখান থেকে সদস্য সংগ্রহ করা বর্তমানে খুবই কার্যকর একটি পদ্ধতি।

আইসিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ছিল খোদ এর সাবেক শত্রুদের মিলনমেলা। এ ক্ষেত্রে তারা আল কায়েদার চেয়েও সফল। আইসিসের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের অধিকাংশ নেতাই ছিল সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনী কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। বলা চলে, তারা সেক্যুলার বাথিজম থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমে পরিবর্তিত হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, আইসিস ইরাকে নিজেকে একটি সুন্নি সংখ্যালঘু যোদ্ধা দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আবার সিরিয়ায় সুন্নিরাই তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অবশ্য সেখানে তাদের শত্রুর তালিকায় ছিল অবিশ্বাসী আমেরিকা, ধর্মচ্যুত গালফ দেশগুলো, নুসাইরি-আলাভিদের সিরিয়া, রাফেজি ইরান এবং সবশেষে বাগদাদ।

আইসিসের বিরুদ্ধে লড়াই একটি জটিল জিওপলিটিক্যাল রূপ নিয়েছে। যেমন সিরিয়া-আমেরিকা একজোট হয়ে আইসিসের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদের যুদ্ধবিমানগুলো একই আকাশে উড়ছে, একই টার্গেটে আঘাত হানছে। ওদিকে আবার তারা পরস্পরের শত্রু। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, দামেস্কে আসাদের কোনো বৈধতা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। শত্রু-মিত্রের জটিল সমীকরণ।

ইরাকে ইরান সমর্থিত কিছু দল আইসিস-উচ্ছেদ অভিযানে ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের স্থলবাহিনীর পুরোধা হিসেবে কাজ করছে। (তখন ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের তত্ত্বাবধান করত আমেরিকা) এই দলগুলো আবার আমেরিকা কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত, কারণ তাদের হাতে রয়েছে মার্কিনিদের রক্তের দাগ। পাশাপাশি এই দলগুলো পরিচালিত হতো ইরানি রেভল্যুশনারি গার্ডের দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনায়, যারা আরেকটি মার্কিন-স্বীকৃত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এসব

শিয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠী–হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্যমতে—সুন্নি গ্রামগুলোতে সাম্প্রদায়িক নির্মূল অভিযান চালাচ্ছে। তাদের এই অভিযান নির্বিঘ্ন করতে আবার আকাশ-প্রতিরক্ষায় মানবতার ফেরিওয়ালা মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো চক্কর দিচ্ছে।

ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, সিরিয়া-ইরানের এসব খুনি বাহিনীর সঙ্গে তাদের দহরম-মহরম সুন্নিদের ভীত করে তুলছে। ফলে সুন্নিরা আইসিসকে ঘৃণা এবং ভয় করা সত্ত্বেও নিজেদের ভূমি থেকে তাদের উৎখাতে অনুৎসাহিত হচ্ছে। কারণ আইসিস-বিতাড়ন মানে শিয়া খুনিদের হাতে নিজেদের গর্দান সমর্পণ। এ ছাড়া যারা আইসিস-বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে, তারা নির্মম নিধনযজ্ঞের শিকার হয়েছে। বাকিরা সহযোগিতা ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে।

একসময়ের উপেক্ষিত আইসিস আজ আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সীমানা ভেঙে নিজেদের হারানো খিলাফাহর ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত করেছে। পুরোনো শত্রু নতুন রূপে ফিরে এসেছে। দীর্ঘ যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত করার সংকল্প নিয়ে।

প্রথম অধ্যায়
ফাউন্ডিং ফাদার : আবু মুস'আব আল জারকাবি

'হে মুসলিমরা, দ্রুত ঘরে প্রত্যাবর্তন করো! হ্যাঁ, এটা তোমার ঘর। জলদি এসো। সিরিয়া সিরিয়ানদের শুধু নয়। ইরাকও শুধু ইরাকিদের নয়।' পহেলা রমজান, ২৮ জুন ২০১৪। আবু বকর আল বাগদাদি তৎকালীন খলিফা ইব্রাহিমের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আইসিসের (ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড শাম, এটি নাম পরিবর্তন করে শুধু আইএস তথা ইসলামিক স্টেটে পরিণত হয়) সমাপ্তি ও ইসলামিক স্টেটের সূচনা করেন। তিনি মসুলের বিখ্যাত আন নুরি মসজিদের মিম্বর থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। কদিন আগেই মাত্র তার বাহিনী শহরটি দখল করে নেয়।[২]

জন্মসূত্রে ইরাকি আবু বকর আল বাগদাদি তার নিজের ও অন্য সব ধরনের নাগরিকত্বের ধারণা বিলোপ করে দেন। তিনি একে মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল অর্ধচন্দ্রের ভূমি বলে আখ্যায়িত করেন। শুধু ইসলামিক স্টেট ছাড়া বাকি সব দেশের ধারণা মিটিয়ে দেন। মানব সম্প্রদায় দুই শিবিরে বিভক্ত। প্রথমটা হচ্ছে মুসলিম ও মুজাহিদিনদের শিবির। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইহুদি, ক্রুসেড আর তাদের

---

[২] বর্তমান আইসিস অনেক ধাপ পেরিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। জারকাবির অধীনে এর নাম ছিল- একিউআই, আল কায়েদা ইন ইরাক। ২০০৪ সালে এই নাম গ্রহণ করে। পূর্বে ভিন্ন নাম ছিল। তারপর ২০০৬ সালে নাম পাল্টে রাখা হয় আইএসআই, ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক। ২০১৩ সালের এপ্রিলে আবার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় আইএসআইএল/আইএসআইএস, ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড শাম। এই নাম নিয়ে ইংরেজি ভাষাভাষীদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কারণ মূল আরবি নাম ছিল আদ দাওলাতুল ইসলামিয়া ফিল ইরাক ওয়াশ শাম। ইসলামের ইতিহাসে শাম বলতে সিরিয়া ও তার পূর্বাঞ্চলকে বোঝানো হতো। এই অঞ্চলকে ইংরেজিতে বলে লেভান্ত। তাই কেউ কেউ বলত আইএসআইএল, ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড লেভান্ত। কেউ বলত আইএসআইএস (আইসিস), ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড শাম/সিরিয়া।
এসব দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে তারা ২০১৪ সালে নাম পাল্টে শুধু ইসলামিক স্টেট রাখে। এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আইএস। এদের আরবি নামগুলোও পরিচিতি পায়- দায়েশ, দাওলা। মূল লেখকদ্বয় একেক স্থানে একেক নাম ব্যবহার করেছেন, সংগঠন মূলত একটিই। পাঠকদের কনফিউজড না হওয়ার অনুরোধ করব। (অনুবাদক)

চ্যালাদের শিবির। কালো কাপড়ে মোড়ানো বাগদাদি সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে গৌরবোজ্জ্বল আব্বাসি খিলাফাহর উত্তরাধিকারী ও বীর পূর্বসূরি আবু মুস'আব জারকাবির চেতনায় উজ্জীবিত বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন। এভাবেই এখানে একদিন ভাষণ দিতেন জারকাবি, তিনিই মসজিদটিকে নজরে আনেন এবং শৌর্যমণ্ডিত করেন।

জারকার সেই ছেলেটি

জারকা, জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে ২৫ মাইলের মতো উত্তর-পূর্বে অবস্থিত অপরিচ্ছন্ন এক গ্রাম। এই গ্রামের সবচেয়ে বিখ্যাত সন্তান আবু মুস'আব জারকাবির নামে এটি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। অবশ্য তার নামে পরিচিত হওয়ার আগেও এর দুটি পরিচয় ছিল। একটি ধর্মীয়, অন্যটি মানবিক। বাইবেলে বর্ণিত হজরত ইয়াকুব (জ্যাকব) আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিখ্যাত ঘটনাটি এই জারকাতেই ঘটেছিল। আর বর্তমানে এটি আর রুসাইফাহ শরণার্থী শিবিরের জন্য বিখ্যাত। জর্ডানে ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে পুরোনো শিবির। জারকাবির জন্মের পর আহমাদ ফাদল নাজজাল আল খলিলিয়া তাঁর জন্মের শুভবার্তা প্রচার করেন এবং ধরণিতে তাঁকে স্বাগত জানান। দেশহীন উদ্বাস্তু হিসেবে নয়, বরং বনু হাসসানের পক্ষ থেকে। বনু হাসসান হলো জর্ডান নদীর পূর্ব তীরে বাস করা বেদুইনদের একটি কনফেডারেশন, যারা বনু হাশিমের রাজত্বের প্রতি তাদের আনুগত্যের জন্য সুখ্যাত।

জারকাবির পিতা ছিলেন একজন 'মুখতার' বা জর্ডান সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গ্রামপ্রধান। তাঁরা স্থানীয় ঝগড়া-বিবাদ সমাধা করতেন। অবশ্য তাঁর ছেলেই ছিল গোল পাকানোর গুরু। জারকাবি মোটামুটি ধরনের ছাত্র ছিল। কোনো রকম আরবি লেখতে পারত। ১৯৮৪ সালে স্কুল থেকে ছিটকে পড়ে। সে বছরই তারা বাবা মারা যান এবং এর পরই সে অপরাধজগতে জড়িয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তার এক আত্মীয় নিউইয়র্ক টাইমসের নিকট স্মৃতিচারণা করেছিল, 'সে খুব বড়সড় ছিল না, তবে খুব স্পষ্টভাষী ছিল।' মাদকাসক্ত ছিল। নারীগমনের অভ্যাস ছিল বলেও শোনা যায়। তার প্রথম হাজতবাসের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ড্রাগ ও সেক্সুয়াল এসল্টের কারণে।

সে যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে মিশে যায়, তবে আর কখনোই ফেরার পথ নেই, এই চিন্তা থেকে তার মা উম্মে সায়েল তাকে আম্মানের আল হুসাইন ইবনে আলি মসজিদে ধর্মীয় কোর্সে ভর্তি করে দেন। আশাপ্রদ ফলাফল আসে। আইন যখন মানুষকে পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়, ইমান তা করতে সক্ষম হয়। তবে পরিবর্তনটা মায়ের আশানুরূপ হয়নি।

এই মসজিদেই সালাফিজমের সঙ্গে জারকাবির প্রথম পরিচয়। যার মূলকথা হচ্ছে আকিদাগত বিশুদ্ধতা ও হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে পুরোপুরি ফিরে যাওয়া। সালাফিরা পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র ও মডার্নিটিকে শুধু ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিকই ভাবে না, আরব সভ্যতার হন্তারক ও প্রধান দূষণকারীও মনে করে। এই দূষিত পদার্থ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিসর, সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাকের অবৈধ, ধর্মচ্যুত ও মুরতাদ রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে। সালাফিজমের চূড়ান্ত ধাপে তারা জিহাদের সমর্থক। আরবি জিহাদ শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'সংগ্রাম', কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ ব্যাপক বিস্তৃত ও বহুমুখী। ১৯৭৯ তে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর থেকে জিহাদের অর্থগুলোর মাঝে 'সশস্ত্র প্রতিরোধ' অর্থটা মুখ্য হয়ে ওঠে।

হায়েতাবাদ আখ্যান

পাকিস্তানের পেশওয়ারের একটি মফস্বল শহর হায়েতাবাদ। খাইবারপাসে অবস্থিত। খাইবারপাস ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানে আসা প্রত্যেক হানাদারের আগমন ও বহির্গমন রুট হিসেবে পরিচিত। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের ফলে ১৯৮০'র দশকে শহরটি দ্বিতীয় কাসাব্ল্যাংকায় পরিণত হয়েছিল। ক্রমেই এটি সৈন্য, স্পাই, হকার, অপরাধী, গ্যাংস্টার, চোরাকারবারি, শরণার্থী, কালোবাজারি এবং ঝানু মুজাহিদিনদের আখড়ায় পরিণত হয়।

আরব বিলিয়নিয়ার ও ব্যবসায়ী পরিবারের আদরের দুলাল ওসামা বিন লাদেনের হেডকোয়ার্টারও ছিল এই হায়েতাবাদে। তখন তিনি তাঁর নতুন সংগঠন আল কায়েদার জন্য সদস্য সংগ্রহে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন। সে সময় তাঁর গুরু ছিলেন ফিলিস্তিনি যোদ্ধা আবদুল্লাহ আজজাম। তিনি হায়েতাবাদেই থাকতেন এবং এখানকার শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতা ছিলেন। ১৯৮৪ তে প্রকাশিত তাঁর একটি বই আফগান মুজাহিদিনদের সংবিধানে পরিণত হয়। এই বইয়ের মূল কথা ছিল মুসলিমদের ওপর নিজেদের ভূমি থেকে দখলদার শক্তিকে তাড়িয়ে দেওয়া তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। ফরজে আইন (ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা) ও ফরজে কিফায়া (সামাজিক বা সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা), উভয়টিই।

আজজামের জন্মস্থান ফিলিস্তিনে তিনি দখলদারির ভয়ংকর রূপ দেখেছেন। তাই শুরু থেকেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার ও স্পষ্টভাষী। সোভিয়েতদের আফগানিস্তান থেকে ঝাঁটানো শুধু আফগান নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রধান দায়িত্ব বলে তিনি মত দেন। বাগদাদির মতোই তিনি গোটা বিশ্বের মুজাহিদিনদের 'বিশ্বাসীদের শিবিরে' অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। যদিও গতানুগতিক কোনো খিলাফাহ ছিল না তখন, কিন্তু

সোভিয়েত ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র বিনির্মাণ সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তখনো পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে নিখাদ মুসলিম আন্দোলন ছিল আফগান যুদ্ধ। কারণ এখানে কোনো আদর্শিক গোঁজামিল ছিল না। যেমনটা ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনে। ইয়াসির আরাফাতের সেক্যুলার ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট, পাশাপাশি কার্লোস দ্য জ্যাকেলের লেনিনিস্ট টেরোরিজম ফিলিস্তিনে আদর্শিক সংকট ও জটিলতা তৈরি করেছিল। আফগানিস্তানে এগুলো অনুপস্থিত।

আজজাম যখন পেশওয়ারে ফিরে আসেন, তখন বিন লাদেন আরব মুজাহিদিনদের অভিভাবকে পরিণত হন। আরবদের তাদের ভাষা শুনেই চেনা যেত, তারা যুদ্ধে আগ্রহী ছিল, কিন্তু কোথা থেকে কীভাবে শুরু করতে হবে তা জানা ছিল না। আজজাম-বিন লাদেন যৌথভাবে মুনতাখাবুল খিদমাহ বা সার্ভিস ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। (এটি ছিল আফগান শরণার্থীদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা) বিন লাদেনের একটি বাড়িতে এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। আজজাম যদি মার্ক্স হয়ে থাকেন, তবে বিন লাদেন ছিলেন এঙ্গেলস। আজজামের কাজ ছিল নতুন এই বিপ্লবের রূপরেখা ও আদর্শ প্রণয়ন, যেন আগত শিষ্যদের এই আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে সমস্যা না হয়। মিলিওনিয়ার বিন লাদেনের কাজ ছিল অর্থের জোগান দেওয়া, সেই সঙ্গে লক্ষ রাখা কখন গুরুর আদেশ আসে, যা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেবে।

প্রায় তিন হাজার আরব-আফগান এই সেন্টার থেকে জিহাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। পাশাপাশি তাদের অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, বাসস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারের সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন ভাষা, প্রতিবেশ, পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রাথমিক দীক্ষাও এখান থেকেই পেয়েছে। মুনতাখাবুল খিদমাহর ভায়া হয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে, যার বেশির ভাগই বিন লাদেন ও আজজামের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছিল। সৌদি সরকারেরও কিছু অনুদান ছিল। কারণ তখন বিন লাদেন গ্রুপের নির্মাণ সাম্রাজ্যের ফলে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ।

বিশ্বের অন্যতম একটি আন্তর্জাতিক সশস্ত্র গ্রুপ সবচেয়ে দুর্লভ বস্তুটি পেয়ে গেছে বিন লাদেন ও আজজামের মাধ্যমে—আন্তর্জাতিক সংযোগ। কিছুদিন বাদে আজজাম ও তার শাগরেদ বিন লাদেনের সম্পর্কে ছন্দপতন ঘটে। বিন লাদেনের সুসম্পর্ক শুরু হয় আন্তর্জাতিক জিহাদি মুভমেন্টের আরেক উদীয়মান নক্ষত্র আইমান আল জাওয়াহিরির সাথে। মিসরি এই সার্জন ১৯৮০'র গ্রীষ্মকালে রেড ক্রিসেন্টের অধীনে তিন মাস পাকিস্তানে কাজ করেছেন। এবং যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সরেজমিন প্রত্যক্ষ করতে আফগানিস্তানে এক ঝটিকা সফরে গিয়েছিলেন।

আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন হিসেবে বন্দিত্ববরণ এবং জেলখানায় অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হওয়ার ফলে আশির দশকের শেষ দিকে আইমান আল জাওয়াহিরি বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠেন। সে সময় তিনি জামায়াতুল জিহাদের আমির ছিলেন। এই সংগঠন কায়রোতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তগত করে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। জেলমুক্তির পর জাওয়াহিরি ১৯৮৬ সালে আবার পেশওয়ারে ফিরে আসেন রেড ক্রিসেন্টে তাঁর আগের কাজে যোগ দিতে। সেই সঙ্গে তাঁর 'আল জিহাদ' গ্রুপকে পুনরুজ্জীবিত করতে।

সে সময় তাঁর সালাফিজম ছিল আরও কট্টর। তিনি তাকফিরিজম তথা ইসলাম-বহির্ভূত কাজকর্মের কারণে কোনো মুসলিমকে অমুসলিম সাব্যস্ত করায় বিশ্বাসী ছিলেন। যাকে তাকফির করা হয়, তার একমাত্র সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড। ধীরে ধীরে জাওয়াহিরির সঙ্গে বিন লাদেনের সখ্য গাঢ় হয়। জাওয়াহিরি ছিলেন আবদুল্লাহ আজজামের পুরোপুরি বিপরীত মতাদর্শী। কারণ আজজামের দৃষ্টিতে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। তাঁর দৃষ্টিতে জিহাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মহীন ও ভ্রষ্ট পশ্চিমারা, ইসরায়েল যার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজজাম ও জাওয়াহিরি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁরা একজন আরেকজনকে এড়িয়ে চলতেন এবং উভয়েই বিন লাদেনের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৮৯ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে মসজিদে যাওয়ার পথে মাইন বিস্ফোরণে আজজাম তাঁর দুই ছেলেসহ শহিদ হন (সন্দেহভাজন খুনিদের তালিকায় রয়েছে কেজিবি, সৌদি ইন্টেলিজেন্স, সিআইএ ও বিন লাদেন/জাওয়াহিরি)। আজজামের মৃত্যুর ঠিক পরের মাসে তাঁর ছেলে হুজাইফা আজজাম এক বিকেলে পেশওয়ার এয়ারপোর্টে যান জর্ডান থেকে আসা কিছু আরব-আফগানকে রিসিভ করার জন্য। তারা এসেছিল সোভিয়েত রেড আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ঘটনাটি ছিল আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ার লজ্জাজনক সেনা প্রত্যাহারের দুই মাস আগে। আগত তরুণ যোদ্ধাদের একজন ছিল আমাদের আলোচিত আবু মুস'আব আল জারকাবি!

সন্ত্রাসীদের ক্লজওয়িজ[৩]

১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মে আবু মুস'আব জারকাবি হায়েতাবাদ থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে যান। ঠিক সে সময় পরাজিত রেড আর্মি

---

[৩] ক্লজওয়িজ একজন প্রুশিয়ান জেনারেল ও মিলিটারি থিওরিস্ট। ১৮৩১ সালে মারা যান। তিনি তাঁর থিওরির জন্য বিখ্যাত।

আফগানিস্তান ছাড়ছিল। যেহেতু পবিত্র যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাই যুদ্ধ শেষে জর্ডানে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানেই থেকে যান সোভিয়ের পরবর্তী আফগানিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ ও পুনর্গঠনে অংশ নিতে।

আরও অনেকেই থেকে যান। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন খালিদ শেখ মুহাম্মাদ, ৯/১১ এর প্রধান পরিকল্পনাকারী। মোহাম্মাদ শোবানা, তিনি আল বুনইয়ানুল মারসুস (সিসাঢালা প্রাচীর) নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন। জারকাবি আরবিতে তত ভালো ছিলেন না। কিন্তু একজন ধর্মীয় নেতার সুপারিশে তিনি এই ম্যাগাজিনের সাংবাদিক হিসেবে নিয়োগ পান। এ সময়ই তাঁর সাক্ষাৎ হয় তাঁর হবু ভগ্নিপতি সালাহ আল হামির সাথে। সে আবদুল্লাহ আজজামের আল জিহাদের একজন সদস্য ছিল। পাশাপাশি সার্ভিস ব্যুরো থেকে প্রকাশিত পত্রিকার একজন সাংবাদিক।

আল হামি খোস্তে এক মাইন বিস্ফোরণে তার একটি পা হারিয়েছিল। সেখানকার এক হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালে সে হা-হুতাশ করে বলছিল, এই পঙ্গুর নিকট কে মেয়ে দেবে। বিয়েটা বুঝি আর করা হলো না! জারকাবি তখন তার সাত বোনের একজনকে হামির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তাঁর বোন বিয়ের জন্য জর্ডান থেকে পেশওয়ার আসে। এই বিয়ের ফুটেজে জারকাবির একটি দুর্লভ ছবি পাওয়া যায়। ২০০৬ সালের আগ পর্যন্ত এটিই ছিল তার একমাত্র প্রকাশিত ছবি। ২০০৬-এর এপ্রিলে ইরাকে আল কায়েদার প্রকাশনা সংস্থার প্রচারিত এক ফুটেজে কালো পোশাক পরিহিত 'কমান্ডার' জারকাবিকে র‍্যাম্বোর মতো মেশিনগান ফায়ারিং করতে দেখা যায়।

হামির ভাষ্যমতে, জারকাবি সাধারণত সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের ঝানু যোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতেন। রাতে কোরআনুল কারিম মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। কয়েক মাস পর হামি তার স্ত্রীকে নিয়ে জর্ডানে চলে যায়। জারকাবি থেকে যান আফগান গৃহযুদ্ধে অংশ নিতে। এ সময় তিনি পশতুন নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য জড়িয়ে নেন। তালেবানের কাছে ক্ষমতা হারানোর আগ পর্যন্ত হেকমতিয়ার ছিলেন আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতা হারিয়ে তিনি ইরানে পালিয়ে যান।

অন্যদের যুদ্ধের কাহিনি লিখে জীবন পার করতে আর ভালো লাগছিল না জারকাবির। এবার নিজেই যোদ্ধা হিসেবে জীবন শুরু করার চিন্তা চাপে মাথায়। তিনি আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে বেশ কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সদাতুল মালাহিন (যুদ্ধের আহ্বান)। এটি ছিল আল কায়েদার সামরিক কর্মকাণ্ডের সদর দপ্তর। এখান থেকেই প্রশিক্ষণ নেয় ওয়ার্ল্ড

ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের দুজন মাস্টারমাইন্ড—রামজি ইউসুফ ও খালিদ শেখ মুহাম্মদ।[৪]

লরেট নেপোলিয়নি তাঁর রচিত 'ইনসার্জেন্ট ইরাক : আল জারকাবি অ্যান্ড দ্য নিউ জেনারেশন' বইয়ে ওসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী নাসির আহমাদ নাসির আবদুল্লাহ আল বাহরির বরাতে উল্লেখ করেছেন, সদাতুল মালাহিন ক্যাম্পের সামরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ তিন ধাপে সম্পন্ন হতো। প্রথম ধাপ ছিল 'ডেজ অব এক্সপেরিমেন্ট'। ১৫ দিন মেয়াদি এই ধাপে শারীরিক ও নৈতিক সক্ষমতার পরীক্ষা করা হতো। এই ধাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল কে প্রকৃত যোদ্ধা আর কে লুতুপুতু আদরের দুলাল, তা নির্ণয় করা।

দ্বিতীয় ধাপ ছিল 'মিলিটারি প্রিপারেশন পিরিয়ড'। ৪৫ দিনব্যাপী এই কোর্সে হালকা অস্ত্র চালনা, কাঁধে বহনযোগ্য সারফেস টু এয়ার (ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য) মিসাইল চালনা ও মানচিত্রাঙ্কন শেখানো হতো। তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ ছিল 'গেরিলা ওয়ার ট্যাকটিকস' কোর্স। এতে সামরিক থিওরি শিখানো হতো—আল কায়েদার 'ক্লজওয়িজ'।

গৃহ প্রত্যাবর্তন

১৯৯২ সালে জারকাবি জর্ডানে ফিরে আসেন। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জর্ডানের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট (জিআইডি) কর্তৃক নজরদারির আওয়তায় আনা হয়। যেসব দেশ থেকে যোদ্ধারা আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সেসব দেশের সরকারের ধারণা ছিল, আফগান-ফেরত যোদ্ধারা এখন নিজ নিজ দেশে মনোনিবেশ করবে, ঘরোয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। জিআইডির আশঙ্কা ১৯৯৩ সালেই সত্য প্রমাণিত হয়। সে বছর জর্ডান ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করে, যা স্বভাবতই ইসলামিস্টদের মাঝে ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার করে। বিশেষত আফগান-ফেরত যোদ্ধাদের মাঝে, যারা তখন নিজেদের

---

[৪] সিআইএ খালিদ শেখ মুহাম্মদকে ৯/১১-এর প্রধান হোতা ভেবেছিল। ২০০৩ সালে তাঁকে পাকিস্তান থেকে গ্রেপ্তার করে কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠায়। সেখানে তিনি নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। ২০০৯-এর এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ২০০৩ সালে খালিদকে ১৮৩ বার ওয়াটারবোর্ডিং করা হয়। এটি সিআইএ উদ্ভাবিত একটি বর্বর ও বিতর্কিত নির্যাতন-পদ্ধতি। নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তিনি সিআইএ যা শুনতে চেয়েছে, তা-ই বলেছেন এবং নির্যাতনের মাধ্যমে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের অভিযোগ ওঠার পর তাঁর বিচারকাজ মুলতবি রয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে তা পুনরায় শুরু হওয়ার কথা। (অনুবাদক)

নতুন সংগঠন শুরু করতে যাচ্ছিল। যেমন জাইশ ই মুহাম্মদ (মুহাম্মদের সেনাদল) ও আল হাশিক্কাহ (জর্ডানি আফগান)।

জারকাবি দেশে ফিরে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি জর্ডানি-ফিলিস্তিনি সালাফি স্কলার আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল হায়েতাবাদে। তিনিই জারকাবিকে শোবানার ম্যাগাজিনে রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন। তত দিনে মাকদিসি 'ডেমোক্রেসি : আ রিলিজিয়ন' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছেপেছেন, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি বিধান ও মূর্তিপূজকদের পলিটিক্যাল ইকোনমির মাঝে স্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা হয়েছে।

বিন লাদেন ও আজজামের মতো জারকাবি-মাকদিসি জোট জর্ডানে কিছু 'সাময়িক দীক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন করে। এগুলো থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে সরকারের ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্ক, আমেরিকার অনধিকার চর্চা ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা হতো। মাকদিসি ছিলেন একজন কট্টরপন্থী স্কলার। সমকালীন রাজনীতির ব্যর্থতার ব্যাপারে খুবই খড়গহস্ত। অন্যদিকে জারকাবির ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয় কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিশেষত্ব ছিল না। পরবর্তী সময়ে তাঁর আইনজীবী মুহাম্মদ আদ দাবিক বলেছিলেন, তাঁকে কখনোই আমার খুব মেধাবী বলে মনে হয়নি।

এ সময় আল মাকদিসি তাঁর নিজস্ব সংগঠন দাঁড় করান, বাইতুল ইমাম বা নেতার দীক্ষাকেন্দ্র নামে। জারকাবিকেও সঙ্গে নেন। তাঁদের প্রথম আক্রমণ হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়। প্রথম গালফ ওয়ারের শেষ দিকে পশ্চাদপসরণকারী ইরাকি বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রের ব্ল্যাক মার্কেট গড়ে ওঠে কুয়েতে। মাকদিসি এই যুদ্ধে জড়িত ছিলেন বিধায় এখানে তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল। সেখান থেকে তিনি কিছু মাইন, অ্যান্টিট্যাঙ্ক রকেট ও কিছু হ্যান্ডগ্রেনেড কিনে সেগুলো জর্ডানে চোরাচালান করে দেন ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে।

চোরাচালানকৃত এসব অস্ত্রশস্ত্র লুকানোর দায়িত্ব দেন জারকাবিকে। পরে যখন তিনি সেগুলো ফেরত চান, জারকাবি দুটি গ্রেনেড বাদে বাকিগুলো ফেরত দেন। গ্রেনেড দুটো রেখেছিলেন ইহুদি-অধ্যুষিত এলাকায় আত্মঘাতী হামলায় ব্যবহারের জন্য। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন জিআইডি তাদের অস্ত্রশস্ত্রের কথা জেনে গেছে। এমনকি তারা তাঁদের গোপন অস্ত্রের গুদাম সম্পর্কেও হয়তো জানে। দুজনই জর্ডান ত্যাগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান।

জারকাবিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর বাড়িতে রেইড করে। সেই সঙ্গে তাঁর অস্ত্রের মজুদও উদ্ধার করা হয়। প্রথমে তিনি একজন সিকিউরিটি অফিসারকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। পরে সুইসাইড বম্বিং করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

কোনোটিতেই সফল হতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র রাখা ও নিষিদ্ধ সংগঠনে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। বিচারকাজ চলাকালে মাকদিসি ও জারকাবি উভয়েই সিদ্ধান্ত নেন আদালতে সত্য উচ্চারণ করার। জাওয়াহিরি যেমনটা করেছিল মিসরে। তাঁরা আদালত ও বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং জর্ডানের রাজতন্ত্র আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ তোলেন।

তাঁদের বিচারক হাফিজ আমিনের ভাষ্যমতে, বাইতুল ইমাম একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে, যাতে তারা দাবি করেছে যে আমরা পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করছি। তাঁরা বিচারক আমিনকে বলেন, খোদ বাদশাহ হোসেইনের নিকট এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে তিনিও একই অভিযোগে অভিযুক্ত—ধর্ম অবমাননা। জারকাবি তখনো মাকদিসির জুনিয়রই ছিলেন। ১৯৯৪-তে তাঁদের দুজনকেই ১৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং মরুভূমির একটি হাই সিকিউরিটির জেলখানায় পাঠানো হয়—সাওকা জেলখানা।

হাজত বিদ্যালয়

হাজতবাস জারকাবিকে আরও মনোযোগী, নিষ্ঠুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে গড়ে তোলে। বনু হাসসানের সদস্য হিসেবে জারকাবি জেলে অন্য বন্দীদের চেয়ে আলাদা ছিলেন। এমনকি তাঁর গুরু মাকদিসিও জারকাবির মতো ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করে সম্মানিত বোধ করতেন। সাধারণত জর্ডানসহ সর্বত্রই হাজতবাস হাজতিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে। বন্দীরা নিজ বলয়ের বাইরের লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হয়। জারকাবি এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন।

জেলের তুলনামূলক নমনীয় কিংবা কুটিল গার্ডদের সঙ্গে তিনি গাঁটছড়া বাঁধেন। ফলে বাইতুল ইমামের অন্য সদস্যদেরও উত্থানের সুযোগ হয়। অভিজাত পোশাক ও সকালে হাজতিদের রোল কলের দায়িত্ব পাওয়ার ফলে জারকাবির নায়েব-গোমস্তা জোটাতে বেগ পেতে হয়নি। জেলের এক ডাক্তার স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, কোনো কাজের আদেশ দেওয়ার জন্য জারকাবির চোখের ইশারাই যথেষ্ট ছিল।

বলপ্রয়োগ কিংবা ব্রেনওয়াশ, যেভাবেই হোক, জারকাবি ইসলামের একক ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। ব্যাখ্যাকার ছিলেন তিনি নিজেই। যাদেরকে তিনি পছন্দ করতেন না, তাদের দমন করার চেষ্টা করতেন। যেমন সাওয়াকা ম্যাগাজিনের এক সাংবাদিক, যে তাঁর সমালোচনা করে আর্টিক্যাল লিখেছিল। আবু দুমা নামের এক বন্দীকে 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' বইটা পড়তে দেখে খেদোক্তি

করেছিলেন—অধার্মিকদের বই? আবু দুমা 'নোংরা রুশ' সাহিত্য পরিত্যাগ করেছে কি না জারকাবি তা লক্ষ রাখতেন। এক চিঠিতে তিনি দস্তয়ভস্কির নামের বানান লিখেছিলেন দসেফস্কি। চিঠিটি ছিল অসংখ্য ভুলে ভরা। বাচ্চাদের লেখা চিঠির মতো। আবু দুমা পরে বলেছিলেন, মেধাগত উৎকর্ষে বেশি জুত করতে না পেরে অবশেষে জারকাবি বডি বিল্ডিংয়ে মন দেন। তাঁর বিছানার স্ট্যান্ড, অলিভ ওয়েলের খালি ক্যানভর্তি পাথর এসব রাখা ছিল। এগুলোই ছিল তাঁর যন্ত্রপাতি। গার্ডদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সর্বদা সুখের ছিল না। মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে মার খেতেন। অবশ্য এর ফলে শিষ্যদের চোখে তাঁর নেতৃত্বগুণ বাড়ত বৈ কমত না। একবার সাজা হিসেবে তাঁকে সাড়ে আট মাস নির্জন সেলে থাকতে হয়েছিল।

হাজতবাসের সময়ই জারকাবি মাকসিদিকে ছাড়িয়ে যান এবং আমির উপাধি পান। পরে মাকসিদি বলেছিলেন, তিনিই তাঁকে আমির উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ সময় গুরু তাঁর শিষ্যের আদর্শ গঠনে সচেষ্ট হন, পাশাপাশি মাসল গঠনেও। দুজন মিলে বেশ কিছু ফতোয়া প্রস্তুত করেন, যা তখন ইন্টারনেটে আপলোড করা হয়েছিল। কিছু ফতোয়া বিন লাদেনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। বিন লাদেন অবশ্য আগে থেকেই এই দুই জর্ডানির বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর আগ্রহভরে নজর রাখছিলেন। রিচার্ডের দেওয়া তথ্য অনুসারে পেন্টাগনের একজন টপ র‍্যাঙ্কড কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তাকে জারকাবির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার পরিচয় গোপন রেখে বলেছিলেন, জারকাবির হাজতবাসের অভিজ্ঞতা ছিল বোস্টনের গডফাদার হুইটি বালজারের মতো। 'আমরা তাকে হার্ভাড সংশোধনকেন্দ্রে পাঠিয়েছিলাম একজন ছিঁচকে অপরাধী হিসেবে। তার আইকিউ কম হলেও ঘটে কূটবুদ্ধি ছিল প্রচুর। সে পয়সা উপার্জনের বেশ কিছু উপায় পেয়ে যায়। যখন সে মুক্তি পায়, তার আশপাশে তখন অনেক পাতিমাস্তান। এদের নিয়ে সে নিজের গ্যাং দাঁড় করিয়ে ফেলে এবং পরবর্তী চার-পাঁচ বছর বোস্টন দাপিয়ে বেড়ায়। জারকাবির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। জেলখানা ছিল তার হাত পাকানোর ঘুঁটি।'

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাব ২০ বছর পর, আবু বকর আল বাগদাদির ক্ষেত্রে। একই রকম নেতৃত্বগুণ ও কৌশলের প্রয়োগ। অবশ্য বাগদাদির উত্থান ঘটেছিল দক্ষিণ ইরাকে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্প বুকা থেকে। জারকাবিকে তাঁর দণ্ডাদেশের অল্প কিছু সময় জেলে কাটাতে হয়েছে। বাদশাহ হুসেইনের মৃত্যুর পর তাঁর পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে দ্বিতীয় আবদুল্লাহ সিংহাসনে বসে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে সমঝোতার নীতি অবলম্বন করেন। সে সময় ব্রাদারহুড ছিল জর্ডান পার্লামেন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল।

১৯৯৯ সালের মার্চে নতুন বাদশাহ ভয়ংকর অপরাধী—যেমন খুনি, ধর্ষক ও গাদ্দারদের ছাড়া অন্য বন্দীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। প্রায় তিন হাজার বন্দী এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি পায়। যেসব ইসলামিস্ট সরাসরি সিংহাসনের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকায়নি, তাদেরকেও মুক্তির আওতায় আনা হয়। এদের মাঝে জারকাবিও ছিলেন।

বিন লাদেনের সাক্ষাৎ

১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে জারকাবি জর্ডান ত্যাগ করেন। কয়েক বছর আগে ছেড়ে আসা পাকিস্তানই ছিল তার গন্তব্য। পেশওয়ারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং আট দিন ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটান। কারণ তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তান ত্যাগ করার শর্তে কর্তৃপক্ষ তাঁর পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। তিনি তা গ্রহণ না করে আফগানিস্তানে পালিয়ে যান। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের প্রভাবাধীন কাবুলের এক গেস্ট হাউসে গিয়ে ওঠেন, যা ছিল মুজাহিদিনদের জন্য নির্ধারিত।

তালেবানের রাজধানী কান্দাহারে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সর্বপ্রথম জারকাবির সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের 'প্রথম দর্শন' মোটেই সুখকর কিছু ছিল না। জারকাবি ও তাঁর সঙ্গে আসা অন্য জর্ডানিদের বিন লাদেন জিআইডির এজেন্ট বলে সন্দেহ করতেন, জিআইডির চর হিসেবে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছে—ভাবতেন। মড়ার ওপর খড়ার ঘা হয়ে দেখা দেয় জারকাবির দেহে আঁকা বিভিন্ন ট্যাটু। যেগুলো তিনি ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করার আগে আঁকিয়েছিলেন। কিন্তু জেলে থাকতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিয়ে বহু ঘষামাজা করেও তোলা যায়নি। ট্যাটুগুলো 'সৌদি নাগরিকের' দৃষ্টি এড়ায়নি।

ওসামা বিন লাদেনকে সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ করেছে ইসলাম সম্পর্কে জারকাবির একগুঁয়েমি এবং তাঁর অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতে জাওয়াহিরিও উপস্থিত ছিলেন। দুজনই একমত হয়েছেন যে জারকাবি আল কায়েদার সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্য নন।

স্বজন ও পরজন

১৯৯৬-তে বিন লাদেন একটি ফতোয়া ইস্যু করেন, 'ডিক্লারেশন অব জিহাদ এগেইনস্ট দ্য আমেরিকান্স অকুপাইয়িং দ্য ল্যান্ড অব দ্য টু হলিয়েস্ট সিটিজ' বা পবিত্রতম দুই শহর দখলকারী আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা নামে। পবিত্র শহর দুটি ছিল হারামাইন আশ শারিফাইন তথা মক্কা ও মদিনা। প্রথম গালফ

ওয়ার (১৯৯১-এর ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ) শেষ হওয়ার পর সৌদিতে আমেরিকান সেনাবাহিনী আখড়া গেড়ে বসে। এক হিসাবে তাঁর এই ফতোয়া ছিল জিহাদ সম্পর্কে আবদুল্লাহ আজজাম ও আইমান আল জাওয়াহিরির ব্যাখ্যার অনুরূপ। যদিও আল কায়েদা আফগানিস্তানে রুশ দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সৌদির পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ তৎকালীন পৃথিবীতে আমেরিকাই ছিল একমাত্র 'দখলদার', যে একটি মুসলিম সরকারের অনুরোধে সেই দেশে গিয়েছে। উপরন্তু এই সরকার ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওসামার সহযোগী।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই আল কায়েদা বিশ্বজুড়ে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায়। ইয়েমেন, সৌদি, কেনিয়া, তানজানিয়া কিছুই বাদ যায়নি। এ সময় তাদের ফোকাস ছিল দূরতম শত্রু তথা বিধর্মীদের ওপর। পাশাপাশি যেসব মুসলিম তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করত, তারাও টার্গেটে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে জারকাবি চেয়েছিলেন জিহাদকে জর্ডানে নিয়ে যেতে, যেখানে তাঁর টার্গেট হবে নিকটতম শত্রু তথা মুসলিমরা। এক দশক আগে ঠিক একই পরিস্থিতিতে ছিলেন আইমান আল জাওয়াহিরি। তবে দুজনের মাঝে প্রজন্ম-ভিন্নতার পাশাপাশি আদর্শিক ভিন্নতাও ছিল।

জারকাবি-প্রদত্ত কাফেরের সংজ্ঞাও ছিল জগাখিচুড়ি মার্কা। তাঁর মতে, সমস্ত শিয়া কাফের এবং যেসব মুসলিম তাঁর কট্টর সালাফিজম মানে না, তারাও কাফের। ওসামা বিন লাদেন কখনো এভাবে ভাবেননি। কারণ, তাঁর মা ছিলেন একজন আলাভি শিয়া। সিরিয়ান শিয়াদের একটি শাখা।

তাঁদের এই বিরহাত্মক প্রথম দর্শনের পর আবার সানাইয়ের সুর বাজে সাইফ আল আদেলের মাধ্যমে। আদেল ছিল আল কায়েদার সিকিউরিটি চিফ। জারকাবির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল লেভান্তের (সিরিয়া বা আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল) সাথে। আল আদেল তখন বিন লাদেনকে বোঝাতে পেরেছিল যে এই সম্পর্ক আল কায়েদার জন্য অমাবস্যার চাঁদ হবে। লেভান্তের যেসব নেতার সঙ্গে জারকাবির সম্পর্ক ছিল, তাদের একজন হলো আবু মুহাম্মদ আল আদনানি, বর্তমান আইসিসের মুখপাত্র।

তাওহিদ ওয়াল জিহাদ

২০০০ সালের দিকে জারকাবিকে আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হেরাতের একটি ট্রেনিং ক্যাম্পের ইনচার্জ করা হয়। শহরটি ছিল আফগান-ইরান সীমান্ত সংলগ্ন। প্রশিক্ষণ শিবিরটি নির্মিত হয়েছিল আল কায়েদার প্রারম্ভিক অর্থ ব্যয়ের

মাধ্যমে। সিআইএর গবেষক নাদা বাকোস ধারণা করেন, ওসামা বিন লাদেন জারকাবিকে প্রায় দুই লাখ ডলার লোন দিয়েছিলেন। আল কায়েদার অর্থনৈতিক সক্ষমতার তুলনায় এই অর্থ যৎসামান্য। 'আপনার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এক টুকরো ভূখণ্ড। অ্যামুনিশন আর একে-৪৭ নিয়ে ঘুরঘুর করা কিছু শিষ্য,' সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তা রিচার্ডের ভাষ্য। 'তারা সেখানে উচ্চাঙ্গের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল না। মেরিন সৈন্যদের মতোও নয়। সেখানে বরং যাচাই করা হতো যুদ্ধে যাওয়ার মতো বুকের পাটা কার আছে, কার নেই।'

জারকাবির ক্যাম্পে মূলত ফিলিস্তিন ও জর্ডানের রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তাই তাঁর ব্রিগেডকে বলা হতো জুনদুশ শাম বা লেভান্তের বাহিনী। রিক্রুটরা ক্যাম্পে প্রবেশকালে তাদের ব্যানারে শোভা পেত 'তাওহিদ ওয়াল জিহাদ' স্লোগানটি। এর অর্থ একত্ববাদ ও জিহাদ। পরবর্তী সময়ে এটি জারকাবির নিজ দলের স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়। জুনদুশ শামকে ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন, ইসরায়েল, জর্ডান ও অন্যান্য আরব দেশের সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু সদস্য ২০০২ সালে লরেন্স ফোলি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়। ফোলি আম্মানে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের একজন অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিল। ২০০৪ সালে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, মার্কিন দূতাবাস ও জিআইডির হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে কেমিক্যাল বোমা স্থাপন করার ষড়যন্ত্রেও জড়িত ছিল এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। ঘটনাটি তুমুল মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছিল।

জর্ডান সরকারের ভাষ্যমতে, এই ষড়যন্ত্র সফল হলে ৮০ হাজার লোক নিহত হতো। জারকাবি এই ষড়যন্ত্রের দায় স্বীকার করেছেন কিন্তু কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছেন।

জুনদুশ শাম আশাতীত গতিতে বেড়ে উঠছিল। বিন লাদেনের নিকট ক্যাম্পের অগ্রগতির রিপোর্ট করার জন্য প্রতি মাসে আল আদেল একবার হেরাতে যেত। সে জুনদুশ শামের উন্নতিতে খুব প্রভাবিত হয়েছিল। এ সময় জারকাবি সম্পর্কে বিন লাদেনের পূর্ব-মূল্যায়ন ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। বিশেষত, ২০০০-২০০১ সালে জারকাবিকে বেশ কয়েকবার কান্দাহারে এসে বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান জানান। বাইয়াতের মানে ছিল পুরোপুরি আল কায়েদার আনুগত্য মেনে নেওয়া। জারকাবি বারবারই তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এক সাবেক সহচর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছে, 'আমি তাঁকে হজরত মুহাম্মদ সা. ছাড়া আর কারো প্রশংসা করতে শুনিনি কখনো। আবু মুস'আবের চরিত্র ছিল, তিনি কখনো কারো অধীনতা মেনে নেননি। তিনি শুধু সেটাই করতে চাইতেন, যা করা প্রয়োজন বলে মনে করতেন।'

যা-ই হোক, জারকাবির অবাধ্যতা কিংবা মতভিন্নতা যে কারণেই হোক, ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বিন লাদেনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন এবং সুযোগসন্ধানী সম্পর্ক রেখে চলেছেন।

আনসারুল ইসলাম

হেরাতে জারকাবির লেফটেন্যান্টদের মাঝে একজন ছিলেন জর্ডানের নাগরিক আবু আবদুর রহমান আশ শামি। তাঁর দায়িত্ব ছিল ইরানের ভায়া হয়ে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে কুর্দি অধ্যুষিত আধা স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় তালেবানের মতো একটি সংগঠন গড়ে তোলা এবং এর নেটওয়ার্ক বিস্তার করা। সে সময় আন্তর্জাতিক নো ফ্লাই জোনের কারণে কুর্দি এলাকায় সাদ্দামের সেনাবাহিনী প্রবেশ করতে পারত না।

অল্প কদিনের মধ্যেই আবদুর রহমান আশ শামি 'জুনদুল ইসলাম' নামের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তারা পর্বতসংকুল সেই উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৫০০ বর্গকিলোমিটার জায়গা দখলে নেয়, সেখানে প্রায় দুই লাখ লোকের বসবাস ছিল। এই এলাকায় তারা অ্যালকোহল, গান ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৯/১১-এর হামলা ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ শুরুর পর জুনদুল ইসলাম অন্যান্য দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনসারুল ইসলাম নাম ধারণ করে। তাদের প্রধান টার্গেট ছিল দুটি। প্রথমত বাগদাদের বাথিস্ট শাসনকে উৎখাত করা এবং জালাল তালিবানির নেতৃত্বে পরিচালিত প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তানকে হটানো। জালাল তালিবানি সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে তৎকালীন মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল জাতিসংঘে এক ভাষণে বলেন, আনসারুল ইসলাম ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। এটি প্রমাণ করে, সাদ্দামের সঙ্গে আল কায়েদার আঁতাত রয়েছে। কলিন পাওয়েলকে আনসারুল ইসলামের ব্যাপারে তথ্য দিত কুর্দি ইন্টেলিজেন্স।

কলিন পাওয়েল আরও বলেন, এই ৫০০ বর্গকিলোমিটার শহরে জারকাবি রিসিন (একধরনের বিষাক্ত তেল) ও রাসায়নিক অস্ত্র বানাচ্ছেন এবং সাদ্দাম প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তিনি বাগদাদে প্রায় তিন মাস চিকিৎসা নিয়েছেন। সেখানে তাঁর একটি কৃত্রিম পা লাগানো হয়েছে, কারণ আফগানিস্তানে এক বিমান হামলায় তাঁর এক পা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু মার্কিনিদের ইরাক আগ্রাসনের পর গোয়েন্দা বাহিনীর নথিপত্র, অসংখ্য ইরাকি ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে

জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে কলিন পাওয়েলের তথ্য ছিল ভুয়া। অবশ্য বুশ প্রশাসনে আক্রমণের আগেও এমন অনেকে ছিল, যারা পাওয়েলের এসব উজবুকি তথ্যে বিশ্বাস করত না।

পরে রিচার্ড বলেছেন, 'আমরা জারকাবি সম্পর্কে ১৯৯৮/৯৯-এর দিকে জানতে পারি। সে যখন আফগানিস্তান ত্যাগ করে, তখন আমরা বুঝতে পারছিলাম সে খুব ভয়ংকর হয়ে উঠবে। কিন্তু সে ইরাকে যাবে, আমরা তা ভাবিনি। আমরা ধারণা করেছিলাম, সে হয়তো তার সাবেক ডেরা জর্ডানে ফিরে যাবে। তবে মার্কিন প্রশাসন বাগদাদ হাসপাতালে চিকিৎসার যে কাহিনি বিকোতে চেয়েছে, তা আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি। এটি ছিল ডিক চেনির দিবাস্বপ্ন।'

জারকাবি আবদুর রহমান আশ শামি ও হেরাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরও অনেককেই কুর্দিস্তানে মোতায়েন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আদতে আনসারুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ততটা ছিল না, যতটা প্রশাসন প্রচার করেছে। বিন লাদেনের সাথেও তাঁর অনুরূপ সম্পর্কই ছিল।

'জিহাদিস্টরা গতানুগতিক সদস্যপদ ও দলের চেয়ে বন্ধুত্ব ও ব্যক্তিগত মেলামেশাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে,' রিচার্ড বলছিলেন। 'যেমন আজকের আইসিস অথবা সিরিয়ার দলগুলোকে দেখো, তারা কেমন ছড়ানো-ছিটানো। আনসারুল ইসলাম মূলত জারকাবিকে তাদের অঞ্চলে এনেছিল, কারণ তারা তাকে চিনত ও তাকে পছন্দ করত। সেই সাথে তার ছিল ক্রিমিনাল গ্রুপ ও গোত্রনেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার অসাধারণ দক্ষতা।' আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো যৌথবাহিনীর আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর নর্দান অ্যালায়েন্স জারকাবি-পরিচালিত হেরাতের প্রশিক্ষণ শিবির অবরোধ করে। তিনি কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। সেখান থেকে কান্দাহারে চলে যান। তবে যৌথবাহিনীর বিমান হামলায় আহত হন।

গুরুতর কিছু ছিল না অবশ্য। তাঁর পা বিচ্ছিন্ন হয়নি। পাঁজরের কিছু হাড় ভেঙে গিয়েছিল। ইয়াদ তুবাইসি, তাঁর একজন সাবেক ছাত্র, এমনটাই বলেছে। কান্দাহার থেকে জারকাবি তাঁর ৩০০ সশস্ত্র যোদ্ধাসহ ইরানের জাহেদান শহরে চলে যান। এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করার পর গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের তত্ত্বাবধানে তেহরানে প্রবেশ করেন। হেকমতিয়ার ছিলেন জারকাবির যোগাযোগ-দক্ষতার আরেকটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যা তিনি উত্তর-পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম ভ্রমণের সময় বানিয়েছিলেন।

সুলতান নুরুদ্দিন ও ইরাক

জারকাবির এক অনুসারীর ভাষ্য : 'আবু মুস'আব ইরাককে তাঁর জিহাদি কার্যক্রমের নতুন উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন। বিস্তৃত ভূমি। যেহেতু আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল, ইরাকে তিনি আমেরিকানদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। আল্লাহ তাঁকে সেই সক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি ইরাকে একজন প্রভাবশালী জিহাদি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা সাজিয়েছেন।'

আল কায়েদার সিকিউরিটি চিফ সাইফ আল আদেল, যিনি সব সময় জারকাবিকে সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, বলেন—জারকাবির ইরাক গমনের সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একসময় ইরাকের মসুল থেকে ক্রুসেডবিরোধী মুসলিম বীর সুলতান নুরুদ্দিন যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। আফগানিস্তানে ইসলামিক ইমারাতের (তালেবানের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নাম) পতনের পর এটি জারকাবিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। জারকাবি দ্বাদশ শতকের মসুল ও আলেপ্পোর শাসক নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জানকির কিংবদন্তিতুল্য ঘটনাবলিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জানকি ছিলেন দ্বিতীয় ক্রুসেডের হিরো। তিনি দক্ষিণ তুরস্কে ফরাসি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন এবং খ্রিষ্টান প্রিন্স রেমন্ডের বাহিনীকে এন্টিয়কে নাকানিচুবানি খাইয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দামেস্কের আমির আতাবেগের কন্যাকে বিয়ে করে গোটা সিরিয়াকে একতাবদ্ধ করেন।

তাঁর শিষ্য, কুর্দি সামরিক কমান্ডার সালাউদ্দিন আইয়ুবি তারপর মসুলের শাসক হন এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডে যোগদানের আগে তিনি বিখ্যাত আন নুরি মসজিদে ভাষণ দেন। যেখানে ২৮ জুন ২০১৪ আলে আবু বকর আল বাগদাদি ভাষণ দিয়েছেন। স্থান নির্বাচন ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত। এর মাধ্যমে বাগদাদি শুধু আইসিসের প্রতিষ্ঠাতা জারকাবির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করেননি, বরং মসুল ও আলেপ্পোর ঐতিহাসিক পুনরেকত্রীকরণের ইঙ্গিত ছিল। কালো পোশাকধারীদের অধীনে হারানো খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের ইশারাও ছিল।

ইরানি পৃষ্ঠপোষকতা

আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার পর এক বছর বা তার কিছু বেশি সময় ধরে জারকাবির আস্তানা ছিল ইরান ও উত্তর ইরাক। তবে তিনি গোটা অঞ্চলই চষে বেড়িয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছেন, সেখান থেকে তাঁর মুকুলিত জিহাদি নেটওয়ার্কের জন্য সদস্যও সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি তিনি সুন্নি অধ্যুষিত ইরাকের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলও ভ্রমণ করেছেন।

বিন লাদেনের দেহরক্ষী শাদি আবদুল্লাহ পরবর্তী সময়ে জার্মান কর্তৃপক্ষকে বলেছে যে জারকাবি ইরানে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জর্ডান কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, ২০০৩ সালের কোনো একসময় ইরান সফরে এই ঘটনা ঘটেছিল। বাশার আল আসাদের সিকিউরিটি ফোর্সের সম্মতিতে জারকাবি সিরিয়াও ভ্রমণ করেন। জিআইডির বিশ্বাস, সেখানে বসেই ফোলিকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

ইরাক যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় জারকাবি কোন দেশের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন, সে ব্যাপারে আম্মানের নথিপত্র পাওয়েলের পূর্ব-প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ২০০৬ সালে জিআইডির এক সোর্স দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনকে বলেছে, 'আমেরিকার জারকাবিকে বাগদাদে খোঁজা উচিত হয়নি, বরং তেহরানে খোঁজা উচিত ছিল। আমরা জারকাবিকে তার নিজের চাইতেও বেশি চিনি। আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি, সাদ্দামের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ইরানের বিষয়টি আলাদা। ইরাক নিয়ন্ত্রণ তাদের আজন্মলালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা জারকাবিকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ছিল সাময়িক কৌশল, দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজি নয়। আনসারুল ইসলামের সঙ্গে থাকাবস্থায় ইরান প্রাথমিকভাবে তাকে অটোমেটিক অস্ত্র, ইউনিফর্ম, সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে। কিন্তু এখন তারা জারকাবি ও অন্যান্য আল কায়েদা নেতার ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। ইরানিরা ইরাককে দেখেছে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যম হিসেবে। এবং আমেরিকা পরাজিত হওয়ার পর তারা জারকাবি ও তার সমস্ত লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

এই পর্যবেক্ষণে তিনটি মজার বিষয় আছে।

এক. জারকাবির হবু শাসনব্যবস্থা হবে নিঃসন্দেহে সুন্নিপ্রধান। শিয়া-নিধন কিংবা নির্যাতন হবে এর প্রধান কাজ। তাঁর মিশন হয়তো গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করবে এবং সুন্নিদের উদ্বুদ্ধ করবে বাগদাদে নুরুদ্দিন জানকির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। এসব জানা সত্ত্বেও শিয়া ইরান কর্তৃক জারকাবিকে সহায়তা সত্যিই অদ্ভুত জিওপলিটিকস।

দুই. পরবর্তী সময়ে ইরান জারকাবির শাসনব্যবস্থা 'নিশ্চিহ্ন' করে দেওয়ার কাজটা খুব জোরেশোরে আর সরাসরিই করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের রেভল্যুশনারি গার্ড এবং ভারী অস্ত্র ও উঁচুমানের সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রক্সি দুটিই ব্যবহার করেছে। এমনকি আকাশপথে তাদের বিমানবাহিনীও আইসিসের অবস্থানের ওপর হামলা চালিয়েছে। অথচ আইসিসের প্রতিষ্ঠাতা আবু মুস'আব জারকাবিকে ইরানই সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিল।

তিন. ২০০১ ও ২০০২ সালে ইরান কর্তৃক জারকাবিকে সহায়তা প্রদান এ কথার প্রমাণ যে বুশ প্রশাসন সাদ্দামের সঙ্গে আল কায়েদার গোপন আঁতাত কিংবা কৌশলগত সম্পর্ক থাকার যে দাবি করে, তা মিথ্যা। মজার বিষয় হচ্ছে, ইরান-জারকাবি আঁতাতের এই দাবি খোদ আইসিসের বর্তমান মুখপাত্র ও জারকাবির সহকর্মী আবু মুহাম্মদ আল আদনানিও স্বীকার করে নিয়েছেন। আল কায়েদা তাদের সাবেক এই মিত্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদের কয়েক মাস পর ২০১৪ সালের মে মাসে আদনানি আইমান আল জাওয়াহিরির নিকট একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে তিনি জাওয়াহিরি ও অন্যান্য জিহাদি নেতার প্রতি পূর্ববশ্যতার কথা লেখেন, 'আইসিস তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইরানের রাফেজিদের (শিয়া) ওপর আক্রমণ করেনি। এত বছর আইসিস তার ক্রোধ দমিয়ে রেখেছে। তার নিকৃষ্টতম শত্রু ইরানের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো থেকে বিরত থেকেছে। নিজেদের এলাকায় এসব রাফেজিকে নিরাপদে বসবাস করতে দিয়েছে। এর সবই করেছে আল কায়েদার আদেশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে। ইরানে আল কায়েদার স্বার্থ ও সাপ্লাই লাইন নির্বিঘ্ন রাখার জন্য। ইতিহাস ইরান-আল কায়েদার এই গোপন প্রেমের উপাখ্যান লিখে রাখবে। জারকাবি ও বিন লাদেন হয়তো পরস্পরকে বিশ্বাস করত না, হয়তো একে অপরকে পছন্দও করত না, কিন্তু অভিন্ন উদ্দেশ্য তাদেরকে এক করে রেখেছিল—ইরাকে মার্কিন বাহিনী ও তাদের চ্যালাদের ঘোল খাওয়ানো।'

২০০২ সালের অক্টোবরেই আইমান আল জাওয়াহিরি ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ অঞ্চলে আমেরিকার যুদ্ধ গণতন্ত্র বিস্তারের লক্ষ্যে হবে না, সেটা হবে গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্ব থেকে ইসরায়েলের বিপক্ষ সামরিক শক্তি নির্মূল করার জন্য।

এক বছর পর বিন লাদেন এক বার্তায় ইরাকে তাঁর লোকজনকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তারা যেন প্রাচীন ইসলামি রাজধানীর দখলদারি ও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সজাগ থাকে। যার উদ্দেশ্য হবে 'গ্রেটার ইসরায়েল' বিনির্মাণ। তাঁর এই বার্তা আল জাজিরায় প্রচারিত হয়েছিল। এতে তিনি আরও বলেছিলেন, মেসোপটেমিয়া হবে ক্রুসেড-জ্যুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল, যা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করে নেবে। তাদের প্রতিরোধে বিন লাদেন শহুরে গেরিলা যুদ্ধের ও আত্মঘাতী হামলার পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে গোটা বিশ্বের মুজাহিদিনদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান, যা সার্ভিস ব্যুরো প্রতিষ্ঠার পর কখনো দেখা যায়নি।

তাঁর আহ্বানে তিনি একটি পুনশ্চও সংযুক্ত করে দেন। সেখানে বলেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাদ্দাম হোসেনের সমাজতন্ত্রী বাথিস্ট শাসন সবচেয়ে কার্যকর দোসর হতে পারে। তাই তিনি বাইরের শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য ঘরের শত্রুর সঙ্গে আপাত সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন। যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ ইসলামি বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিম-বাথিস্ট এই জোট গঠনের ফলাফল হয়েছে খুবই দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাণঘাতী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জল্লাদদের নেতা : ইরাকে জারকাবি ও আল কায়েদা

মিশন ইরাক : জারকাবি ও আল কায়েদা

দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আর সন্ত্রাসীরা একে অপরের দোসর—কথাটা বলেছিলেন ইরাকে মার্কিন সেনাবাহিনীর এক ব্রিটিশ উপদেষ্টা। সম্পর্কটা মূলত প্রতীকী। বস্তুত, আজকের আইসিস যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, এর পেছনে—তারা বলতে না চাইলেও—তাদের জোট ও প্রক্সির অবদানই বেশি। যদিও আদর্শিক ভিন্নতার কারণে বাহ্যত এই জোট ছিল অসম্ভব। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর জারকাবি তাঁর একসময়ের ঘোষিত 'নিকটতম শত্রু' সাদ্দামের বাথিস্ট সেনাবাহিনীর ধ্বংসস্তূপ থেকেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর সেরা যোদ্ধাদের। নর্দান ও সেন্ট্রাল ইরাকে আইসিসের বর্তমান অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার মূল কারিগর তাঁদের এই জোট গঠন।

সাদ্দামের ছায়া

ইরাক দখলের কয়েক মাসের মধ্যেই মার্কিন বাহিনী ওসামা বিন লাদেনের আদেশের মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীর বৈচিত্র্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সাদ্দাম হোসেন যদিও আমেরিকান আগ্রাসনের আশঙ্কা করেননি কিন্তু তিনি তাঁর বাহিনীকে দুর্দিনের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, ইরাকের অভ্যন্তরীণ শিয়া কিংবা কুর্দিদের বিদ্রোহের আশঙ্কায়। প্রথম গালফ ওয়ারের পর থেকেই ইরাকে আমেরিকার মদদে কুর্দি ও শিয়াদের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও আমেরিকার মৌন সমর্থন নিয়েই! ভবিষ্যতে এ ধরনের যেকোনো ঝামেলা রুখতে সাদ্দাম একটি আন্ডারগ্রাউন্ড বাহিনী গড়ে তোলেন। পাশাপাশি নিয়মিত বাহিনীকেও শক্তিশালী করেন। যথেষ্ট পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করেছেন তিনি।

বিশেষ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করেন—ফেদাইন সাদ্দাম। তাদেরকে মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলার সবুজ সংকেতও প্রদান করেন। দ্বিতীয় গালফ ওয়ারের[৫]

---

[৫] প্রথম গালফ ওয়ার বলতে আমেরিকা-ইরাকের প্রথম যুদ্ধকে বোঝানো হয়, যা ১৯৯১ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর শুরু হয়। আর ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন দ্বিতীয় গালফ ওয়ার হিসেবে পরিচিত। (অনুবাদক)

হিস্টরিতে মাইকেল গর্ডন ও জেনারেল বার্নার্ড ট্রেইনর লিখেছেন, 'প্রথম মার্কিন সেনাটা ইরাকে পৌঁছার বহু পূর্বেই গোটা দেশে সেফ হাউস, প্যারামিলিটারি বাহিনীর জন্য সামরিক সরঞ্জামাদি ও তাৎক্ষণিক বিস্ফোরক তৈরির কারখানার এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। এটা ছিল মূলত সাদ্দামের বিদ্রোহ দমনের পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তাঁর প্রধান হুমকিই ছিল এই বিদ্রোহীরা।'

কর্নেল ডেরিক হার্ভে, ইরাকে আমেরিকান হেডকোয়ার্টারে জেনারেল রিকার্ডোর অধীনে 'কম্বাইন্ড জয়েন্ট টাস্কফোর্স সেভেনে'র একজন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসার, অনুমান করেছিলেন ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর বিদ্রোহের মূল ধাক্কাটা আসবে সাবেক রেজিম সদস্যদের থেকে। মার্কিন ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড অবশ্য বলেছিলেন, 'পকেট অব ডেড-ইন্ডার্স' (ছোট ছোট গেরিলা দল, ১০-২০ সদস্যের) থেকে আসবে মূল বিদ্রোহ। কিন্তু হার্ভের কথাই সত্য হয়েছিল।

হার্ভের অনুমান অনুযায়ী সাদ্দামের স্পেশাল রিপাবলিক গার্ড, আল মুখাবারাত (ইরাকি ইন্টেলিজেন্স), ফেদাইন সাদ্দাম ও রাষ্ট্রীয় মদদপ্রাপ্ত মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোর ৬৫ থেকে ৯৫ হাজার সদস্য চাকরি হারায়। প্রসিডেন্ট বুশের নিয়োগকৃত কোয়ালিশন প্রভিশনাল অথরিটির প্রধান পল ব্রেমার ইরাকি সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কলমের এক খোঁচাতেই এতগুলো লোক চাকরি হারায়। সঙ্গে যোগ হয়েছিল ব্রেমারের ডি-বাথিফিকেশন বা বাথ পার্টি নির্মূল অভিযান, যার ফলে আরও অসংখ্য মানুষ চাকরি হারায়। ব্রেমার বাগদাদে পৌঁছার ১০ দিন পরই এই বিতর্কিত নীতির ঘোষণা দেন। গোদের ওপর বিষফোড়া হিসেবে ছিল সাদ্দামের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজজাত ইবরাহিম আদ দৌরি কর্তৃক পরিচালিত ব্ল্যাক মার্কেট। সাদ্দাম এর অনুমোদন দিয়েছিলেন জাতিসংঘের অবরোধ মোকাবিলা করতে। ফলে রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট একটি মাফিয়াচক্র গড়ে ওঠে। ইজজাত ইবরাহিম আদ দৌরি ছিলেন নকশবন্দী সুফি তরিকার সদস্য, যারা নিজেদের সরাসরি প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের (রা) উত্তরসূরি বলে দাবি করে থাকে। সাদ্দামের জন্মস্থান তিকরিতের আল দাওর জেলায় দৌরির জন্ম, সালাহুদ্দিন প্রদেশে।

সুন্নি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে বাথ পার্টির ঝানু নেতা ছিলেন এই দৌরি। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বিনা বাধায় রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারির অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজের সুফিদলকে সজ্জিত করেছিলেন। ২০০৬ সালে সাদ্দামের ফাঁসির পর তারা 'আর্মি অব দ্য ম্যান অব নকশবন্দী' নামে দল গঠন করে। ইরাকের সুন্নি গেরিলা দলগুলোর মাঝে এটি ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। এরাই ২০১৪ সালে আইসিসকে মসুল দখলে সহায়তা করে।

আদ দৌরি ছিলেন একজন পাকা স্মাগলার। তাঁর গাড়ির সাম্রাজ্য ছিল। ইউরোপের নামীদামি সব ব্র্যান্ডের গাড়ি জর্ডানের আকাবা পোর্ট দিয়ে ইরাকে পাচার করতেন। অত্যন্ত সুগঠিত চ্যানেল ছিল। হার্ভের ভাষ্যমতে, 'আদ দৌরির গাড়ির শো রুম ছিল। সেখানে এসব গাড়ি বিক্রি ও মেরামত করা হতো। গাড়ির পার্টস তৈরি হতো। ফলে যানবাহন এবং এগুলোতে বহনযোগ্য বিস্ফোরক তৈরিতে ওস্তাদ ছিল সে। তার উদ্ভাবিত ভিবিআইইডি[৬] (ভেহিকল বর্ন ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) ছিল মার্কিনি দখলদারদের সাক্ষাৎ যম।'

যুদ্ধের আগে সাদ্দামের আরও একটি বিপ্লব-নিরোধক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর সরকার মোটামুটি সেক্যুলারই ছিল। কিন্তু প্রথম গালফ ওয়ারের পর বহির্বিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে তিনি ইরাকের ইসলামাইজেশন করেন। উদ্দেশ্য ছিল ইরানের মোল্লাতন্ত্র ও জিহাদিস্টদের 'নিকট শত্রু' থিওরি থেকে নিজ ক্ষমতা রক্ষা করা। এর অংশ হিসেবে তিনি ইরাকের পতাকায় আল্লাহু আকবার সংযুক্ত করেন। কঠোর সাজাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। বেশ কিছু ছিল ইসলামি শরিয়া আইন থেকে নেওয়া। যেমন চুরি করলে হাত কাটা যাবে, সামরিক তথ্য ফাঁস করলে কান কেটে দেওয়া।[৭] এসব সামরিক কর্মকর্তাকে ইরাক-ইরান যুদ্ধে অঙ্গ হারানো সৈনিকদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য কান কাটার পাশাপাশি তাদের কপালে গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা দিয়ে দেওয়া হতো। অবশ্য ধর্মীয় সাজা প্রবর্তনের আরেকটি আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যও ছিল। আন্তর্জাতিক অবরোধের ফলে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে জনগণের দৃষ্টি ফেরানো।

দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য নারীদের চাকরিতে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাদ্দামের 'ইসলামিক ফেইথ ক্যাম্পেইন' চালু। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি আদর্শের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টির আদর্শকে মিশিয়ে একটি হাইব্রিড আদর্শ দাঁড় করানো। এই প্রকল্পের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাদের আলোচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট আদ দৌরিকে।

ফেইথ ক্যাম্পেইন ছিল কালোবাজার অর্থনীতি ও নতুন ধর্মমতের মিশ্রণে ভয়ংকর এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। রাষ্ট্রের কিছু 'উদীয়মান' ধার্মিক রাষ্ট্রীয় খরচে হজ করার সুযোগ পান। বাকিদের বখরা হিসেবে দেওয়া হয় রিয়েল এস্টেট, নগদ নারায়ণ কিংবা চোখ-ধাঁধানো গাড়ি। মার্কিন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের আরেকজন অফিসার কর্নেল জ্যল রেবর্ন, যিনি ইরাকে কর্মরত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ইরাকের ইতিহাস নিয়ে একটি বই লেখেন, তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'ফেইথ

---

[৬] একধরনের বিশেষ বিস্ফোরক, যা গাড়িতে স্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হতো। (অনুবাদক)
[৭] এটি শরিয়া আইন নয়। (অনুবাদক)

ক্যাম্পেইন দ্বারা সাদ্দামের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ধর্মীয় মহলে বাথ পার্টির চরদের অনুপ্রবেশ করানো। তার বিশ্বাস ছিল, এভাবে সে পার্লামেন্ট থেকে মসজিদ সবই নজরদারি করতে পারবে। ইসলামি আন্দোলনকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে পাশার দান উল্টে গিয়েছে। যেসব বাথিস্টকে সে মসজিদে পাঠিয়েছে চরবৃত্তি করার জন্য, তারা সালাফিজমের দীক্ষা পেয়ে সাদ্দামের চাইতে ধর্মের প্রতিই বেশি ঝুঁকে গিয়েছে।'

রেবর্ন আরও লেখেন, 'ফেইথ প্রোগ্রামের আওতায় সাদ্দাম যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তাদের অনেকেই অনুভব করতে শুরু করে যে তাদের পাপের বোঝা অনেক ভারী। প্রায়শ্চিত্ত করার তীব্র তাড়না তাদেরকে বাথিস্ট আদর্শ এবং অবশেষে খোদ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এই সালাফি-বাথিস্টদের কেউ কেউ আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকারেও জায়গা করে নেয় এবং এখানে থেকেই মার্কিনবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যায়!'

তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খালাফ আল উলইয়ান, যিনি সাদ্দামের সেনাবাহিনীর একজন হাই-র‍্যাঙ্কড অফিসার ছিলেন। এবং সাদ্দাম-পরবর্তী পার্লামেন্টে সুন্নি ইসলামিক দল তাওয়াফফাকের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। মার্কিন আগ্রাসনের আগেই সাদ্দামের ফেইথ ক্যাম্পেইনের অসাড়তা প্রকাশিত হয় মাহমুদ আল মাশহাদানির দলত্যাগের মাধ্যমে। ফেইথ ক্যাম্পেইনের ফলে তিনি একজন পুরোদস্তুর সালাফিতে পরিণত হন। এবং সে সময়ই ফেইথ ক্যাম্পেইনের সরকারি চামচাদের ওপর আক্রমণের দায়ে কারান্তরীণ হন। (মাহমুদ আল মাশহাদানি ২০০৬ সালে ইরাকের কাউন্সিল অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। এর এক বছর আগে তিনি ও আল উলইয়ান একসাথে ইরাকি পার্লামেন্টে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অংশ নেন।)

দীর্ঘ এক দশক ইরাকের বিদ্রোহ 'কারা এবং কীভাবে' পরিচালনা করেছে, এ বিষয়ে গবেষণার পর হার্ভি লেখেন, ফেইথ ক্যাম্পেইন বাথ পার্টির সদস্যদের সপ্তাহে এক দিন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা ঘরে বসে ধর্ম পালনের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এটি ছিল ইরাকি ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ইরাকের মুসলিম স্কলারদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নজরদারি ও তাদের নিকটে পৌঁছার নকশা। যেমন আনবার প্রদেশের প্রভাবশালী সুন্নি ধর্মীয় নেতা, অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম স্কলার্সের চেয়ারম্যান শায়খ হারিছ আদ দারির সাথেও তারা কাজ করেছে। এমনকি ফালুজার বিদ্রোহী মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিলের প্রধান আবদুল্লাহ আল জানাবিও ছিলেন একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট! তিনি অবশ্য সালাফি ছিলেন না। তিনি ছিলেন আদ দৌরি ও নকশবন্দীয়া তরিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর প্রকৃত চরিত্র খুঁজে বের করা

মুশকিল। কারণ তিনি কখনোই কট্টরপন্থী ধার্মিক ছিলেন না। ছিলেন একজন আরব জাতীয়তাবাদী।

তাঁদের সবার ক্ষেত্রে যে কমন বিষয়টা কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে তাঁদের গোত্রপ্রীতি ও স্বজাত্যবোধ। এটিই তাঁদেরকে এককাট্টা করেছে। তাঁদের সুন্নি পরিচয়, হারানো ক্ষমতা ও সম্মান তাঁদেরকে বিদ্রোহী হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। অনেকেই সুন্নি বিদ্রোহের সুলুকসন্ধানে এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা মিস করে যায়। আপনি শিয়াদের সঙ্গে কথা বললে দেখবেন, তারা একে এভাবেই মূল্যায়ন করছে।

মার্কিন আগ্রাসনের পর আদ দৌরি ও তাঁর বাথিস্ট নেটওয়ার্ক পুরোটাই সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। বাশার আল আসাদের পিতা হাফিজ আল আসাদের সঙ্গে সাদ্দামের দীর্ঘ বৈরিতা সত্ত্বেও বাশার তাদেরকে জামাই আদর করেন। কারণ তিনি তাদেরকে পাশের দেশে বুশের কর্মকাণ্ডে বাগড়া দেওয়া, গোলযোগ পাকানো আর বিদ্রোহের রসদ হিসেবে দেখেছেন। আদ দৌরি বাশার আল আসাদকে প্রস্তাব করেছিলেন সিরিয়া ও ইরাকের বাথ পার্টিকে একীভূত করে একটি বহুজাতিক পার্টিতে পরিণত করতে। আসাদ এতে রাজি হননি। এমনকি একপর্যায়ে তিনি আদ দৌরিকে নিজের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেন। (কিন্তু পরে সিরিয়া ইরাকি বাথ পার্টি এবং আল কায়েদার প্রধান স্পনসরে পরিণত হয়।)

যে সত্যটা সাদ্দাম, বাশার আল আসাদ, জারকাবি ও বিন লাদেন বহু আগে বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর রক্তক্ষয় ও ভোগান্তির পর অনুধাবন করতে পেরেছে, তা হলো ইরাকে মার্কিনিদের প্রধান হুমকি ও প্রতিপক্ষ জিহাদিরা নয়, বাথিস্টরাও নয়; বরং সুন্নি বিদ্রোহীরা। দেশের ২০ শতাংশ জনগণ ছিল সুন্নি আরব। শিয়া জনসংখ্যা ৬০ শতাংশ। সুন্নি কুর্দিদের সংখ্যা ১৭ শতাংশ। বাকিরা ছিল খ্রিষ্টান, এসিরিয়ান, ইয়াজিদি, অনারব সুন্নি ও তুর্কমানি শিয়া।

সাদ্দাম হোসেন দশক দশক ধরে ক্ষমতাচর্চা করেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাঁধে ভর করে এবং অনুন্নত ও অস্থির সংখ্যালঘুদের দমন করে। এ জন্যই প্রথম গালফ ওয়ারের পর সিনিয়র বুশ ইরাকের গোটা সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন শুধু সরকারপ্রধান পরিবর্তন করতে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল কুয়েতে নিয়োজিত ইরাকি সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সাদ্দামকে উৎখাত করা। সেই সঙ্গে তুলনামূলক অধিক সংস্কারপন্থী অথবা পশ্চিমাবান্ধব কোনো স্বৈরশাসককে ক্ষমতায় বসানো। বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র ইরাকের ক্ষমতার ভারসাম্যে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি করবে। হয়তো-বা ইরাকি সুন্নিরা যাকে নিজেদের জন্মগত অধিকার বলে মনে করে, তা ধ্বংস করে দেবে।

রেবর্ন তাঁর বইয়ে লিখেছেন এক স্থানীয় তাঁকে বলেছে, 'প্রথমে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্র ধরেনি। না বাথ পার্টি, না কোনো গোত্র, না শিয়ারা, এমনকি সুন্নিরাও নয়। কিন্তু যখন ২০০৩ সালের জুলাই মাসে আমেরিকা ইরাকে সরকার গঠন করে এবং সেখানে ১৩ জন শিয়া ও গুটিকয়েক সুন্নিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখনই শোরগোল ওঠে—আমেরিকানরা শিয়াদেরকে দেশ বর্গা দিয়ে দিচ্ছে। জনগণ নড়েচড়ে বসে। তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। গোত্রনেতারা আল কায়েদাকে স্বাগত জানান।'

ক্ষমতাচ্যুত 'সাদ্দামিস্টরা' নিজেদের শহরে ফিরে গিয়েছিল। ফুরাতের কোল ঘেঁষে নিজেদের গ্রামে নতুন করে জীবন শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক তখনই 'নতুন'দের আগমন ঘটে। সাদ্দামিস্টরা তাদেরকে নিজেদের হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও দখলদার মার্কিনিদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে নেয়। কিন্তু ইরাক নিয়ে মুজাহিদিনদের স্বপ্ন ছিল অন্য রকম।

জারকাবি-আমেরিকা মুখোমুখি

ইরাকে আবু মুস'আব আল জারকাবির ভয়াবহ উত্থান ঘটে ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট, যখন তিনি হেরাতের ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রবেশপথে লেখা 'তাওহিদ ওয়াল জিহাদ' নাম দিয়ে নিজ দলের আত্মপ্রকাশ ঘটান। সেদিনই তিনি বাগদাদস্থ জর্ডান দূতাবাস বোমা মেরে উড়িয়ে দেন। কারণ তখনো তার নাম্বার ওয়ান টার্গেট ছিল নিজ দেশের সরকার। এক সপ্তাহের কিছু সময় পর বাগদাদস্থ জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টার জারকাবির দ্বিতীয় শিকার হয়। ২৬ বছর বয়সী মরক্কোন যুবক আবু ওসামা আল মাগরিবি একটি ভিবিআইইডি চালিয়ে নিয়ে যায় জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি সের্গিও ভিয়েরা দ্য মেলোর জানালার ঠিক নিচে। দেয়ালের পাশে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে মেলোসহ আরও ২১ জন মারা যায়। দুই শতাধিক লোক আহত হয়। জারকাবি বলেছিলেন, তিনি মেলোকে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট করেছেন। কারণ সে ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইহুদিদের ইমেজ উজ্জ্বল করার চেষ্টায় ছিল। এই প্রচেষ্টার ভেতর ছিল মুসলিম ইন্দোনেশিয়া থেকে খ্রিষ্টান পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতায় কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান। জারকাবির যেসব পশ্চিমা সমর্থক তাঁর কার্যক্রমকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে দেখত, তারা এ ঘটনায় কিছুটা হতাশ হয়।

হার্ভির ভাষ্যমতে, '২০০৩ সালে জাতিসংঘে বোমা হামলা ও অন্যান্য আত্মঘাতী হামলায় বাথিস্টরা জারকাবিকে সহায়তা করে। আত্মঘাতী হামলাকারীদের সেফ হাউস ছিল স্পেশাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের

(এসএসও) কম্পাউন্ড ও এর অফিসার্স হাউজিং সংলগ্ন।' এসএসও ছিল যুদ্ধপরবর্তী ইরাকে সবচেয়ে ক্ষমতাধর নিরাপত্তা সংস্থা। এটি স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড ও স্পেশাল ফোর্স পরিচালনা করত।

হার্ভি লিখেছেন, 'বাথিস্টরা জারকাবিকে গাড়িটা দিয়েছিল, এটা সে ভিবিআইইডিতে রূপান্তর করেছে। আত্মঘাতী হামলাকারীকে কম্পাউন্ডে ঢোকার ব্যবস্থাও তারা করে দিয়েছে। আমরা জারকাবির এই আক্রমণ সম্পর্কে এত বিস্তারিত জানতে পেরেছি, কারণ একজন আত্মঘাতী হামলাকারী মরেনি। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি! ২০০৩ সালের অক্টোবরে বিদেশি মুজাহিদিনদের লক্ষ্য করে বিন লাদেনের আহ্বান বিপুল সাড়া জাগায়। তত দিনে বাথিস্টরা "র‍্যাট লাইন" প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন সংগঠন থেকে ইরাকে বিদেশি যোদ্ধা আনার করিডর।'

তিন বছর বা কিছু ক্ষেত্রে তারও বেশি সময় ধরে জিহাদিস্টদের এসএসওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। জেনারেল মুহাম্মদ খাইরি আল বারহাভি ছিলেন এই যোগাযোগের মাধ্যম। তিনি এসএসওর সদস্যদের প্রশিক্ষণদানের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর কৌশল ছিল যদি আপনি জানতে পারেন কে বিদ্রোহী এবং তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখেন, তবে তাদের আক্রমণ থেকে আপাতত আপনি নিরাপদ। পরবর্তী সময়ে মেজর জেনারেল ডেভিড প্যাট্রিয়াস আল বারহাভিকে মসুলের পুলিশ অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেন। তারপর ১০১তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন একই শহরে। ডেভিড প্যাট্রিয়াসের মতে, আল বারহাভি 'অন্ধকার জগতে' পা বাড়িয়েছিলেন বাধ্য হয়ে, স্বেচ্ছায় নয়।

হার্ভি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, বারহাভি যখন পুলিশপ্রধান ছিলেন, তখনো আল কায়েদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। মসুলের পুলিশ বিভাগে থাকাকালে এবং পরবর্তী সময়ে স্থানীয় অ্যাওয়াকেনিং[৮] (সচেতনতা) কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পরও তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। গোত্রীয় রীতি অনুযায়ী এটি ছিল খুবই বুদ্ধিদীপ্ত একটি পদক্ষেপ। যথাসম্ভব বেশি জায়গায় সম্পর্ক রাখা।

শিয়া নিধন

২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জারকাবির দল বিদ্রোহী দল হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ওয়াশিংটনভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জেমসটন ফাউন্ডেশনের

---

[৮] অ্যাওয়াকেনিং হচ্ছে ইরাকে মার্কিন বাহিনীর সুন্নি বিদ্রোহীদের দমন করার একটি প্রোগ্রাম। এর আওতায় স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও মাসিক অর্থের বিনিময়ে সুন্নি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হতো। আরবিতে একে সাহওয়া বলা হয়। (অনুবাদক)

পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, মার্কিনিরা যাদেরকে সুন্নি আরব বলে অভিহিত করত, তাদের ১৪ শতাংশ জারকাবির নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মিডিয়াতে জারকাবির দল বিপুল প্রচার পেয়েছে। এর কারণ ছিল কলিন পাওয়েল তাঁকে খুব বেশি হাইলাইট করেছেন। তা ছাড়া গোটা ইরাকে মার্কিন বাহিনীর ওপর যেসব আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে, তার ৪২ শতাংশ ছিল জারকাবির দল কর্তৃক পরিচালিত। এগুলো ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এবং মার্কিন বাহিনীর জন্য সাক্ষাৎ দুঃস্বপ্ন।

যে মাসে তাওহিদ ওয়াল জিহাদ জর্ডান দূতাবাস ও জাতিসংঘ অফিসে হামলা করে, সে মাসেই তারা ইরাকের সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক রেভল্যুশন ইন ইরাকের প্রধান আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ বাকিরকে ভিবিআইইডি হামলায় হত্যা করে। এই আত্মঘাতী ভিবিআইইডি বহন করেছিল জারকাবির শ্বশুর ইয়াসিন জাররাদ। আক্রমণটি হয়েছিল নাজাফে, শিয়াদের সবচেয়ে পবিত্রতম মাজারগুলোর একটি ইমাম আলী মসজিদে। একশর মতো লোক নিহত হয়েছিল। জারকাবি কখনোই ইরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ গোপন করেননি।

২০০৪ সালের জানুয়ারিতে জারকাবির পাঠানো একটি চিঠি কুর্দিদের হস্তগত হয়। বিন লাদেনের উদ্দেশে তিনি তা লেখেছিলেন। এতে লেখেন, 'শিয়ারা হচ্ছে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক, গর্তে লুকানো সাপ, ধূর্ত, বিষধর বৃশ্চিক, গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়ানো শত্রু এবং দেহে প্রবিষ্ট বিষ। স্থিরচিত্ত অণুবীক্ষণকারী ও অনুসন্ধানী মন সহজেই বুঝতে পারবে যে শিয়াইজম হচ্ছে ভয়াবহ বিপদ ও সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ।' তারা কবরপূজারি, মূর্তিপূজক ও বহুশ্বেরবাদী।

গণহত্যার হুমকি কাজেও পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইরাকের রাজনীতির সবচেয়ে বড় ও বাস্তব সমস্যা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী শিয়া রাজনীতিকদের ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। যদিও এটি তখন অঙ্কুরিত হচ্ছিল মাত্র, কিন্তু জারকাবি একে পুরোমাত্রায় কাজে লাগান। এসব শিয়া রাজনীতিবিদের মাঝে অনেকেই ছিল ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের চর কিংবা দালাল। জারকাবির ঘোষিত শত্রুদের মধ্যে ছিল বদর বাহিনী, সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক রেভল্যুশন ইন ইরাকের সামরিক শাখা ও আরেকটি রাজনৈতিক দল, যার নাম থেকে বোঝা যেত সেটি একটি খোমেনিস্ট ফাউন্ডেশন।

বদর ব্রিগেড সুন্নিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের জন্য কুখ্যাত ছিল। জারকাবি একে আলাদাভাবে টার্গেট করেন। ফলে সোশিওপলিটিক্যাল ক্ষোভ পরকালীন চেতনার প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। বদর ব্রিগেড তাদের শিয়া লেবাস ছেড়ে পুলিশ আর আর্মির পোশাকে নিজেদের মুড়িয়ে দেয়। তারা রাষ্ট্রের এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে

ব্যাপকমাত্রায় নিজ ক্যাডারদের অনুপ্রবেশ করাতে শুরু করে। এবং দেশ ও জাতির সুরক্ষার নামে সুন্নিদের ওপর ঘৃণা উগরাতে শুরু করে।

এই সমস্যা সমাধানে জারকাবির প্রেসক্রিপশন ছিল একটি গৃহযুদ্ধ শুরু করা। শিয়াদেরকে তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক স্থাপনাসহ যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই আক্রমণ করা। ফলে শিয়ারা সুন্নিদেরকে নিজেদের জলাতঙ্ক দেখিয়ে দিতে বাধ্য হবে। তাদের লুকানো দাঁত ও সুন্নিদের বিরুদ্ধে হৃদয়ে পুষে রাখা ঘৃণার উদ্‌গিরণ ঘটাবে। যদি এই কৌশল কার্যকর হয় এবং শিয়াদের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে টেনে আনা যায়, তবে বাকি সুন্নিদেরও জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে। যখন সাবাইনদের (শিয়া) হাতে নিজেদের অত্যাসন্ন ধ্বংস আর অনিবার্য অবমাননাকর মৃত্যু চোখের সামনে দেখবে, সুড়সুড়িয়ে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবে।

বর্তমানে আইসিস ইরাক ও সিরিয়ায় জারকাবির এই তত্ত্বকে কাজে লাগাচ্ছে। এমনকি তাদের অফিশিয়াল প্রপাগান্ডাতেও এটা উল্লেখ করেছে। শিয়াদের টার্গেট করার মাধ্যমে তারা জারকাবির পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, যেন শিয়ারা প্রতিক্রিয়া দেখায় ও অতিরিক্ত প্রতিশোধ নেয়। তাহলে বাকি সুন্নিদেরকে তাদের দলে ভেড়ানো সহজ হবে। ২০১৪ সালের জুনে তিকরিতে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাবেক ঘাঁটি ক্যাম্প স্পেইচার দখল করার পর বাগদাদির সৈন্যরা গর্বভরে বলেছে যে তারা ৭০০ শিয়াকে হত্যা করেছে। তারা সবাই ছিল ইরাকি আর্মির আত্মসমর্পণকারী সদস্য। সংখ্যাটা একটু বাড়িয়ে বলেছে হয়তো, তবে খুব বেশি নয়। কারণ হিউম্যান রাইটস ওয়াচও পরবর্তী সময়ে শিয়া গণহত্যার বিভিন্ন স্থান আবিষ্কার করেছে, যেখানে অন্তত ৭৭০ জন শিয়াকে হত্যা করা হয়েছে।

আইসিস যেদিন মসুল দখল করেছে, ঠিক সেদিনই তারা বাদাউশ জেলখানা থেকে প্রায় দেড় হাজার বন্দীকে টেনেহিচড়ে বের করে আনে। সুন্নি, খ্রিষ্টান ও শিয়াদেরকে আলাদা করা হয়। প্রথমোক্ত দুই গ্রুপকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর শিয়াদের প্রথমে নির্যাতন ও লুণ্ঠন করা হয়। তারপর লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলে।

টেলিভিশনে শিরশ্ছেদ সম্প্রচার

জারকাবি আরেকটি ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন। ভয়াবহ নৃশংসতা এবং সেগুলো মিডিয়ায় সম্প্রচার, যা আজকে আইসিস কমান্ডাররা অনুসরণ করে। শিরশ্ছেদ ও পশ্চিমা মিডিয়ার মনোযোগ তিনি খুব উপভোগ করতেন। ২০০৪ সালে আমেরিকান কন্ট্রাক্টর নিকোলাস বার্জকে নিজ হাতে হত্যা করেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেই ভিডিও গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। হত্যাদৃশ্যের উপস্থাপনাও ছিল

গুরুত্বপূর্ণ। আইসিসের হাতে নিহত জেমস ফোলি, স্টিভেন সল্টফ ও পিটার ক্যাসিংয়ের মতো বার্জকেও গুয়ান্তেনামোর মতো কমলা রঙের পোশাক পরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসানো হয়। নিজের পরিচয় দিতে বলা হয়। হত্যার আগে জল্লাদ তার ওপর শাপ-শাপান্ত করে। অতঃপর গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই দেওয়া হয়। আইসিস সাধারণত ভিডিওগুলো এডিট করে সম্প্রচার করত। কিন্তু বার্জের ক্ষেত্রে পুরো হত্যাদৃশ্যই সম্প্রচারিত হয়। আইসিস প্রবাহিত রক্তও অফস্ক্রিনে রাখত কিন্তু বার্জের ক্ষেত্রে তাও হয়নি।

তার হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য প্রচারিত হওয়ার আগেই মার্কিনিরা তার মরদেহ খুঁজে পায় এবং তার পরিবারকেও জানিয়ে দেয়।

২০০৪ সালে আল কায়েদার সৌদি শাখা থেকে প্রচারিত ভয়েস অব জিহাদ ম্যাগাজিনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আবু আবদুর রহমান ইবনে সালেম আশ শামরানির একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সে নিজেও এক মিসরীয় নাগরিকের শিরশ্ছেদ করেছে। জারকাবির শিরশ্ছেদ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সে লেখে, 'হে হত্যাকারীদের নেতা আবু মুস'আব জারকাবি, আল্লাহর সহায়তায় সরল-সঠিক পথে অবিচল থাকো, আল্লাহর মদত নিয়ে একসাথে মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জিহাদি সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে দুষ্কৃতকারী, ভণ্ড ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ... তাদেরকে (সৌদি সেনাবাহিনীর যেকোনো সদস্য) কোনো দয়া দেখিয়ো না।'

জারকাবির ট্রেডমার্ক ছিল 'জল্লাদদের নেতা' (Sheik of the Slaughterers)। তিনি তিন সদস্যের একটি মিডিয়া টিম গঠন করেছিলেন, যারা কম্পিউটার এডিটিং সফটওয়ার ব্যবহারে দক্ষ ছিল। তবে ইন্টারনেট ব্যবহারে ছিল তুলনামূলক কাঁচা। আইসিস জারকাবির এই স্কোয়াডকে সুগঠিত করে। নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া ফিড ও অনলাইন চ্যানেল তৈরি করে। তবে দুজেনের হত্যাকাণ্ড ও হত্যাদৃশ্য ধারণ প্রক্রিয়া ছিল মোটামুটি একই।

সব মুজাহিদিন জারকাবি কর্তৃক মুসলিম হত্যা সমর্থন করেনি, নিহত ব্যক্তি শিয়া হলেও। স্পষ্টভাষী ও প্রভাবশালী সমালোচকদের একজন ছিলেন খোদ জারকাবির গুরু আল মাকদিসি। তিনি জর্ডানে জেলখানা থেকে জারকাবির উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে তাঁকে তিরস্কার করে লেখেন, 'মুজাহিদিনদের পবিত্র হাত নিরপরাধ মানুষের রক্তে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকো।' সিআইএর সাবেক গবেষক ব্রুস রিডেলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এই চিঠি সত্য নাও হতে পারে। কারণ চিঠি প্রকাশের কিছুদিন পরই জর্ডান কর্তৃপক্ষ আল মাকদিসিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ গৃহে নজরবন্দী করে রাখে। ফলে মুজাহিদিনদের মাঝে কানাঘুষা ছড়িয়ে পড়ে যে জারকাবিকে মাকদিসির তিরস্কার হয়তো এডিট করে দেওয়া হয়েছে অথবা জিআইডি কর্তৃক বিদ্রোহীদের বিপক্ষে

সাইকোলজিক্যাল ওয়ার বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশ হিসেবে লেখা হয়েছে, তাতে তাঁর নাম বসিয়ে দিয়েছে।

যদিও জারকাবি স্বীকার করেছেন যে তাঁর গুরুর তিরস্কারে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছেন, এমনকি এই চিঠি পড়ার সময় তিনি কেঁদেছেন। কিন্তু মুসলিম হত্যা বন্ধে এর কোনো প্রভাব তাওহিদ ওয়াল জিহাদের ওপর পড়েনি। জারকাবি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভবিষ্যতে তিনি এ ধরনের ফতোয়া জারির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন। বর্তমানে মাকদিসি আইসিসের কট্টর সমালোচনা করে থাকেন। তিনি তাদের বর্বরতাকে ধর্মচ্যুতি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এদের বহুলপ্রচারিত নিষ্ঠুরতা ও সিরিয়ার স্থানীয় মুসলিম, সশস্ত্র গ্রুপগুলোর উন্মত্ততার কঠিন সমালোচনা করেছেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও মাকদিসির অনুসারীদের সঙ্গে আইসিসের হৃদ্যতায় কোনো ফাটল তৈরি হয়নি।

মাইকেল ডব্লিউ এস রিয়ান উল্লেখ করেছেন, আইসিসের নিজস্ব ম্যাগাজিন দাবিকের প্রথম সংখ্যায় তারা মিল্লাতে ইবরাহিম বা ইবরাহিম আ. এর পথের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, যা ১৯৮৪ সালে মাকদিসির প্রকাশিত ম্যাগাজিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাকদিসি গোটা বিশ্ব থেকে মুজাহিদিনদের আফগানিস্তানে হিজরত করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

জারকাবির নিবেদন

২০০৭ সালে পশ্চিম বাগদাদে ১৭ নিরীহ ইরাকিকে গুলি করে হত্যার কুখ্যাতির আগে ব্ল্যাকওয়াটার আরও একবার শিরোনাম হয়েছিল। তিন বছর আগে। আনবার প্রদেশের এক রেল ব্রিজ থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা মরদেহের বদৌলতে। তখন থেকে এখনো পর্যন্ত ফালুজা মার্কিন আগ্রাসীদের জন্য পৃথিবীতে নরকের প্রতিরূপ হিসেবে স্বীকৃত এবং হাজার হাজার নিরীহ ইরাকির রক্তে রঞ্জিত। আনবারের রাজধানী রামাদি ও ফালুজায় ২০০৩-এর আগ্রাসনের পর বেশ বড়সড় সংখ্যায় মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি ছিল। সহজেই গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যাওয়া ও বাগদাদ দখল করে নেওয়ার ফলে তারা তাদের প্ল্যান পরিবর্তন করে এবং যেসব শহর পরবর্তী সময়ে সুন্নি বিদ্রোহীদের আক্রমণে মার্কিনিদের জন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, সেগুলোতে খুব অল্প সংখ্যক সেনা মোতায়েন করে।

অতীত থেকে শিক্ষা নিতে তারা ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। হার্ভির বর্ণনা অনুযায়ী, ফোরাতের তীরবর্তী গ্রামগুলো শুধু সুন্নি বিদ্রোহীদের প্রাণকেন্দ্রই ছিল না, বরং বাথিজমেরও উৎস ছিল। মার্কিন বাহিনীর অগ্রাভিযানে সাদ্দামের দুই পুত্র উদে ও কুসে আনবার প্রদেশে পালিয়ে যান। ওয়ালেস ইসাম, ফালুজার বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকা একজন ফিলিস্তিনি এমবেডেড জার্নালিস্ট, নিশ্চিত করেন

যে সেখানকার বাথিস্ট, মুখাবারাত অফিসার ও রিপাবলিকান গার্ডের সদস্যরা যারা অস্ত্র ধারণ করেছিল, সবাই একবাক্যে বলেছে তারা সাদ্দাম হোসেনের জন্য লড়ছে না, তারা লড়াই করছে ইসলাম ও সুন্নিদের জন্য। মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের সদস্য নিকোলাস বার্জের শিরশ্ছেদ হয়েছিল ফালুজার উত্তর-পশ্চিম সংলগ্ন জালোন শহরে। এটি ছিল তাওহিদ ওয়াল জিহাদের প্রাথমিক গ্যারিসনগুলোর একটি।

২০০৪ সালে মার্কিন বাহিনীর ফালুজা পুনরুদ্ধারের অভিযান 'অপারেশন ভিজিল্যান্ট রিজলভ' তাদের জন্য কেয়ামত বয়ে আনে। বুশ প্রশাসনের ইরাক পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের অংশ ছিল ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও শাসনক্ষমতা ধীরে ধীরে ইরাকিদের হাতে সমর্পণ করা। যুদ্ধকবলিত কোনো জাতির সিকিউরিটি ফোর্সের জন্য এটা খুবই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া ইরাকি বাহিনী প্রস্তুত ছিল না, কিংবা তাদের সক্ষমতা ছিল না অথবা বলা চলে তাদের ইচ্ছা ছিল না দেশ শাসনের দায়িত্ব নেওয়ার। ফলে যুদ্ধের পুরো ঝাপটা মার্কিন মেরিন সেনাদের ওপর দিয়ে যায়। ফালুজায় একটি স্থানীয় ইরাকি ব্রিগেড দাঁড় করানোর মার্কিন প্রচেষ্টা বুমেরাং হয়ে যায়। বাহিনীর ৭০ শতাংশের বেশি সদস্য সদলবলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়।

আনবারে জারকাবির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল প্রিডাটর ড্রোন থেকে এয়ারস্ট্রাইক। জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন কমান্ডের অধীনে উত্তর বাগদাদের বালাদ এয়ারবেজ থেকে এই হামলা চালানো হতো। এর প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল।

জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন কমান্ড দাবি করে যে ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ তারা ১৪ জন প্রধান নেতার মধ্য থেকে ছয়জনকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। এর মাঝে জারকাবির নতুন আধ্যাত্মিক নেতাও ছিল। কিন্তু এই প্রচণ্ড বিমান হামলার পরও তাওহিদ ওয়াল জিহাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা অক্ষত থেকে যায়। বরং তাদের জনবল, অস্ত্রবল, শক্তি ও প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া এই যুদ্ধে তাদের আর কোনো 'ক্ষতি' হয়নি। এটি ফালুজার প্রথম যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এই যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, স্থানীয় ও বিদেশি যোদ্ধাদের অংশগ্রহণে বিশ্বের শক্তিশালী সুপার পাওয়ারকেও তছনছ করে দেওয়া যায়। জেনারেল ম্যাকক্রিস্টালের মূল্যায়ন অনুযায়ী, সাবেক সাদ্দাম রেজিমকে উড়িয়ে দিতে গিয়েও তাঁরা এত নাস্তানাবুদ হননি, জারকাবির হাতে যতটা হয়েছেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ ২০০৪ সালের অক্টোবরে প্রকাশ পায়। এর চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে, এ সময় জারকাবি ঠিক সেই কাজটাই করে বসেন, যা তিনি চার বছর যাবৎ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলেন - বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত!

জারকাবি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিন লাদেনের হাতে তাঁর বাইয়াতের কথা বিশ্বব্যাপী প্রচার করেন। আল কায়েদার সঙ্গে জারকাবির কোনো সম্পর্ক নেই—ডোনাল্ড রামসফেল্ডের এই ঘোষণার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় জারকাবি তাঁর বাইয়াতের কথা প্রচার করেন। অবশ্য রামসফেল্ড যা বলেছিলেন, তা ছিল মাত্র এক বছর আগে জাতিসংঘে কলিন পাওয়েলের বলা কথার ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত।

বিন লাদেনের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণার পর 'তাওহিদ ওয়াল জিহাদে'র নাম পরিবর্তন করে 'তানজিমুল কায়েদাতিল জিহাদ ফি বিলাদির রাফিদাইন বা আল কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অব টু রিভার্স রাখা হয়। ওয়াশিংটন একে সংক্ষেপে আল কায়েদা ইন ইরাক (একিউআই) নামে ডাকত।

জর্ডানের এই নাগরিক আল কায়েদার মিত্র হিসেবে ইরাকে প্রবেশের মাত্র এক বছরের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে আল কায়েদার ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে নাম লেখান। ফলে সৌদি বিলিয়নিয়ার বিন লাদেনের সাম্রাজ্য মেসোপটেমিয়াতেও বিস্তৃত হয়।

বাইয়াত গ্রহণের এক মাসের মাথায় জারকাবি এর সত্যতা প্রমাণের সিদ্ধান্ত নেন এবং দ্বিতীয় ফালুজা যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দেন। ২০০৪ সালের নভেম্বরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম ফালুজা যুদ্ধের শিক্ষা মার্কিনিদের বেশ ইয়াদ ছিল। তাই এবার আর ভুল করেনি। পুরো ১০ ব্যাটালিয়ন মার্কিন সেনা, দুই রেজিমেন্ট মেরিন ও কয়েক হাজার ইরাকি সৈন্যের বিশাল বহর নিয়ে রওনা দেয়। সঙ্গে ছিল এফএ-১৮ হার্নেট জেট, যা গোটা শহরে প্রায় দুই হাজার পাউন্ড বোমা ফেলে।

মেরিন সেনারা ফালুজায় গিয়ে আবিষ্কার করে আল কায়েদা ইন ইরাক সেখানে কী বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পাশাপাশি তারা একটি ভিডিও রেকর্ড খুঁজে পায়, যেখানে তারিখ অনুযায়ী শিরশ্ছেদের ভিডিও ছিল, আইকিউআই থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের অপরাধে তাদেরকে কিডন্যাপ করে হত্যা করা হয়েছিল। শহরে তিনটি টর্চার কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়। গাড়িবোমা তৈরির কারখানার সন্ধান পায়। মার্কিনিরা একিউআইর এক বিদেশি যোদ্ধার একটি জিপিএস ডিভাইস উদ্ধার করে, যা থেকে বিদেশি যোদ্ধাদের প্রবেশ রুট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রুটটি ছিল পূর্ব দিকে - সিরিয়া।

১০ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, যা ছিল শহরের এক-পঞ্চমাংশ। দুই সপ্তাহের যুদ্ধ ও তীব্র বিমান হামলায় গোটা শহর ভূতের নগরে পরিণত হয়। যুদ্ধের পর শুধু চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো অসংখ্য খানাখন্দে ভরা ধ্বংসস্তূপ অবশিষ্ট ছিল, পুরোপুরি বাস অযোগ্য এক শহর। পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই শহরের

অধিবাসীরা লাখে লাখে পালিয়ে যায়। গোটা শহর ছিল জনশূন্য। দ্বিতীয় ফালুজা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের এক-চতুর্থাংশ মারা যায়। ৮ হাজার ৪০০ জনের মাঝে ২ হাজার ১৭৫ জন। অবশ্য মার্কিনিদেরও চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। ৭০ জন মেরিন সেনা নিহত ও ৬৫১ জন আহত হয়। পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো ছিলই।

সংক্ষেপে, প্রথমটির মতো দ্বিতীয় ফালুজা যুদ্ধও আমেরিকার জন্য কোনো সুসংবাদ বয়ে আনেনি। বরং এই যুদ্ধ বিদ্রোহীদের জন্য শাপেবর হয়েছিল। তাদেরকে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপক প্রচারণার সুযোগ তৈরি করে দেয়। আমেরিকার কৌশলগত জয় ছিল খুবই সামান্য। এই যুদ্ধের পর বাথিস্ট ও জিহাদিস্টরা সেন্ট্রাল ও নর্দার্ন ইরাকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। মেরিন সেনাদের ধারণা, প্রথম দিনের তীব্র লড়াইয়ের পর জারকাবি ফালুজা থেকে মসুলে চলে যান। এটি হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী হেডকোয়ার্টার। বিন লাদেনও ফালুজার সাময়িক পরাজয়কে দীর্ঘ যুদ্ধে রূপান্তরের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন, এই যুদ্ধের বেশ কিছু শহিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ফালুজার ধ্বংসযজ্ঞের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট বুশকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, যেখানে জারকাবির সেনারা মুসলিম-শৌর্যের নব নব অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা করেছে।

ফালুজার দ্বিতীয় যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। যেমন এর আলোকে বিন লাদেন শত্রু-মিত্র ও সহযোগী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন। জারকাবির জন্য এটি ছিল ফান্ড সংগ্রহ ও মিত্র তৈরির মাধ্যম। জারকাবির একগুঁয়েমি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে বিন লাদেনের যে ইতস্তত ছিল, মুজাহিদিনদের মনোবল চাঙা করার লক্ষ্যে সেসব ঝেড়ে ফেলে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি জারকাবির বাইয়াত কবুল করার ঘোষণা দেন। পশ্চিমাদের ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিন লাদেন তাঁর বাইয়াতকে উষ্ণ অভিবাদন জানান এবং সেই সঙ্গে জারকাবিকে 'মহান ভাই' ও বিশ্বজুড়ে জিহাদি আন্দোলনকে একই সূত্রে গাঁথার নায়ক বলে অভিহিত করেন। পাশাপাশি তাঁকে আল কায়েদা ইন ইরাকের আমির হিসেবে নিয়োগ দেন।

অবশ্য এই উপাধি কিছুটা বিভ্রান্তিকর ছিল। কারণ ইতিমধ্যেই জারকাবির কার্যক্রম ইরাকের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি আরব সীমান্ত অতিক্রম করে তুরস্ক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রুস রিডেল উল্লেখ করেন, এ সময় আল কায়েদার কিছু তাত্ত্বিক জারকাবির কট্টর শিয়া বিরোধিতায় প্রভাবিত হন এবং তা সমর্থন করেন। যদিও এই মতবাদ আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়, এমনকি পরবর্তী সময়ে তাঁরা এর সমালোচনাও করেন।

একজন সৌদি তাত্ত্বিক শিয়াদেরকে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য জারকাবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিয়াদের এই বৈশিষ্ট্য তাদের মজ্জাগত, মধ্যপ্রাচ্যে সেই মোঙ্গল আক্রমণের সময় থেকে তারা মুসলিমদের পিঠে ছুরি মেরে আসছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই আক্রমণে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তৎকালীন বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইবনে তাইমিয়া—সালাফিজমের পুরোধা—শিয়াদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'শিয়াদের ব্যাপারে সতর্ক হও, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো, তারা মিথ্যাবাদী।' বর্তমানে মোঙ্গলদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে আমেরিকান দখলদাররা, সঙ্গে ইহুদিরা, যারা এদের পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ে। এ জন্য জারকাবিকে মনে করা হতো ৭০০ বছর আগের ঐতিহ্যবাহী ইসলামি ভাবধারার পুনঃপ্রবর্তক।

এই মতাদর্শ অনুযায়ী একজন মুসলিম অবশ্যই তাওহিদের তিনটি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে : আল্লাহ্র ইবাদত করা, শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং সঠিক ইসলামি ধারা অনুসরণ করা (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, অনুবাদক)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইবনে তাইমিয়া এই মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন শিয়া ও সুফি ধারাকে ইসলামের বাইরে ঠেলে দেওয়ার জন্য। কারণ শিয়াদের ইমামতের ধারণা ও সুফিদের বিভিন্ন রীতি একনিষ্ঠ তাওহিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[১] রিডেলের মতে, জারকাবি শুধু ইবনে তাইমিয়ার মতবাদের পুনরুজ্জীবনদানকারী হিসেবেই বরিত নন, বরং পাশ্চাত্যের কাফেরদের বিরুদ্ধে কার্যকর ফাঁদ তৈরির কারিগর হিসেবেও খ্যাত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের—যেমন ইউরোপ, জাতিসংঘ, ইরাকের শিয়া সরকার- সবাইকে এই কুকর্মের সহযোগী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৩০ কোটি সুন্নি মুসলিমকে সহিংসভাবে ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। সেই সৌদি ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন এতটাই শক্তিশালী, যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তিনি ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের এক বছর পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। ক্যাম্প ও অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছেন। ফিলিস্তিন টু ইয়েমেন, গোটা অঞ্চল থেকেই সদস্য সংগ্রহ করেছেন।

---

[১] শিয়াদের ইমামত ধারণার মূল কথা হচ্ছে রাসুল (সা)-এর পর তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ১২ জন ইমাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রথম ইমাম আলি রা., তারপর হাসান, হোসাইন- এভাবে ১২ জন। ইমামরা নবী-রাসুলদের মতো ক্ষমতাবান, তাঁরা চাইলে ধর্মে পরিবর্তন করতে পারেন। এখানে সুফি মতবাদ বলতে কবরপূজারিদের বোঝানো হয়েছে। যেমটা আমরা এখনো গোটা বিশ্বেই দেখতে পাই মারেফাতের নামে শিরক ও কবরপূজার হিড়িক চলছে। (অনুবাদক)

বর্তমানে আইসিসও মধ্যপ্রাচ্যে একই খেলায় মেতেছে। তাদের প্রকাশিত ম্যাগাজিন দাবিকের প্রতিটি সংখ্যাই জারকাবির একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু হয় : 'এই অগ্নিশিখা ইরাকে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কিন্তু এটি আল্লাহর ইচ্ছায় গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করে নেবে যতক্ষণ না দাবিকের ক্রুসেডারদের জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে।' বর্তমান আলেপ্পো/হালবের আশপাশের অঞ্চলকে দাবিক বলা হয়। এখানে আইসিসের উপস্থিতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা শক্তি সঞ্চয় করছে। এই অঞ্চলকে হাদিসে মালাহিমের কুরুক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মালাহিম হচ্ছে হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই।

মুসলিম ও ক্রুসেডারদের মাঝে এক ভয়াবহ লড়াই হবে দাবিকের আশপাশে। সোজা কথায় জারকাবির ভাষ্যমতে, আমেরিকার পরবর্তী গোরস্থান হবে উত্তর সিরিয়া। (তখনো সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়নি। এমনকি আরব বসন্তের কোনো ছিটেফোঁটাও তখনো পরিস্ফুট হয়নি। ইরাক যুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে। প্রায় দেড় দশক পর জারকাবির অনুমান সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। -অনুবাদক)

সুন্নি ত্রিভুজ

ফালুজা যুদ্ধের পর মুজাহিদিনরা ইরাকের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে মূলত জারকাবির রহস্যময় আদর্শ গোটা ইরাকে পরিবাহিত হয়, পুরো দেশে এর শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। বিশেষত, যেসব এলাকায় আমেরিকাবিরোধী মনোভাব ছিল প্রবল। যেখানে মার্কিনিদের অত্যাচারের পরিমাণ ছিল বেশি। বিদ্রোহীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল হাইফা স্ট্রিট। বাগদাদের সুরক্ষিত এলাকা গ্রিন জোনের প্রবেশপথ অ্যাসাসিন গেটের উত্তর থেকে টাইগ্রিস নদীর কোল ঘেঁষে ছুটে চলা মহাসড়ক। হাইফা স্ট্রিট ছিল নিপীড়িত সুন্নিদের অকুস্থল। সাদ্দামের আমলে এটি একটি সুন্নি অধ্যুষিত অভিজাত এলাকা ছিল। দেশের উচ্চপদস্থ এলিটরা এখানে থাকতেন। বিলাসব্যসনের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু ডি-বাথিফিকেশন তথা বাথ-পার্টিমুক্তকরণ অভিযানে তাঁরা সবাই চাকরি হারান। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার পথও চিরতরে রুদ্ধ হয়। ফলে তাঁরা কোনো না কোনোভাবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান। একসময়ের বাথিস্ট ও পরবর্তী সময়ে পার্টির বিপক্ষে যাওয়া সেক্যুলার শিয়া নেতা, যিনি সুন্নিদেরও আস্থাভাজন ছিলেন, আয়াদ আলাওয়ি দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ পাওয়ার পরও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

দেশে ফিরে যাওয়ার পর গর্ডন ও ট্রেইনর সেই ভয়ানক দুঃস্বপ্নের স্মৃতিচারণা করেছেন। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে হাইফা স্ট্রিটের নিরাপত্তায় একটি প্রায়

অকেজো ইউএস ব্র্যাডলি যুদ্ধযান নামানো হয়। হঠাৎ একদিন বিদ্রোহীরা তাদের ২৫ মিমি বন্দুকে তাওহিদ ওয়াল জিহাদের কালো পতাকাসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাইফা স্ট্রিট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মার্কিন ফার্স্ট ক্যাভালরি ডিভিশনের এক ব্যাটালিয়নকে। তারা এই স্ট্রিটকে লিটল ফালুজা ও রক্তবীথিকার লোহিত হৃদয় নামে অভিহিত করত। ২০০৫ সালে এই ব্যাটালিয়ন যখন দেশে ফিরে যায়, তাদের ৮০০ সদস্যের মধ্যে ১৬০ জন দেশের মাটিতে পুনরায় পা রাখার সৌভাগ্য হয়। তাদেরকে অবশ্য সরকার মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল।

বাগদাদের আরেকটি সুন্নি অধ্যুষিত এলাকা দোরা। সেখানে ফার্স্ট ক্যাভালরির আরেকটি ব্যাটালিয়ন নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় ফালুজার ছড়িয়ে দেওয়া অগ্নিশিখার অংশ হিসেবে জানুয়ারির নির্বাচনের আগে তারা দেখতে পায় এই শহরের দেয়াল অগণিত গ্রাফিতিতে ন্যুব্জ : 'নো নো আলাওয়ি, ইয়েস ইয়েস জারকাবি'।

মসুলের পতন

ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মসুল যুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলোতে শান্তই ছিল। কৃতিত্বটা ছিল ১০১তম প্যাট্রিয়াস এয়ারবোর্নের। কিন্তু অল্প কদিনেই সে শান্তি উবে যায়। ফালুজার দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর জারকাবি মসুলে পশ্চাদপসরণ করেন। মসুল বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। নিনাওয়ার এই প্রাদেশিক রাজধানী সব সময়ই সুন্নিপন্থী ছিল। শহরটি ছিল সাদ্দামিস্ট ও সালাফিতে ঠাসা। সঙ্গে ছিল ৭৫ শতাংশের বেশি বেকারত্ব। প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তানের নিরাপত্তাপ্রধান সাদি আহমেদ পিয়ার বলেন, এই উচ্চ বেকারত্বের ফলে মাত্র ১৫ ডলার দিয়েই যেকোনো স্থানীয়কে বিদ্রোহে জড়ানো যেত। মসুল যুদ্ধের সময় প্রথম সুযোগেই স্থানীয় ইরাকি পুলিশ ও আর্মি ভেগে যায়। তাদের স্টেশনগুলো বিদ্রোহীরা হয়তো উড়িয়ে দেয় অথবা অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করে দেয়। ফলে মসুল দখলে জারকাবির তেমন বেগ পেতে হয়নি। হার্ভির মূল্যায়ন অনুযায়ী, এর কারণ হচ্ছে শহরের পুলিশপ্রধান মোহাম্মদ খাইরি আল বারহাভি ছিলেন ডাবল এজেন্ট।

বারহাভি ইরাকি ইন্টেলিজেন্সের ডাবল এজেন্ট হোন কিংবা নিবেদিতপ্রাণ ইরাকি অফিসারই হোন, আসল বিষয় হচ্ছে জারকাবির ভয়ে মসুলিরা আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করতে ভীত ছিল। কোনো ইরাকি যদি আন্তরিকভাবেই আমেরিকানদের পক্ষ নিত, তবে তার পরিণতি হতো শোচনীয়। এক জেনারেলের ক্ষেত্রে হয়েছে কি! তিনি মার্কিনিদের পক্ষে লড়তে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। গোপনে এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। জারকাবিস্টরা কীভাবে তা টের পেয়ে যায়। হাসপাতালে গিয়ে সেখানেই তাঁর শিরশ্ছেদ করে আসে। অবশেষে

মসুলও ফালুজার পরিণতি বরণ করে। ইউএস এয়ারফোর্স, আর্মি ও ইরাকি স্পেশাল পুলিশ কমান্ডোদের বিশাল বহর মসুল পুনরুদ্ধারের অভিযানে নামে। তারা আল কায়েদা ও বাথিস্টদের মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি ও রকেটচালিত গ্রেনেডের প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

ঠিক এক দশক পর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। দ্বিতীয়বার মসুলের পতন হয় জারকাবি ও আদ দৌরির অনুচরদের (আইসিস) হাতে। ব্যবধান এতটুকু যে, এবার কোনো আমেরিকান নেই, যারা শহর পুনরুদ্ধার করে দেবে। আইসিস মাত্র এক সপ্তাহের অভিযানে গোটা মসুল করায়ত্ত করে নেয়। এখনো পর্যন্ত সেখানে তাদের শাসন বলবৎ আছে। (লেখক বই লেখার সময়ের কথা বলছেন, এখন সেটি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। -অনুবাদক)

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামিক স্টেট অব ইরাকের জন্ম

জারকাবির কৌশল ২০০৪ সালে প্রকাশিত ইদারাতুত তাওয়াহহুশ বা দ্য ম্যানেজমেন্ট অব স্যাভেজরির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবু বকর নাজির রচিত। অনলাইনে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এটি ছিল মূলত খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত যুদ্ধের রূপরেখা ও ইশতেহার। পর্যায়ক্রমে কীভাবে শত্রুরাজ্যকে অস্থিতশীল ও ক্লান্ত করে দেওয়া যাবে, সে কৌশল বাতলে দেওয়া হয়েছে এতে।

গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা আড়ালে থেকে কলকাঠি নেড়ে আসছিল। ফলে মুসলিমরা পরস্পরকে শত্রু ভাবছে, বিদেশিদের স্বার্থরক্ষায় নিজেরাই হানাহানি করে মরছে। তাই তাঁর স্ট্র্যাটেজির মূল পয়েন্ট ছিল আমেরিকাকে প্রক্সি যুদ্ধ থেকে সম্মুখযুদ্ধে টেনে নিয়ে আসা। যখন মুজাহিদিনদের হাতে তারা কচুকাটা হবে, মিডিয়ার তৈরি কাল্পনিক মার্কিন অপরাজেয়তার রূপকথা উধাও হয়ে যাবে। মুসলিমরা ঝলসে উঠবে। বুঝতে শিখবে যে নৈতিকভাবে বিকলাঙ্গ ও দুর্বল সুপারপাওয়ারকে তারাও চাইলে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পারে। নিজেদের ভেতর পবিত্র ভূমিগুলো শত্রুমুক্ত করার সুপ্ত বাসনা ধূমায়িত হবে। দলে দলে জিহাদের ময়দানে ছুটে আসবে।

তাঁর কৌশল অনুযায়ী পরবর্তী ধাপ হচ্ছে- অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। যেমন বিভিন্ন সামরিক-রাসায়নিক ইন্ডাস্ট্রি। উদাহরণ হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইন্ডাস্ট্রির কথা বলা যায়, যেগুলো মুরতাদ সরকারগুলোর মার্কিনি দোসর। আবু বকর নাজি আরও লেখেন, 'এ সময় শত্রুরা এদিক-সেদিক তাকানোরও ফুসরত পাবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে। দেশে গোলযোগ ও অস্থিরতা দেখা দেবে। গোটা অঞ্চল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করবে। এ সময় অবসন্ন অবশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাবে।' এ ক্ষেত্রে তিনি মিসরের উদাহরণ পেশ করেন, যা সে সময়ের প্রেক্ষাপটে সফল ছিল এবং পরোক্ষভাবে ইরাকের দিকেও ইঙ্গিত করেন। ইরাকে একটি ঐক্যবদ্ধ জিহাদি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে আশপাশের দেশগুলোকে কবজা করার পরামর্শ দেন।

আইসিসের সাবেক একজন ধর্মীয় নেতা বলেন, নাজিরের এই বইটি আইসিসের প্রাদেশিক নেতাদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। কিছু কিছু সাধারণ সৈনিক শিরশ্ছেদের বৈধতা প্রমাণে বইটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের মতে, শিরশ্ছেদ শুধু অনুমোদনযোগ্যই নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক আদিষ্টও বটে। আইসিসের মতে, দ্য ম্যানেজমেন্ট অব স্যাভেজরি বইয়ের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে, এর দ্বারা জিহাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় ইবাদতের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। নাজির মতে, বর্তমানে পেপার-পত্রিকায় জিহাদকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে যুবকদের জন্য জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। 'যারা অতীতে কখনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে, তারা জানে যে জিহাদ মানেই হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুরতা, আতঙ্কিত করা, অন্যদের ভয় দেখানো। আমি জিহাদ ও যুদ্ধের ময়দান নিয়ে কথা বলছি। ইসলাম নিয়ে নয়, সুতরাং কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না...। একজন যোদ্ধা যুদ্ধের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না সে প্রথম ধাপের শত্রুদের নির্মূল করে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।'

সুন্নিদের বয়কট

ইরাকে জারকাবির সফলতার পূর্বশর্ত ছিল তার শত্রু শিয়া ও আমেরিকানদের চিরতরে নির্মূল করা এবং তাদের যেকোনো ষড়যন্ত্রমূলক প্রজেক্ট থেকে সুন্নিদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা। যেমন ইরাকে গণতান্ত্রিক পুতুল সরকার বসানোর প্রচেষ্টা। এই মতাদর্শের ফলে জারকাবিস্ট ও বাথিস্ট উভয় গ্রুপের সুন্নিরা ২০০৫ সালের জানুয়ারির নির্বাচন বয়কট করে। এ জন্য তারা ব্যাপক প্রচারণা চালায়, সফলতা পায় আশাতীত। ইরাকের কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলোর একটি আনবার। সেখানে ১ শতাংশেরও কম সুন্নি ভোট দিতে যায়। নির্বাচনের ফলাফল ছিল ঠিক এক বছর আগে জারকাবি তাঁর এক চিঠিতে যেমনটা বলেছিলেন, 'শিয়া দলগুলো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, দাওয়া পার্টির প্রার্থী ইবরাহিম জাফরি প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

ইবরাহিম জাফরির নির্বাচনী প্রচারণায় ইরান থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সহায়তা আসে। তাঁর সরকার ভবিষ্যৎ ইরাকের সংবিধান রচনা ও যুদ্ধপরবর্তী ইরাকের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব পায়। এই বয়কট ছিল সুন্নি আন্দোলনের সর্বোচ্চ শিখর। কারণ এর ফলেই একিউআই—আল কায়েদা ইন ইরাক—একটি সাধারণ দল থেকে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এবং একই সঙ্গে বিদ্রোহ রাজপথের জনসমর্থন হারিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই সুন্নিরা নির্বাচন বয়কট করার পর শিয়াদের ওপর আক্রমণ তীব্রতর হয়। রাষ্ট্রীয়

প্রতিষ্ঠান ও ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ২০০৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাগদাদের দক্ষিণে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর হিল্লায় এক আত্মঘাতী হামলায় ১২০ জন শিয়া নিহত হয়। অধিকাংশই ছিল তরুণ। তারা ইরাক সিকিউরিটি ফোর্সে চাকরির আবেদন জমা দেওয়ার জন্য এসেছিল। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর তাল আফারে একিউআই শহরের মিশ্র অধিবাসিদের 'ছাঁটাই' করে ফেলে। খেলার মাঠ, স্কুলমাঠ, ফুটবল মাঠ সবকিছুই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। কর্নেল হার্বার্টের মতে, শহরটি ছিল বিদেশি যোদ্ধা প্রবেশের প্রধান পথ। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ছিল তারা দুটি মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে, একজনের বয়স তিন, অন্যজনের তেরো—পুলিশ রিক্রুটমেন্ট লাইনে আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্য ব্যবহার করে।

মরুরক্ষক

নতুন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণের মাধ্যমে ইরাকে মার্কিনিরা সামরিক সফলতা পায়। শুরু থেকেই স্থানীয় সৈন্যদের মতো ছিল গ্রিন জোন আর পেন্টাগনে বসা স্ট্র্যাটেজিস্টদের কথামতো চললে জটিল এই যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়। সুন্নি বিদ্রোহীদের সফলতার কারণ হচ্ছে আমেরিকানরা ইরাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশকে কাছে টানতে ব্যর্থ হয়েছে—গোত্র। ডি-বাথিফিকেশনের ফলে গোত্রগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাদ্দাম পরিবারতান্ত্রিক ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক এই ইউনিটগুলোর প্রভূত ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। আদ দৌরির তত্ত্বাবধানে এই গোত্রগুলোই সব ধরনের চোরাকারবার, কালোবাজার ও ব্যবসা পরিচালনা করত।

যুদ্ধের শুরুতে গোত্রগুলো কোয়ালিশন বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিল। প্রভাবশালী গোত্রগুলোর একটি, আলবু নিমরের গোত্রপ্রধান একটি চিঠি পাঠিয়েছিল এই মর্মে যে সে ইরাক সরকার ও সিপিএর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। তারা একটি বর্ডার গার্ড তৈরি করবে, যার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। ২০০৩ সালের অক্টোবরে জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের নিকট দেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত এক স্মারকলিপি থেকে এই তথ্য জানা যায়। এতে আরও বলা হয়, এই গোত্রনেতারা এখনো পর্যন্ত স্থানীয় শক্তির মূল উৎস। তারা সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখার জন্য কোয়ালিশন বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয়, তবে সম্ভাবনা আছে তারা নিজেদের আলাদা বিকল্প সরকার ও নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরি করবে, কোয়ালিশনবিরোধী জোট করবে অথবা গোত্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য অপরাধজগতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এই স্মারকলিপি কোনো ফলাফল বয়ে আনেনি।

হার্ভির ভাষ্য অনুযায়ী, ইরাকি সংস্কৃতি বোঝা ও গোত্রনেতাদের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে সিপিএ এবং মার্কিন বাহিনীর চাইতে জারকাবি বেশি দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি ও তাঁর সহচর ইরাকিরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন গোত্রে কার ক্ষমতা কতটুকু। ফলে তিনি আনবার ও ফোরাতের তীরবর্তী উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল জিহাদিস্টদের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে মাত্রাতিরিক্ত কঠোর করে ফেলা। কঠোর ইসলামি শরিয়া আইনের প্রয়োগ গোত্রনেতাদের বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তারা দমবদ্ধ পরিস্থিতিতে পতিত হয়। কিছু বিদেশি যোদ্ধার আচরণ ছিল পুরোপুরি উপনিবেশবাদী দখলদারের মতো। শেষ পর্যায়ে এদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্যই গোত্রগুলো এককাট্টা হয়েছিল। কালোবাজার ও চোরাচালানের ওপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে। একিউআই কঠোরভাবে নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে। বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে শুরু করে।

২০০৫ সালে তারা যখন আলবু নিমরের শেখকে হত্যা করে, তখন ফাস্ট মেরিন ডিভিশনের আলফা ৫৫৫ কোম্পানির কমান্ডার মেজর অ্যাডাম সাচ একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে নেন। একিউআইকে তাঁদের সবচেয়ে প্রভাবশালী এলাকায় জনবিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা সাজান। প্রয়োজনের ভিত্তিতে গোত্রের লোকজন দিয়ে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেন, আনবারের নিকটবর্তী হিত শহরটি মনিটর করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদেরকে। হিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, আইসিস ২০১৪ তে এটি পুনর্দখল করে নেয়। আইডিয়াটা ছিল খুবই চমৎকার। যদিও পর্যাপ্ত সংগঠনিক সহায়তা না পাওয়ায় এটি পুরোপুরি কার্যকর হতে পারেনি। সে সময় সেখানে কোনো মার্কিন বাহিনী ছিল না, যারা স্থানীয় গোত্রনেতাদের আশ্বস্ত করতে পারবে যে একিউআইর উচ্ছেদ কোনো সাময়িক পরিকল্পনা নয় বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিবিপ্লবের সূচনা মাত্র। এখন ইরাকিরা হঠাৎ মন পরিবর্তন করে মার্কিনিদের নিজেদের এলাকায় থাকতে দেবে এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে। জিহাদিরা শুরুতে যে জামাই আদর পেয়েছিল, তা ফুরোতে যাচ্ছে- এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

বিষয়টি জারকাবির 'পশ্চিম ফোরাত আমিরাতে'র রাজধানী কাইয়িম শহরে আরও ভালোভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। সুন্নি ও বেদুইন অধ্যুষিত এই শহরটি সিরিয়ার আলবু কামাল শহরের সীমান্তঘেঁষা। শহরের বুক চিরে ইরাক থেকে জর্ডানগামী মহাসড়কটি চলে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ফসফেটের খনি এই শহরে। সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য গিরিপথ ও গুহার এক বিস্তৃত রাজ্য, যা সবার অলক্ষ্যে-অগোচরে গেরিলা যুদ্ধের সৈন্য ও রসদ আনা-নেওয়ার জন্য আদর্শ।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইউএস মেরিন সেনারা কাইয়িম শহরের দখল নেওয়ার জন্য অভিযান শুরু করে। ফুরাতের পশ্চিম তীরে একিউআইর স্থাপনাগুলোতে আক্রমণ শুরু হয়। এখানে কংক্রিটের ফাঁড়ি নির্মাণ করে এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে যে মার্কিনিরা এখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। ফলে জিহাদিদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। হিতিতে অ্যাডাম সাচের অভিজ্ঞতা তারা এখানে কাজে লাগায়। কিছু স্থানীয় গোত্রের সঙ্গে আঁতাত করে। যাদের কিছু অবশ্য পূর্বেই জারকাবিস্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। মেরিন সেনারা পরে আবিষ্কার করে যে আলবু মাহালের হামজা ব্যাটালিয়নও বিদ্রোহীদের দমন করতে খড়্গহস্ত, ঠিক যেমন তারা নিজেরা।

ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্স দুর্নীতির পাশাপাশি আরও কিছু কারণে একিউআইর সঙ্গে যুদ্ধে সক্ষম ছিল না। প্রধান কারণ ছিল এর বেশির ভাগ রিক্রুটই শিয়া। তারা কোনো সুন্নি অঞ্চলে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক ছিল না। কারণ, সেখানে তাদেরকে সন্দেহ আর অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। স্থানীয় সুন্নি নেতাদের এ জাতীয় কোনো সমস্যা ছিল না। পাশাপাশি তারাও চাচ্ছিল নিজেদের ভূমিকে মুক্ত করতে। এই সুন্নি গোত্রগুলো একিউআইকে মার্কিনবিরোধী প্রতিরোধযোদ্ধা হিসেবে একসময় স্বাগত জানিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে যা গলার কাঁটায় পরিণত হয়। আল কাইয়িম প্রজেক্টের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দ্য ডেজার্ট প্রটেক্টর নামে একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। নামটা যদিও কিছুটা কাব্যিক, তবে তাদের কাজের সঙ্গে মিল ছিল। তারা ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই অঞ্চলকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছিল।

কিন্তু ২০০৬ সালে কাইয়িম শহরের নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। প্রথমিক সফলতা সত্ত্বেও মার্কিন বাহিনী এটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে স্থানীয় গোত্রনেতারা 'দেশপ্রেম' জাতীয় কোনো ফাঁপা বুলিতে একদমই উৎসাহী ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বউ-বাচ্চা নিয়ে নির্বিঘ্নে নিজেদের বসতভিটায় জীবনযাপনের নিশ্চয়তা। ইরাকজুড়ে চৌকিদারি করে বেড়ানোতে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। যখন তাদেরকে বলা হলো যে তারা এখন আর কোনো স্থানীয় সাধারণ বাহিনী নয়, বরং তারা 'বৃহত্তর ইরাকের' জন্য নিবেদিত ন্যাশনাল আর্মির 'গর্বিত সদস্য', ফলে মাতৃভূমির প্রয়োজনে যেকোনো স্থানে পোস্টিং হতে পারে। এ কথা শোনার পর দ্য ডেজার্ট প্রটেক্টরের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যই পালিয়ে গেছে।

ইরাকের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে সুন্নিরা অভাবিত সাফল্য অর্জন করে। এর অনেক কারণ ছিল। এর মধ্যে একটি হলো একসময়ের তুখোড় বিদ্রোহী নেতা ড. মুহাম্মদ মাহমুদ লতিফ আমেরিকার দোসর বনে যান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুন্নিরা

নির্বাচন বয়কট করার কারণে ইরাকের স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনে তারা নিজেদের অংশীদারী হারিয়েছে। সংসদে কোনো প্রতিনিধি নেই। তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। জারকাবির প্ল্যান বুমেরাং হয়ে যায়। পাশাপাশি লতিফের নিজস্ব অ্যাজেন্ডাও ছিল। নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগে তিনি রামাদির কিছু গোত্রনেতাকে এককাট্টা করেন, যারা একিউআইর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় আগ্রহী ছিল। এর চেয়েও দুঃসাহসিক হলো- তারা মার্কিনিদের সঙ্গে কাজ করতেও রাজি! শর্ত একটাই- ডেজার্ট প্রটেক্টরের মতো তারাও নিজেদের প্রদেশ আনবারের নিরাপত্তা নিজেরাই নিশ্চিত করবে। বাইরের কেউ এতে দখল নেবে না, তারাও অন্যত্র চৌকিদারি করতে যাবে না।

এ ব্যাপারে আমেরিকার সবুজ সংকেত পাওয়ার পর আনবার পিপলস কাউন্সিল গঠিত হয়। তাদের প্রথম কাজ ছিল সুন্নিদেরকে ইরাকি পুলিশে যোগদানে উৎসাহিত করা। স্থানীয় এক গ্লাস ফ্যাক্টরিতে বিপুল পরিমাণ রিক্রুটমেন্টের জন্য অফিস খোলা হয়। কাউন্সিলের উৎসাহে শত শত নতুন আবেদনকারী হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অনিবার্যভাবেই তারা জারকাবিস্টদের টার্গেটে পরিণত হয়। চতুর্থ দিন গ্লাস ফ্যাক্টরিতে এক আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়, যাতে কমপক্ষে ৬০ ইরাকি ও দুই মার্কিনি মারা যায়। একিউআই কাউন্সিলের সঙ্গে ঘোট পাকানো শেখদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। আত্মঘাতী হামলার এক সপ্তাহ পর বেছে বেছে তাদের শিকার করা শুরু হয়। বিদ্রোহীদের ফাঁদে আটকা পড়ার ভয়ে লতিফ ইরাক ছেড়ে পালিয়ে যান। জারকাবির কঠোর নীতির ফলে কয়েক সপ্তাহ পরই কাউন্সিল গুটিয়ে নেওয়া হয়।

হিত, আনবার ও রামাদিতে মূলত কী ঘটছে, সমস্যাটা কোথায় তা বুঝতে মার্কিন বাহিনীর আরও দুই বছর লেগে যায়। বিদেশি যোদ্ধা-প্রধান সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও অভাবিত প্রতিরোধ গোত্রীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট করে দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এসব গোত্র টিকে আছে এবং সমসাময়িক প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া করে বহাল তবিয়তে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তারা সাদ্দামের সঙ্গে খেলেছে, জারকাবির সাথেও চলেছে, আমেরিকানদের সঙ্গে হিসাব চুকাতেও প্রস্তুত। মার্কিন সেনাবাহিনীকে তারা নিজেদের যৌথ শত্রুর বিপক্ষে সম্ভাব্য সাময়িক মিত্রের বেশি কিছু মনে করে না।

একজন সাবেক মার্কিন সামরিক অফিসার বলেছেন, 'আমার একজন মেরিন ক্যাপ্টেন ছিল উত্তর আমেরিকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য (অর্থাৎ সেও গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে আসা)। সে ইরাকের আনবার কিংবা খোদ ইরাক

সম্পর্কেই তার কোনো জানাশোনা ছিল না। তাকে সেখানে পাঠালাম। কিছুদিনের ভেতরেই সে ঠিকঠিক বুঝে গেল সেখানে আদতে কী ঘটছে। তাই ইরাকিরা তাকে খুব পছন্দ করত।' হার্ভির মতে, গোত্রগুলো কীভাবে চলে সেটা বুঝতে পারাই ইরাককে বুঝতে পারার চাবিকাঠি। 'এখানে সরকারের অনেক অর্গানাইজেশন সক্রিয় ছিল, যা আমরা টের পাইনি। গোত্রের প্রধান ব্যক্তি গোত্রপরিচালক নয়। সে একটা শিখণ্ডী মাত্র। আসল লোক হচ্ছে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ব্যক্তি। মূলত কে গোত্র চালাচ্ছে এটা যেমন সাদ্দাম আমলের প্রধান প্রশ্ন ছিল, তেমনি আজকে আইসিসের জন্যও এটিই সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা। সাধারণত গোত্রগুলোর বিভিন্ন পেশাদার ও ধর্মীয় নেটওয়ার্ক থাকে। এরাই গোটা দেশে ঘটে চলা প্রতিটি ঘটনার মূল অনুঘটক। তারাই নির্ধারণ করে অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতার স্তর। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটা জানা- কে করছে, কী করছে, কতটুকু করছে?'

চতুর্থ অধ্যায়

নাটের গুরু : ইরান ও আল কায়েদা

ইরাকে সুন্নিরা ঠেকে ঠেকে অনেক কিছুই শিখছিল, যেমন শিখছিল মার্কিনিরা। ২০০৫ সালের জানুয়ারির নির্বাচন বয়কটের ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধসে যায়। ফলে একই বছরের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তারা সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করেনি। ফলাফলও এসেছিল চমৎকার। ডিসেম্বরের নির্বাচনে রামাদিতে সুন্নি ভোটারদের উপস্থিতি ছিল ৮০ শতাংশ অথচ জানুয়ারিতে এই সংখ্যাটা ছিল মাত্র ২ শতাংশেরও কম। কিন্তু ফলাফল ছিল তথৈবচ হতাশাজনক। শিয়ারা অল্প ব্যবধানে জয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। জারকাবি এই ঘটনাকে অত্যন্ত সুচতুরভাবে ব্যবহার করেন। দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ে যে ইরান-আমেরিকা একজোট হয়ে বাগদাদে সুন্নিদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করছে। তাদেরকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হচ্ছে না।

অবশ্য এই নির্বাচনে সুন্নিদের অংশগ্রহণের একটি ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল। জাতীয়তাবাদী কিংবা মধ্যপন্থী সুন্নিরা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য যাচাইয়ের জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ভোটের ময়দানে চলে আসে। ফলে যুদ্ধের ময়দান একচেটিয়া একিউআইর দখলে চলে যায়। এমনকি তুলনামূলক কম মধ্যপন্থী নন-জারকাবিস্টরাও ময়দান ছেড়ে চলে যায়, যেমন ১৯২০ রেভল্যুশন ব্রিগেড। এদের এই নাম এসেছে ১৯২০ সালে করা ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ থেকে। জাইশুল ইসলামি জারকাবির সঙ্গে মসুল দখলের অভিযানে থেকে যায়, যেসব দল অস্ত্র ত্যাগে অসম্মত ছিল, জাইশুল ইসলামি তাদের একটি।

যুদ্ধে জারকাবির একক উত্থান অনেককেই তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতাত্ত্বিক ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে অস্থিরতা তৈরির সক্ষমতা একটুও লোপ পায়নি, যা যুদ্ধেরও বহুকাল আগে থেকে চলে আসছে। বাথ পার্টির একজন স্কলার কেনান ম্যাকিয়া ১৯৯৩ সালেই তাঁর বই 'ক্রুয়েল্টি অ্যান্ড সাইলেন্স'-এ বাথ পার্টি-পরবর্তী ইরাকের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। 'যখন সাদ্দাম হোসেন থাকবে না, মানুষের জীবন, তাদের প্রিয়জনের জীবন থাকবে কসাইর চাপাতির নিচে। শিয়ারা ধর্মের নামে সুন্নিদের সঙ্গে যা করবে, তাতে তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে। এবং এটিই ইরাকের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ

করবে। শিয়ারা যত বেশি নিজেদের শিয়া হিসেবে প্রকাশ করতে চাইবে, প্রতিরোধে সুন্নিরা তত বেশি যুদ্ধে জড়াবে। যেকোনো মূল্যে ইরাকে ইরানের মতো "ইসলামিক রিপাবলিক" প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবে। কারণ এতে সুন্নিদের লাঞ্ছনা ভিন্ন কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

সুতরাং ইরাকি সুন্নিদের সামনে দুটি অপশন—হয়তো জারকাবির নিষ্ঠুর শাসন কিংবা শিয়াদের। জারকাবির সামনে তখন সবচেয়ে বড় বাধা ছিল একিউআইর 'বিদেশি' পরিচিতি। সাধারণ সুন্নিরা একে বিদেশি যোদ্ধাদের সংগঠন হিসেবে দেখত। ফলে সংগঠনের 'ইরাকাইজেশনের' প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই লক্ষ্যে ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে তিনি মাজলিসুশ শুরা আল মুজাহিদিন ফিল ইরাক বা দ্য মুজাহিদিন অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল অব ইরাক গঠন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এর সদস্য ছিলেন ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন সালাফি গ্রুপের নেতা, যাঁদের পাঁচজনই ইরাকি। তাঁরা একিউআইর একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নিতে না পেরে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আবার সেন্ট্রাল কাউন্সিলে কর্তৃত্ব ফিরে পান। সালাফি এই জোট গঠনের ফলে তাকফিরিজম (কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা, যার ফলে তাকে হত্যা বৈধ বলে গণ্য হয়। -অনুবাদক) নতুন মাত্রা পায়। এর প্রধান কারণ ছিল নবগঠিত ইরাক সরকারের উগ্রতা ও স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ।

শিয়া মিলিশিয়া ও ইরানের প্রক্সি

বর্তমানে আইসিস আর আমেরিকার আইসিসবিরোধী অভিযানের ডামাডোলে এক দশক আগের ইতিহাস সবাই ভুলে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। প্রথমে আমেরিকা ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদের উত্থান দেখতে পেয়েছিল নাদুসনুদুস শিয়া ধর্মীয় নেতা মুকতাদা আল সদরের মাঝে। প্রসিদ্ধ শিয়া নেতা মুহাম্মদ আল সদরের ছেলে। মুহাম্মদ সদরকে ১৯৯৯ সালে সাদ্দামের মুখাবারাত হত্যা করে। তারপর জন্মসূত্রে শিয়া ধর্মীয় নেতৃত্বের কাতারে চলে আসেন মুকতাদা আল সদর। যদিও বয়সে তরুণ বলে তিনি জুনিয়র নেতা হিসেবেই ছিলেন। সদর উত্তর-পূর্ব বাগদাদের একটি অনুন্নত ও জনবহুল শিয়া বস্তির দায়িত্বশীল ছিলেন। মার্কিন আগ্রাসনের পর সাদ্দাম সিটি নামে পরিচিত এই এলাকার নাম পাল্টে সদর সিটি রাখা হয়।

সাদ্দামের পতনের পরপর তিনি জাইশুল মাহদি বা মাহদি আর্মি নামে নিজের মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেন, যা ছিল মূলত হিজবুল্লাহর ইরাকি শাখা। হিজবুল্লাহ ইরান সমর্থিত লেবানিজ মিলিশিয়া গ্রুপ। যারা একই সঙ্গে আমেরিকার তালিকাভুক্ত বেআইনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত আবার বিশ্বব্যাপী একটি আইনসিদ্ধ রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত। কারণ লেবানিজ ক্যাবিনেটের বেশ

কিছু সিট তাদের দখলে। পাশাপাশি বাহ্যত স্বাধীন লেবানিজ ইন্টেলিজেন্স ও আর্মিতে তাদের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। সদরের এই মিলিশিয়া ইরাক সরকারের ভেতর একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপস্টেটের[১০] প্রকৃষ্ট নমুনা।

অন্য যুদ্ধবাজ নেতাদের মতো সদরও তাঁর জায়গিরকে একচ্ছত্র ও অপ্রতিরোধ্যভাবে শাসন করতে চেয়েছিলেন। ইউএস ফোর্স তাঁকে নিয়ে তেমন নাক গলায়নি। ফলে তিনি ইরানের সহায়তায় নিজের আলাদা এক 'রাজ্য' তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। সুন্নিদের সন্দেহ তীব্রতর হয় যে ওয়াশিংটন-তেহরান গং ইরাককে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। তাদের ক্রোধ ও হতাশা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। ইরান তার সামর্থ্যের সবটুকু 'উজাড়' করে দিয়ে সুন্নিদের জীবন রক্তাক্ত ও দুর্বিষহ করে তোলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইরাকিদের ছিল। ২০০৪ সালের আগস্টে সংগঠিত হওয়া নাজাফ যুদ্ধটা মূলত আমেরিকা ও ইরানের মধ্যকার প্রক্সি যুদ্ধ ছিল। এক পক্ষে ছিল ইউএস, অপর পক্ষে ইরাকের সহায়তায় ছিল ইরানের আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারি গ্রুপ—রেভল্যুশনারি গার্ড ও কুদস ব্রিগেড। তাদের যৌথ কমান্ডে ছিলেন ইরানি শেখ আনসারি। সে সময় নাজাফে সদরের মাহদি আর্মির সঙ্গে কাজ করছিলেন। এদেরকে তিনিই কমান্ড দিতেন। এই শেখ আনসারি কুদস ফোর্সের ডিপার্টমেন্ট ১০০০-এর একজন কর্মকর্তা। এই ডিপার্টমেন্টটি ইরাকে ইরানের ইন্টেলিজেন্স হিসেবে কাজ করছিল। সাদ্দামের আমল থেকেই ইরাকের অভ্যন্তরে ইরানের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আট বছরের ইরাক-ইরান যুদ্ধে শত সহস্র ইরাকি শিয়া ইরানে পালিয়ে যায়। সাদ্দামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারা মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন শুরু করে সদ্য-অঙ্কুরিত শিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে অবদান রাখার স্বপ্ন নিয়ে, বহু বছরে গড়ে ওঠা বাথিস্ট সাম্রাজ্যের ওপর একযোগে রাজনৈতিক ও সামরিক আক্রমণ শাণানোর লক্ষ্য নিয়ে।

***

ইরাকের 'সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক রেভল্যুশন ইন ইরাক' (এসসিআইআরআই) ছিল মূলত ইরানি ইন্টেলিজেন্স ও মোহাম্মদ বাকির আল হাকিমের সম্মিলিত আখড়া। এসসিআইআরআইর সামরিকা শাখা বদর কোর্পস ইরাকের অভ্যন্তরে ইরানের পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে কাজ করত। জারকাবি এই বদর

---

[১০] ডিপস্টেট বলা হয় রাষ্ট্রের ভেতর কিছু গোপন চক্র থাকে, যারা মূলত পর্দার অন্তরালে থেকে দেশ চালায়। যেমন বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী মাফিয়া গ্রুপ, কমার্শিয়াল গ্রুপ কিংবা সামরিক বাহিনী। (অনুবাদক)

ব্রিগেডকে দুই চোখে দেখতে পারতেন না। মার্কিন ফোর্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের, যারা ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছিল, সাবেক কমান্ডার কর্নেল জিম হিকি বলেছেন, 'আমরা এ দেশে আসার বহু পূর্ব থেকেই ইরানের মোল্লারা সাদ্দামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ও বিষোদ্গার চালিয়ে আসছিল। আমরাও এ দেশে আসার সময় তাদের এসব চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি।' উল্লেখ্য, সাদ্দাম হোসেনের গ্রেপ্তারে হিকি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মার্কিনিরা আসার পর তেহরানের সাবোট্যাজ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পান রেভল্যুশনারি গার্ডের কুদস ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাসেম সুলেইমানি। তিনি সরাসরি শুধু সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ খামেনির নিকট জবাবদিহি করতেন। অল্প কদিন আগেই এক সাবেক সিআইএ অফিসার তাঁর ব্যাপারে বলেছিলেন, 'গোটা মধ্যপ্রাচ্যে এককভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী কর্মকর্তা, কিন্তু কেউ তাঁর ব্যাপারে কখনো কিছু শোনেনি।' সিআইএ অফিসারের এই মূল্যায়নের কদিন আগে সুলেইমানি মেজর জেনারেল হিসেবে প্রমোশন পেয়েছিলেন। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ডেভিড প্যাট্রিয়াস সুলেইমানি কী চিজ, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। তাঁকে 'শয়তান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং ভাবছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশকে এ কথা বলবেন কি না যে ইরাকে মার্কিনিদের বিপক্ষে লড়ছে মূলত ইরান। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, 'তাদের উদ্দেশ্য শুধু ইরাকে প্রভাব বিস্তার আর আমাদের বিপক্ষে লড়ার জন্য প্রক্সি তৈরি করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং চিন্তা ছিল তাদের উইপন অব ম্যাস ডিস্ট্রাকশন (ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র) তৈরির প্রচেষ্টা থেকে আমাদের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি লেবানিজ হিজবুল্লাহর মতো মাহদি আর্মিকে ইরাকে সক্রিয় করা।'

২০০৭ সালে কারবালায় এক অ্যাম্বুশে পাঁচ আমেরিকান কর্মচারী নিহত হয়। অ্যাম্বুশ করেছিল আসইয়াবুল হক্ব বা সত্যের ঝান্ডাবাহী নামে মাহদি আর্মির এক উপদল, যা গঠিত হয়েছিল মুকতাদা আল সদর ও ইরানের সহায়তায়। এই আক্রমণের অল্প কদিন আগে কারবালার ইরানি কনস্যুলেটে অবস্থান করা ইরানি কুদস ফোর্সের অফিসার তাঁর পদ ছেড়ে দেন। পরবর্তী সময়ে আসইয়াবুল হক্বের অফিসার কাইস আল খাজালি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে অভিযানটা ছিল আগাগোড়া ইরানি পরিকল্পনার ফসল।

মার্কিনিদের রক্তপাতে সোলেইমানির সহযোগী ছিল আবু মাহদি আল মুহান্দিস। একজন ইরাকি। ইরানে বসবাস করত। ১৯৮৩ সালে কুয়েতে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় জড়িত ছিল। সে বদর ফোর্সের একজন সাধারণ সদস্য

থেকে কুদস ফোর্সের পুরোদস্তুর কর্মকর্তা বনে যায়। অবশ্য এসব কিছুই ছিল সে ইরাক পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে। সদরের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে আলাদা দল গঠন করে কাতায়েব হিজবুল্লাহ নামে। যাদের কাজ ছিল সদরিস্টদের মতোই মার্কিনিদের টার্গেট করা।

১৯৯০-এর দশকে সুলেইমানির ক্যারিয়ার শুরু হয় আফগানিস্তান থেকে ইরানে ড্রাগ পাচার বন্ধের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী দশকে তিনি ইরাক থেকে পণ্য আমদানির ব্যবসা করে কাটান। আবু মুহানদিসের দায়িত্ব ছিল এক্সপ্লোসিভলি ফর্মড পেনেট্র্যাটর বা সংক্ষেপে ইইপি চোরাচালানের দেখাশোনা করা। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলোর মাঝে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ছিল রাস্তার পাশে পেতে রাখা এই বোমাগুলো। বোমাগুলো যখন ডেটোনেট করা হতো, বাইরের দিকের তামার আবরণটা গলে যেত। একটি গলিত পদার্থে পরিণত হতো, যা যেকোনো যুদ্ধযান কিংবা সাঁজোয়াযানের স্টিল ভেদ করে ঢুকে যেতে পারত। এমনকি ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেদ করেও! মার্কিন বাহিনীর হিসাবমতে, ২০০৬ সালের শেষার্ধে নিহত হওয়া সৈন্যদের ১৮ শতাংশই মারা গেছে এই ইইপির আক্রমণে।

এগুলো ইরানে তৈরি হতো। ইরানি এজেন্টদের মাধ্যমে সীমান্ত পার হয়ে চলে যেত বদর বাহিনীর হাতে। সেখান থেকে শিয়া মিলিশিয়াদের মাঝে ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো। আদর করে তারা অবশ্য এর নাম দিয়েছিল 'পারসিয়ান বম্ব'। ২০০৭ সালে মার্কিন বাহিনীর হতাহতের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল শিয়া মিলিশিয়াদের হাতে। প্যাট্রিয়াস ইউএস ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট গেটসের নিকট লেখা এক চিঠিতে 'দীর্ঘমেয়াদি মার্কিন নিরাপত্তার জন্য একিউআইর চাইতে বড় হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করে মাহদি আর্মিকে। এ কারণে সেনাবাহিনীর অনেকেই ইরানে ইইপি তৈরির কারখানায় আক্রমণ চালানোর পরামর্শ দেয়। প্যাট্রিয়াস ভাবছিল প্রেসিডেন্টকে বলবে যে ইরাকে আমেরিকা মূলত ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।

জেনারেল ম্যাকক্রিস্টালের 'জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন কমান্ড' ২০০৬ সালের শেষ দিকে কুদস ফোর্সের অপারেশন ও প্রশিক্ষণ স্টাফের প্রধান মহসিন সিজারি এবং তাঁর সঙ্গে কুদস ফোর্সের বাগদাদ ও দুবাইয়ের স্টেশন প্রধানকে গ্রেপ্তার করে। সিজারি সুপ্রিম কাউন্সিল অব ইসলামিক রেভল্যুশন ইন ইরাকের হেডকোয়ার্টার থেকে এক মিটিং শেষে ফিরছিলেন। সার্ভিল্যান্স ড্রোনের মাধ্যমে তাঁকে নজরদারি করা হয়। কুর্দি আঞ্চলিক সরকারের রাজধানী ইরবিলে জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন কমান্ড আরেকটি অভিযান চালায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলি জাফরিকে গ্রেপ্তারের জন্য। কুদস ফোর্সের একজন সিনিয়র অফিসার তিনি।

কিন্তু তাঁর পরিবর্তে ইরানি সেনাবাহিনীর পাঁচজন জুনিয়র অফিসারকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

ইরাকে ইরানি চরদের গ্রেপ্তার করা স্পেশাল সিকিউরিটি কমান্ডের জন্য একটি স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের উৎপাত এতই বেড়ে যায় যে মার্কিন বাহিনীকে দুভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা কাজ দিতে হয়। টাস্কফোর্স ১৬-এর দায়িত্ব ছিল জারকাবিকে শিকারের চেষ্টা করা আর টাস্কফোর্স ১৭-এর দায়িত্ব ছিল জেনারেল সুলেইমানি ও তাঁর চরদের পিছু ধাওয়া করা। তার প্রক্সিদের পেছনে ছোটা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিনিরা আবিষ্কার করে যে তাদের দুই শত্রু যৌথভাবে ঘোঁট পাকাচ্ছে। সুলেইমানি জারকাবিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। ইরাক থেকে মার্কিনিদের তাড়াতে সচেষ্ট এমন যে কাউকে তেহরানের পক্ষ থেকে স্বাগত।

২০১১ সালে ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ইরানভিত্তিক আল কায়েদার ছয় সদস্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যারা ইরানের ভায়া হয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে অর্থ, বার্তা ও সদস্য পাঠাচ্ছিল। তখন টেরোরিজম অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আন্ডার সেক্রেটারি ডেভিড এস কোহেন বলেছিলেন, 'ইরান হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক। আল কায়েদার সঙ্গে ইরানের গোপন আঁতাত, নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ফান্ড ও সদস্য সংগ্রহের অনুমতি, এসব আবিষ্কারের মাধমে আমরা ইরানের রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সন্ত্রাসবাদে সহায়তার নতুন নতুন দিক উন্মোচন করছিলাম।' ইরাকে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রয়ান ক্রোকার ২০১৩ সালে নিউইয়র্কারকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এক দশক আগেই মার্কিন ইন্টেলিজেন্স ইরানে আল কায়েদার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিল। যখন জারকাবি কান্দাহার থেকে পশ্চাদপসরণের জন্য ইসলামিক রিপাবলিককে বেছে নিয়েছিলেন।

লন্ডনভিত্তিক সৌদি পত্রিকা আশ শারকুল আওসাতের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৪ সালে সুলেইমানি বলেছিলেন, জারকাবি ও আনসারুল ইসলাম ইরানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো সীমান্ত দিয়ে আসা-যাওয়া করতে পারত। এমনকি জারকাবি মেহরানে (তেহরান নয়) অবস্থিত রেভল্যুশনারি গার্ডের এক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন! ক্রোকারের দাবি অনুযায়ী, ২০০৩ সালে ইরানে অবস্থিত আল কায়েদার সদস্যরা সৌদিতে বিভিন্ন পশ্চিমা অবস্থানে হামলা চালাতে চেয়েছিল। জারকাবি ইরানের সমর্থন ও আশ্রয় পেয়েছিলেন শত্রুর-শত্রু নীতির ভিত্তিতে। ইরান তখন তালেবান উৎখাতে পশ্চিমাদের সহায়তা করছিল। সেই হিসেবে তিনি সাময়িক সুযোগ পেয়েছিলেন, যা

ছিল ইরানের সুবিধাবাদী নীতির প্রতিফলন। যে বছর আমেরিকা ইরাক আগ্রাসন চালায়, সে বছরই ক্রোকার জেনেভা সফরে গিয়ে গোটা গালফ অঞ্চলে তাদের ওপর আল কায়েদার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের অনুরোধ জানান ইরানকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২০০৩ সালের ১২ মে রিয়াদের তিনটি কম্পাউন্ড উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে গানফায়ারের পাশাপাশি ভিবিআইইডি বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল। নয়জন আমেরিকানসহ কয়েক ডজন লোক নিহত হয়। 'তারা ছিল ইরানের তত্ত্বাবধানে, সেখানেই পরিকল্পনা ফেঁদেছে,' সাবেক দূত এভাবেই স্মৃতিচারণা করছিল।

অবশেষে সদরের সাম্প্রদায়িক ডিপস্টেটের বাসনা ও ইরাক সরকারের সঙ্গে সুন্নিদের দুঃস্বপ্নের সূচনা হতে যাচ্ছিল। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের পর সুপ্রিম কাউন্সিল অব ইসলামিক রেভল্যুশন ইন ইরাক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পায়। তাদের কমান্ডে তখন প্রায় ১৬ হাজার স্থল সৈন্য ছিল। বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফালাহ নাকিব ছিলেন একজন সুন্নি। তিনি এবং তাঁর চাচা আদনান সাবিত সর্বপ্রথম সাদ্দাম পরবর্তী যুগের নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করেন। মার্কিনিদের সহায়তায় মাঠে নামা এই বাহিনীগুলো ছিল স্পেশাল পুলিশ কমান্ডো ও পাবলিক অর্ডার ব্রিগেড। ইরানের পঞ্চম স্তম্ভ, যা ইরাকের ন্যাশনাল পুলিশ ফোর্সকে পরিচালনা করছিল, নাকিব একে ঝামেলা বৈ কিছু মনে করতেন না। তিনি জর্জ ক্যাসিকে একবার খেদোক্তি করে বলেছিলেন, 'হয়তো আমরা তাদেরকে এখনই থামাব, নয়তো ইরাক ইরানের হাতে তুলে দেব। এ ছাড়া কিছুই নয়।'

নাকিবের স্থলাভিষিক্ত হন বায়ান জাবের। সুপ্রিম কাউন্সিলের কর্মকর্তা। প্রথম দিকে মার্কিনিরা তাঁকে পার্টির অন্য সদস্যদের চেয়ে কম উগ্রপন্থী ভেবেছিল এবং শিয়া-সুন্নি উত্তেজনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সাবিতকে তখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে রেখে দেয়। কিন্তু জাবেরের এটা মোটেও পছন্দ হয়নি। তাঁর বাসনা হচ্ছে তাঁবেদার বদর বাহিনী ও মাহদি আর্মির মতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সশস্ত্র বাহিনীকেও নিজের করায়ত্তে আনা। তাঁর বাহিনী পশ্চিম বাগদাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিল। বাগদাদের রাস্তায় টহল দেওয়ার সময় তারা চারপাশ আতঙ্কিত করে তুলত। সুন্নিরা যখন সর্বপ্রথম ২০০৫'র ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, জাবেরের লোকলস্কর জোরে জোরে শিয়া গান বাজাত। সাম্প্রদায়িক এই ডেথ স্কোয়াডের গায়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউনিফর্ম তাদেরকে প্রভূত ক্ষমতা ও সব ধরনের অপরাধের দায়মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ওলফ ব্রিগেড নামে পরিচিত বদর বাহিনী-প্রভাবিত স্পেশাল পুলিশ কমান্ডো ইউনিট ছিল সব কুকর্মের হোতা। ইরাকের একটি এনজিও—দ্য ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কমপক্ষে ২০ জন

বন্দীকে নির্যাতনের সত্যতা পেয়েছে, যাদের ছয়জনই মারা যায়। বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছিল মসুলে, ওলফ ব্রিগেড কর্তৃক। বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত এক বার্তা অনুযায়ী স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভাষ্য হলো এনজিওটি অভিযোগ করেছে, বন্দী নির্যাতনে স্টেনগান ব্যবহার করা হতো। হাত পিছমোড়া করে কবজিতে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। বেজমেন্টে মানুষের মলমূত্রের সঙ্গে বন্দীদের থাকতে বাধ্য করা হতো। মারধর তো আছেই।

সরকারের আরও একটি ডিপার্টমেন্ট শিয়াদের কবজায় চলে যায়—স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি প্রধান হাকিম আল জামিলি ছিলেন মাহদি আর্মির এজেন্ট। রোগীরা অ্যাম্বুলেন্সের টিকিটিও খুঁজে পেত না। কারণ সেগুলো অস্ত্র চোরাচালানে ব্যস্ত। হাসপাতালগুলো সুন্নিদের জন্য ছিল মৃত্যুকূপ। বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরার আদর্শ স্থান। চিকিৎসার প্রয়োজনে যেতে হতো রাজধানীর বাইরে।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ইবরাহিম জাফরি তাঁর নিজের আলাদা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি খুলেছিলেন—দ্য মিনিস্ট্রি অব স্টেট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স। এর প্রধান ছিল শিরওয়ান আল ওয়ায়েলি। সে মার্কিন সেনাবাহিনীর গতিবিধি মাহদি আর্মির নিকট পাচার করত এবং সদরকে গোটা দেশের ভ্রমণ-সংক্রান্ত খবরাখবর সরবরাহ করত। বিশেষত, ব্যবসায়িক বিমান চলাচলের খোঁজখবর। ফলে মাহদি আর্মি মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ও বেসামরিক নাগরিকদের নাকের ডগায় বসে বৈরুতের হিজবুল্লাহর মতো কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও এগুলোর পরিচালনা নিজেদের দখলে নিয়ে নিচ্ছিল। কাস্টম অফিস, স্কাই মার্শাল প্রোগ্রাম, পরিচ্ছন্নতার টেন্ডারপ্রাপ্ত কোম্পানি সবই তারা পরিচালনা করত। এমনকি নিজ বাহিনীর সদস্যদের জন্য চাকরির পোস্ট খালি করতে বর্তমান কর্মচারীদের হত্যা করত। কার্গো বিমানে করে ইরান থেকে অস্ত্রের চালান আনত। সুন্নিদের আসা-যাওয়ার খবরাখবর তাদের কাছে সব সময় থাকত। ফলে যখন-তখন যাকে-তাকে কিডন্যাপ ও হত্যা করতে পারত।

সুন্নিদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ছিল জাদরিয়া বাংকার। গ্রিন জোনের পাশে নির্মিত একটি বন্দিশিবির। এর স্পেশাল ইন্টারোগেশন ইউনিটের প্রধান ছিল বশির নাসর আল ওয়ানদি, সে ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ নামে পরিচিত ছিল। বদর বাহিনীর সাবেক এই সিনিয়র গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিল কুদস ফোর্সের সুলেইমানির ডেপুটি হাদি আল আমারির ডুপ্লিকেট। মার্কিন বাহিনী যখন এই নরকের দরজা খোলে, সেখানে ১৬৮ জন চোখবাঁধা বন্দী পায়। যাদেরকে মাসের পর মাস এখানে আটকে রাখা হয়েছিল। মলমূত্রে ভরা একটি রুমে তারা সবাই গাদাগাদি করে থাকত।

তাদের প্রত্যেকে ছিল সুন্নি। বেশির ভাগের দেহে ছিল নির্যাতনের চিহ্ন। নির্মম পিটুনির ফলে কারও কারও অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে তাদেরকে জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে ট্রান্সফার করতে হয়। এলাকাটি ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন, তাই বায়ান জাবেরকে এই ঘটনার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে দাবি করে যে সে কখনো এখানে যায়নি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থেকে দায়সারা একটি প্রেস কনফারেন্স করেই ছাড়া পেয়ে যায়। তার ভাষ্যমতে, এখানে শুধু চরম মাত্রার অপরাধীদেরই বন্দী করা হতো। আর এখানকার উন্নত মানবিক পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য সে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে, 'এখানে কারও শিরশ্ছেদ করা হয়নি, কাউকে হত্যা করা হয়নি।'

জাফরির শিয়া প্রভাবিত মন্ত্রণালয়গুলোর যোগসাজশ ছিল ভয়াবহ। জাবেরের পূর্বসূরি ফালাহ নাকিব জাদরিয়া বাংকারের কয়েক ব্লক দূরেই থাকতেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, এখানে প্রায়ই অ্যাম্বুলেন্স আসা-যাওয়া করতে দেখেছেন। তাঁর ধারণা, সেগুলোতে করে বন্দী আনা-নেওয়া হতো। ইউএস মিলিটারি অ্যাডভাইজর এমা স্কাই বলেছেন, 'ইরাক যুদ্ধ এই অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য ধসে দিয়েছে এবং পুরোটা গিয়েছে ইরানের অনুকূলে। আরব বিশ্বে এখন এ কথা হরহামেশাই শোনা যায় যে আমেরিকা ও ইরানের মাঝে গোপন আঁতাত রয়েছে। তারা ইরাককে ইরানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারলে সুন্নিরা আইসিসের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ বোঝা সহজ।'

আলাদিনের চেরাগ

২০০৬ সালে মার্কিন সরকারের জানামতে, একিউআই বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ থেকে ৭০-২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায় করত। প্রাইভেট ইন্টেলিজেন্স ফার্ম ফ্ল্যাশপয়েন্ট পার্টনারের একজন আল কায়েদা স্পেশালিস্ট লেইদ আলখৌরি বলেন, জারকাবির অপরাধপ্রবণ অতীত তাঁর যোদ্ধাজীবনকে প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছে। অর্থোপার্জনের জন্য একিউআই যেকোনো কাজ করতে পারত। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে সেগুলো অন্য বিদ্রোহী দলের নিকট বিক্রি, কিডন্যাপ, মুক্তিপণ- সবকিছু। তারা উচ্চপদস্থ ইরাকি সেনা কর্মকর্তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। অন্যান্য উচ্চপদস্থ ধনী ইরাকি অফিসারদের নাম সংগ্রহ করে তাদেরকে অপহরণ করত। তাদের পরিবার থেকে মুক্তিপণ আদায় করত। কেউ তথ্য দিতে রাজি না হলে নিজের বাড়িতেই লাশ হয়ে যেত।

২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত আরবের দাতাগোষ্ঠী ও অজ্ঞাত অনুদান থেকে একিউআইর মোট বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ এসেছে। সালদিন প্রদেশের বাজি তেল শোধনাগারের তেল চোরাচালান করে জারকাবির সংগঠন ফুলে-ফেঁপে উঠছিল। ২০০৬ সালে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিদ্রোহীদের যে গুটিকতক আয়ের উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই জানা যায় তাদের আয় ব্যয়ের চেয়ে ঢের বেশি। তখন একিউআইর সম্পত্তি বিন লাদেনের আল কায়েদাকেও ছাপিয়ে যায়। এমনকি একসময় বিন লাদেন অর্থের জন্য তাঁর 'অনিচ্ছুক শিষ্যের' দ্বারস্থ হন। এ কারণেই সাংগঠনিক পদে জারকাবি নিম্নপদস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উচ্চপদস্থদের কথায় খুব একটা কর্ণপাত করতেন না। ২০০৫ সালের জুলাইতে জাওয়াহিরি ভ্রাতৃসুলভ এক চিঠিতে জারকাবিকে ইরাকি শিয়া হত্যা বন্ধ করার উপদেশ দেন। জাওয়াহিরির মতে, এখন একিউআইর একটি ত্রিমুখী কৌশল অবলম্বন করা উচিত। সর্বপ্রথম মার্কিন দখলদারদের তাড়াতে হবে। তারপর সুন্নি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি আমিরাত গঠন করতে হবে। এবং সেখান থেকে আশপাশের আরব দেশগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতে হবে। পাশাপাশি তিনি জারকাবিকে তালেবানের মতো ভুল না করার পরামর্শ দেন।

তাঁর দৃষ্টিতে তালেবান এত দ্রুত ভেঙে পড়ে, কারণ তারা নিজেদের শুধু কান্দাহার ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আবদ্ধ রাখে। অন্যান্য অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জাওয়াহিরি মূলত একধরনের জিহাদি জাতীয়তাবাদে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সংগঠনকে স্বদেশচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। মূলত জাওয়াহিরি হচ্ছেন একজন ধীশক্তিসম্পন্ন পরিকল্পনাকারী। পক্ষান্তরে জারকাবি ছিলেন পাগলাটে এক যোদ্ধা, যিনি ভাবতেন গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি একাই একশ। তবে জাওয়াহিরি তখনো তাঁর একজন শত্রুকে চিনে উঠতে পারেননি—ইরান।

তাঁর ভয় ছিল, যদি একিউআইর জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে 'ইসলামিক রিপাবলিক' নারাজ হয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়, তবে সেটা হবে খুবই ক্ষতিকর। তাই তিনি জারকাবিকে বলেছিলেন, 'আমরা এবং ইরানিরা একে অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে হবে যত দিন এখানে আমেরিকানরা আছে এবং আমাদেরকে নিশানা বানাচ্ছে।'

২০০৫ সালের জুলাই মাসের এই চিঠির কথা উল্লেখ করে আইসিসের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আল আদনানি ২০১৪ সালের মে'তে বলেন, 'ইরান আল কায়েদাকে উচিত প্রতিদানই দেবে।' অবশ্য তাঁরা কখনোই চাননি এই চিঠি জনসম্মুখে প্রকাশিত হোক। কারণ তখনো বিশ্ব জানত আল কায়েদার হাইকমান্ড

তাদের মেসোপটেমিয়ান আমিরের কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ। কিন্তু সিআইএ জারকাবি ও তাঁর সেন্ট্রাল এশিয়ান নেতাদের মাঝে দূরত্ব বাড়ানোর ফন্দিতে এই চিঠিটি ফাঁস করে দেন। এতে কাজ হয়েছিল দারুণ।

২০০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি একিউআইর কয়েকজন সদস্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউনিফর্ম পরে বেশ কিছু জায়গায় বিস্ফোরক স্থাপন করে। এর মধ্যে একটি ছিল সামারায় অবস্থিত আল আসকারি মসজিদ, শিয়াদের পবিত্রতম স্থানগুলোর একটি। তাদের বারো ইমামের দুজনের মাজার এখানে। মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। নবম শতাব্দীতে নতুন করে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এর বিখ্যাত স্বর্ণখচিত গম্বুজটি নির্মাণ করা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বিস্ফোরণে গম্বুজটি ধ্বংস হয়ে যায়। বিস্ফোরণের দিন ইরাকের শিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট আদেল আবদুল মাহদি এই হামলাকে ৯/১১'র সঙ্গে তুলনা করেন। আয়াতুল্লাহ আলি আল সিসতানি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ডাক দেন। পাশাপাশি ইশারা-ইঙ্গিতে এ কথা বুঝিয়ে দেন যে যদি ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনী শিয়াদের পবিত্র স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে শিয়া মিলিশিয়ারা এর দায়িত্ব নেবে।

একটি ইরাকি এনজিওর ভাষ্যমতে, এই হামলার পরপর কিছু আতঙ্কগ্রস্ত শিয়া পরিবার বাগদাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। কারণ, সুন্নিদের ওপর শিয়াদের প্রতিশোধমূলক আক্রমণের আশঙ্কায় মার্কিন বাহিনী জরুরি মিশন ঘোষণা করে—অপারেশন স্কেল অব জাস্টিস। আল আসকারি মসজিদে বোমা হামলা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, যা জারকাবি চেয়েছিলেন। ইরাকিরা তিন বছর যাবৎ গৃহযুদ্ধে আক্রান্ত। সেদিকেই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

আল সিসতানির দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে বিরত থাকার আহ্বান মাঠে মারা যায়। মুকতাদা আল সদরের বাহিনী ও অন্যান্য ইরান-পরিচালিত স্পেশাল গ্রুপ সুন্নি বন্দীদের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। দেহে ড্রিল মেশিন চালিয়ে দেওয়া ও বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বেঁধে রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৃতদেহগুলো দজলার জলে ভাসত। মাহদি আর্মি গাজালিয়া শহরে তল্লাশিচৌকি স্থাপন করে। এটি ছিল বাগদাদ থেকে আনবারমুখী মহাসড়কের পাশে অবস্থিত কৌশলগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। ইউনিফর্মধারী ইরাকি পুলিশ গাড়ি থামিয়ে চেক করত। যাত্রীদের পরিচয়পত্র দেখাতে হতো। শিয়া হলে ওকে। কিন্তু সুন্নি হলে সে উধাও হয়ে যেত। অফিশিয়াল ভাষ্য ছিল তাদেরকে 'নিয়মতান্ত্রিক' জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছে। আদতে তা ছিল সদরের জাতিগত নিধনযজ্ঞের অংশ। সুন্নি বিদ্রোহীরাও সাধ্যমতো পাটকেল ছুড়ছিল। একিউআই ও অন্য সুন্নি বিদ্রোহী গ্রুপগুলো তাদের নিয়ন্ত্রিত আমেরিয়া ফালুজা থেকে শিয়াদের তাড়াতে সব ধরনের

ভয়ানক পদ্ধতি অবলম্বন করত। পশ্চিম বাগদাদের এই শহরটি সদরিস্টদের অবরোধের ফলে ক্ষুধায় ধুঁকছিল। ইরাকি আর্মি ও পুলিশ সুন্নি নিধনে মহাসমারোহে যোগদান করে। পাইকারি হারে হত্যা ও অপহরণে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকির নিকট বাহ্যত তাদের জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু দাওয়া পার্টির নবনির্বাচিত এই প্রধানমন্ত্রী নিজেই ছিলেন সরষের ভূত।

হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টিফেন হ্যাডলি বাগদাদ সফর করার পর ২০০৬ সালে প্রেসিডেন্ট বুশের নিকট এক স্মারকলিপিতে এসব তথ্য উল্লেখ করেন, যা পরবর্তী সময়ে লিক হয়ে যায়। 'সুন্নি এলাকায় সেবাপ্রদান বন্ধ,' স্মারকলিপির ভাষ্য। 'শিয়াদের বিরুদ্ধে যেকোনো সামরিক পদক্ষেপে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের বাধাদান, সুন্নি নিধনে উৎসাহ প্রদান, সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে ইরাকের সবচেয়ে দক্ষ কমান্ডারদের অপসারণ, সব মন্ত্রণালয়ে শিয়াপ্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা, মাহদি আর্মির ঢালাও হত্যাকাণ্ড—এসব কিছুই বাগদাদে শিয়াদের ক্ষমতা সুসংহতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ।'

শাহাদাতের পেয়ালা

দ্বিতীয় ফালুজা যুদ্ধের পর থেকে জারকাবির অবস্থান খুঁজে বের করা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। কোয়ালিশন ফোর্স তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে আদাজল খেয়ে নামে। ব্রুস রিডেলের ভাষ্যমতে, ইরাকি বাহিনী বেশ কয়েকবার জারকাবিকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বন্দীর পরিচয় সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। উপরন্তু একবার মার্কিন হেফাজত থেকে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যান। তাঁর হদিশ বের করতে জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ড ও ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিল্যান্স ২০০৬'র বসন্ত থেকে একিউআইর নিম্নপদস্থ সদস্যদের খুঁজতে শুরু করে। এক অভিযানে তারা আবু গারাইব এলাকার গ্রুপ লিডারকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। তাঁর কাছে জারকাবির একটি প্রচারণামূলক ভিডিও পাওয়া যায়। ভিডিওটি ছিল এডিট ছাড়া। এতে দেখা যায়, তিনি মেশিনগান হাতে নিয়ে হেলায় বসে আছেন।

একিউআইর এসব নিম্নপদস্থ ও মধ্যম সারির গ্রেপ্তার হওয়া নেতারা জারকাবির অবস্থান সম্পর্কে ভাসা ভাসা বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য দেন। সেখান থেকে তারা একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। তাঁর বর্তমান আধ্যাত্মিক গুরুর নামও জানতে পারে—আবদুর রহমান। এরপর শুরু হয় জারকাবির সঙ্গে আবদুর রহমানের কীভাবে যোগাযোগ হয় তা খুঁজে বের করার চেষ্টা। অবশেষে মার্কিনিরা সফলতার মুখ দেখে। শিকার তাদের ঠিক নাকের ডগায়ই থাকত। উত্তর-পূর্ব

বাগদাদে জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার বালাদ এয়ারবেজ থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে—হিব্বিব শহরে। একদম চোখের সামনে।

২০০৬ সালের ৭ জুন একটি সার্ভিল্যান্স ড্রোন নিঃশব্দে জারকাবির সঙ্গে আবদুর রহমানের যোগাযোগ নিরীক্ষণ করতে শুরু করে। সেদিন গোধূলিলগ্নে এফ-১৬ থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড ওজনের লেজার গাইডেড বোমা ফেলা হয়। পরক্ষণেই স্যাটেলাইট গাইডেড অস্ত্রের মাধ্যমে মুহুর্মুহু আক্রমণ শাণানো হয়। এত কিছুর পরও ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্স জারকাবিকে জীবিত অবস্থায় পায়। তবে মারাত্মক জখম ছিল। ম্যাকক্রিস্টালের লোকজন যতক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে, তিনি ঊর্ধ্বলোকে মহাযাত্রা করেছেন। জর্ডান ইন্টেলিজেন্স—যাদের দাবি অনুযায়ী তারা জারকাবিকে তাঁর নিজের চেয়েও বেশি চেনে—এই অবস্থান খুঁজে বের করার কৃতিত্বে ভাগ বসানোর চেষ্টা করে থাকে।

তাঁর মৃত্যুতে আল কায়েদার শীর্ষস্থানীয় নেতারা শোক প্রকাশ করেন। তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন। জীবদ্দশায় যা থেকে তিনি বরাবরই বঞ্চিত ছিলেন। তাঁকে নাইট, জিহাদি শার্দূল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শিয়া গণহত্যার জন্য আল কায়েদা নেতাদের পূর্বের সব তিরস্কার উবে যায়। বরং জারকাবির শিয়া হত্যার জন্য শিয়াদের দায়ী করা হয়। ক্রুসেডারদের সঙ্গে তাদের যোগসাজশের সাজা হিসেবেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

নতুন যুদ্ধকৌশল

জারকাবির মৃত্যুতে একিউআইর পতনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় সংগঠনটির 'বহিরাগত' ভাবমূর্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি দ্য মুজাহিদিন অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল গঠন করেছিলেন। কাউন্সিল আরেকজন বিদেশিকে নতুন আমির হিসেবে মনোনয়ন দেয়- আবু আইয়ুব আল মাসরি। মিসরের নাগরিক। যোদ্ধাদের মাঝে তিনি আবু হামজা আল মুহাজির নামে পরিচিত ছিলেন। জাওয়াহিরি ও জারকাবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনা ছিল। আশির দশকে তিনি জাওয়াহিরির আল জিহাদের সদস্য ছিলেন। জারকাবি যে বছর আফগানিস্তানে যান, সে বছর তিনিও আফগানিস্তানে যান এবং এক প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁদের পরিচয় হয়। ২০০৩ সালে দুজন একসাথেই ইরাক আসেন।

নেতা হিসেবে মাসরির মনোনয়ন ছিল একই সাথে জারকাবির ঐতিহ্য ধরে রাখা ও প্রত্যাখ্যান করার প্রয়াস। একিউআইকে আরও বেশি স্থানীয়করণের (ইরাকাইজেশন) জন্য তিনি ২০০৬'র অক্টোবরে ঘোষণা দেন যে তাঁর দল মূলত ইরাকের ইসলামিক প্রতিরোধযুদ্ধের একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম। নাম পরিবর্তন

করে—আইএসআই বা ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক রাখেন। এর তালুক ছিল নিনাওয়া, আনবার ও সালাহুদ্দিন প্রদেশ। পাশাপাশি সুন্নি অধ্যুষিত নয় এমন কিছু এলাকাও এদের প্রভাবাধীন ছিল। যেমন বাবিল, ওয়াসিত, দিয়ালা, বাগদাদ ও কিরকুক। এর মাঝে কিরকুক ছিল তেলসমৃদ্ধ বহুজাতিক শহর। আশির দশকে সাদ্দাম এটিকে 'আরবীয়করণ' করেন। কুর্দিরা এখনো এই শহরকে তাদের জেরুজালেম হিসেবে দেখে। মাসরির পাশাপাশি আবু ওমর আল বাগদাদিকে আইএসআইর নেতা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন ইরাকি। মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিল তাঁকে নির্বাচিত করে। তাঁকে কখনো কোনো অডিও কিংবা ভিডিওতে দেখা যায়নি। ধারণা করা হয়, নিরাপত্তার কারণেই। কিন্তু এর ফলে বিতর্ক দানা বেঁধে ওঠে যে আদৌ এই নামে কেউ আছে কি না। তাঁর মৃত্যু অবধি এই বিতর্ক চলে।

সংগ্রামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল মাসরি তাঁর পূর্বসূরির চেয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্তির পর মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ বাগদাদের স্থানীয় আমিরকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদে সে দুই নেতার পার্থক্যের কথা জানায়। জারকাবি নিজেকে ভাবতেন সুন্নিদের ত্রাণকর্তা, শিয়া নির্মমতার প্রতিপক্ষ। তাঁর প্রধান শত্রু ছিল শিয়াইজম। পক্ষান্তরে আল মাসরি প্রধান শত্রু হিসেবে দেখতেন পশ্চিমকে। তাঁর দৃষ্টিতে ইরাক যুদ্ধ ছিল পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আদর্শিক যুদ্ধের একটি রঙ্গমঞ্চ মাত্র। নিজেকে তিনি বিদ্রোহের রপ্তানিকারক ভাবতেন। একজন উঁচুমাপের যোদ্ধা ও রণবিশারদ হিসেবে মাসরি ছিলেন জারকাবির সমতুল্য।

জুয়েল রেবর্নের ভাষ্যমতে, 'মাসরি ছিল বহিরাগত। জাওয়াহিরি ও বিন লাদেন নিজেদের লোক হিসেবে তাকে ইরাকে পাঠিয়েছিল। এখানে এসে তার ঘনিষ্ঠতা হয় আবু ওমর বাগদাদির সাথে। সে ছিল একজন স্থানীয় সালাফি। এই যৌথ নেতৃত্বের ফলে একটি অভ্যন্তরীণ-বহিরাগত অংশীদারি গড়ে ওঠে। বাগদাদির দায়িত্ব ছিল স্থানীয়দের রিক্রুট করা, তাদের তত্ত্বাবধান করা ছিল মাসরির দায়িত্ব।'

ধীরে ধীরে একিউআই ইরাকে ক্ষমতার রাজনীতিতে দক্ষ হয়ে উঠছিল। বাহ্যত যাঁকে প্রধান মনে করা হতো, আদতে তিনি প্রধান ছিলেন না। মাসরি-বাগদাদি জোট রাজনৈতিক লক্ষ্যেও কাজ করেছে। মাসরি ছিলেন বিদেশি যোদ্ধাদের সাপ্লাই লাইন। তাঁর ভায়া হয়ে গোটা বিশ্ব থেকে বিদেশি যোদ্ধারা আসত। পক্ষান্তরে বাগদাদি নিজেকে সরাসরি আল কায়েদার সদস্য বলে পরিচয় দিতেন না। কারণ স্থানীয় সুন্নিদের মাঝে ইরাকি জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম কাজ করত। তারা মাতৃভূমির জন্য লড়ছিল।

উভয়েই মার্কিন দখলদার এবং তাদের উপপত্নী শিয়াদের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি ইসলামিক আমিরাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছিলেন কিন্তু অগ্রাধিকার প্রশ্নে তাঁদের মতভিন্নতা ছিল। সামরিক ইতিহাসবিদ আহমেদ হাশিমের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ সুন্নি গ্রুপের লক্ষ্য ছিল ইরাককে দখলদার মুক্ত করা। তারা ইসলামিক আমিরাত গড়ার স্বপ্নে যুদ্ধ করছিল না। আইএসআই সহজ লক্ষ্যবস্তুগুলোকে প্রথম টার্গেট করে—ইরাকি সেনাক্যাম্প ও শিয়া ধর্মীয় নেতারা। লেইদ আলখৌরি বলেন, 'এগুলো ছিল মূলত পাবলিক রিলেশন বা জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির কৌশল। এভাবে তারা সালাফিদের মতভিন্নতা আল কায়েদার বাইরে রাখতে চাচ্ছিল। বার্তাটা ছিল খুব সোজা—আমরাই একমাত্র গ্রুপ, যারা সারা বিশ্বের জিহাদি গ্রুপ কর্তৃক স্বীকৃত। তোমরা কেন এখনো আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ না?' জাইশুল ইসলাম তখনো আইএসআইর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়নি। এখনও হয়নি। তাই মাসরি ও বাগদাদি তাঁদের পাবলিক রিলেশন বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হন। এমনকি তাঁরা অন্যান্য জিহাদি গ্রুপের আয়ত্তাধীন এলাকা দখলের জন্য তাদেরকে হত্যাও করতে শুরু করেন। মাফিয়া-স্টাইল যুদ্ধ।

ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক নামের সঙ্গে মিল রাখার জন্য সংগঠনটি এর শুরা কাউন্সিল পরিবর্তন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তৈরি করে। যেমন কৃষি, তেল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এটি ছিল তাদের রাষ্ট্র বিনির্মাণ কিংবা নিদেনপক্ষে সেই ভাবমূর্তি তৈরির প্রচেষ্টা। সবচেয়ে বিতর্কিত ছিল—বিন লাদেনের নিকট বাইয়াতের শপথ নেওয়ার সময় মাসরি বাগদাদির বাইয়াতও গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে একিউআইকে একটি নতুন কর্তৃপক্ষের অধীনে সমর্পণ করেন। অনেকটা স্ত্রীর বর্তমানে রক্ষিতা গ্রহণের মতো ব্যাপার। মাসরি দুকূলই রক্ষা করে চলতে চাচ্ছিলেন। একদিকে তিনি আল কায়েদা ইন ইরাকের আমির থাকতে চাচ্ছিলেন আবার মূল আল কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভানও করছিলেন, যেন ইরাকে স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন। তবে ২০১৪ তে আইসিস জাওয়াহিরি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁদের মাঝে গুরুতর কোনো বিভেদ দেখা দেয়নি। ২০১৪ সালে যখন আইসিস গঠিত হয় এবং মাসরি তাঁর দলবল নিয়ে আইসিসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, আল কায়েদার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক চিরতরে নিভে যায়। আইমান আল জাওয়াহিরি খুব ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সে বছরের মে মাসে ইস্যু করা এক চিঠিতে তিনি কোনো এক তৃতীয় পক্ষের কথা উল্লেখ করে বলেন, সে মাসরি ও বাগদাদিকে বিরক্তিকর আহাম্মক বলে উল্লেখ করেছে। জারকাবির জীবদ্দশায় আল কায়েদা কখনোই একিউআইর প্রতি এত বিরক্তি প্রকাশ করেনি।

নতুন ভিবিআইইডি

আইএসআইর উত্থানের পাশাপাশি নতুন ধরনের জটিল ভিবিআইইডিরও উদ্ভব হয়েছিল। ইন্সটিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারের একজন অ্যানালিস্ট_জেসিকা লুইসের মতে, বর্তমানে আইসিসের সামরিক শক্তির নেপথ্যে রয়েছে ভিবিআইইডির সফল ব্যবহার। মূলত এর কারণেই তারা আদতে যতটুকু শক্তিশালী, তার চেয়েও বেশি সামরিক পেশি প্রদর্শন করতে পারছে। শুধু এই অস্ত্রের ধ্বংসলীলার কারণেই নয়, বরং আইসিসের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানের আগে ভিবিআইইডি ভীতি প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে কাবু করে ফেলত। 'সাধারণত চেকপয়েন্টগুলোতে এগুলো বেশি দেখা যেত। ভিবিআইইডি ছিল কোনো বড়সড় হামলার পূর্বাভাস কিংবা উত্তেজনা ছড়ানোর মাধ্যম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আইসিস তাদের স্ট্র্যাটেজি আর জনগণের রেসপন্স যাচাই করত এগুলো দিয়ে। মাঝে মাঝে বাগদাদের কোনো এলাকায় কিংবা ফোরাতের কোনো উপত্যকায় আক্রমণ চালাত। উদ্দেশ্য—ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্স ও শিয়া মিলিশিয়াদের মাঝে এর কী প্রভাব পড়ে তা দেখা। কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তা যাচাই করা।'

২০০৬ সালের শুরু থেকে মাসরি এই অস্ত্র ব্যবহারে হাত পাকান। বাগদাদের আশপাশ আক্রমণে আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। বাগদাদ বেল্টে অসংখ্য গাড়ি ও ট্রাক তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। বাগদাদ বেল্ট হচ্ছে বাগদাদকে ঘিরে থাকা গ্রাম ও শহরের সমষ্টি। এখানে মার্কিনিদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি। এসব ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরক বসানো গাড়ি ও ট্রাক তৈরি করা হতো।

আইসিস বাগদাদ ও বেল্ট অব বাগদাদকে ছয়টি জোন ও পাঁচটি কেন্দ্রে ভাগ করে। প্রতিটি জোন একজন স্থানীয় আমিরের অধীনে পরিচালিত হতো। আইসিসের ওপর জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ডের পরিচালিত এক ডিজিটাল সার্ভিল্যান্সে দেখা যায়, আবু জাযওয়ান নামের এ রকম একজন আমির আত্মঘাতী হামলার জন্য নারী ও শিশুদের রিক্রুট করছে। সে উত্তর ইরাকের তারমিয়া অঞ্চলের আমির ছিল। শহরটিতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের বসবাস। পাশাপাশি সে একিউআইর কয়েকটি সেল নিয়ন্ত্রণ করত। ইউএস ও ইরাকি বাহিনীর টহলের সময়সূচি সম্পর্কে আবু গাজওয়া খুব ভালো জানত। ফলে কীভাবে তাদের চোখ এড়াতে হবে, কীভাবে তাদের জন্য ফাঁদ বসাতে হবে, সেসব ছিল তার নখদর্পণে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক রিপোর্টে বলা হয়, '২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ভয়াবহ এক ট্রাকবোমা হামলা তারমিয়া সেনাক্যাম্পের সম্মুখভাগ উড়িয়ে দেয়। কংক্রিট ও কাচের টুকরা খঞ্জরের মতো এদিক-সেদিক উড়ছিল।

বাইরের তল্লাশিচৌকির সৈন্যরা প্রায় পরবর্তী চার ঘণ্টা ৭০-৮০ জন বিদ্রোহীর সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের জীবন বাঁচাতে পেরেছিল।' অতি সম্প্রতি আইসিস ভিবিআইইডির মাধ্যমে তারমিয়াতে আক্রমণ চালায়, ২০১৪'র জুনে ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বাড়ি উড়িয়ে দেয়। এবং অ্যাওয়াকেনিং প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত এক গোত্রনেতার বাড়িও ধ্বংস করে দেয়।

আবু গাজওয়া কীভাবে তার ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য পরিচালনা করত, এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। সেখান থেকে বোঝা যায়, আইএসআই তারমিয়াকে শুধু একটি বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবেই ব্যবহার করেনি, বরং এখানে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। 'আমরা জেলাশহরগুলো পরিচালনা করি। জনকল্যাণ, প্রশাসনিক সেবা ও জেলা কমিটিও রয়েছে। আমার ভাই আবু বকরের নেতৃত্বে সেটি পরিচালিত হয়।'

মূলত একিউআইর অধীনে তারমিয়া ছিল ইরাকের কুর্দিস্তানে আনসারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত ৫০০ বর্গকিলোমিটার রাজ্য, কিংবা বর্তমানে পূর্ব সিরিয়ার রাক্কায় আইসিসের গঠিত রাষ্ট্রের সদৃশ। আবু গাজওয়ানের তারমিয়া 'সাম্রাজ্যের' জন্য সে পৌর পরিবহন-ব্যবস্থাও তৈরি করেছিল। সাদা রঙের একটি নিশান ট্রাকে করে শহরে চক্কর দিত। ইরাকি পুলিশ থেকে এটি কবজা করে আইএসআইর কাজের জন্য ব্যবহার করত। দজলা নদীর তীরবর্তী এক ওয়াটার প্লান্ট থেকে করায়ত্ত করা একটি ফেরিও সে চালাত। আবু গাজওয়ানের ব্যক্তিগত অতীতও আইএসআইর যুদ্ধকৌশলের ওপর কিছুটা আলোকপাত করে—তার অপরাধপ্রবণতা।

সে এবং মাজিন আবু আবদুর রহমান একসময় কোয়ালিশন বাহিনীর ক্যাম্প বুকাতে বন্দী ছিল। ক্যাম্পটি ইরাকের বসরায় অবস্থিত। এটি ৯/১১'র হামলায় মারা যাওয়া নিউইয়র্ক সিটির এক ফায়ার সার্ভিস কর্মীর নামে নামকরণ করা হয়েছিল। জারকাবির সাওক্কা জেলখানার মতো ক্যাম্প বুকাও বিদ্রোহীদের আখড়া ও একাডেমি হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। ইসলামিস্টরা জেলে তাদের সহচরদের নিকট নিজেদের আদর্শ প্রচার করত। ফলে দেখা যেত, যারা সেক্যুলার কিংবা আপাত ধার্মিক অবস্থায় হাজতে ঢুকেছিল, একেকজন পুরোদস্তুর কট্টরপন্থী হয়ে বের হতো। জেলেই তারা নতুন মতবাদে দীক্ষিত হতো।

আবদুর রহমান ক্যাম্প বুকাতে শুধু শরিয়াহর সৌন্দর্যের পরিচয়ই পাননি, একিউআইর একজন বোমা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে নিজেও একজন বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। ইউএস কাস্টডিতে থেকেই তিনি একজন ভিবিআইইডি স্পেশালিস্ট হিসেবে গড়ে ওঠেন। একিউআইয়ের একজন সদস্য স্মৃতিচারণা করেছিল কীভাবে আবদুর রহমান ক্যাম্পে থাকাবস্থায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে এই যোগাযোগের ওপর ভিত্তি করে উত্তর বাগদাদ বেল্টে নিজস্ব জিহাদি বাহিনী দাঁড় করিয়ে ফেলেন। মাইকেল গর্ডন ও বার্নার্ড ট্রেইনরের বর্ণনায়, 'আবদুর রহমান তার সঙ্গে দুজন সহযোগী নিয়ে দুই দিনেই একটি গাড়িবোমা তৈরি করতে পারত। তারমিয়ার একটি ফার্ম হাউসকে তারা ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহার করত। গাড়িগুলো বিভিন্ন পার্কিং থেকে চুরি করে আদামিয়ায় রাখা হতো। তারপর প্লাস্টিক ও ঘরে তৈরি বিস্ফোরক সংযোজন করে তৈরি হতো ভয়ংকর ভিবিআইইডি। আক্রমণের আগের সন্ধ্যায় তৈরিকৃত গাড়িগুলো তারমিয়া থেকে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হতো। রাতারাতি এগুলো কোনো পার্কিং কিংবা গ্যারেজে রাখা হতো। সেখান থেকে আক্রমণকারী চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যেত আক্রমণের জন্য।'

বালাদ এয়ারবেসের ১৩ মাইল দূরে একিউআইর প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর ৪০ মাইল দূরে গাড়িবোমা তৈরির এক কারখানা প্রস্তুত হচ্ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়
অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্ট

আইএসআইর কবলে ইরাক

'আনবারের অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্টের অভিজ্ঞতা খুবই বাজে,' সাবেক এক উচ্চপদস্থ ইরাকি কর্মকর্তা ২০১৪ সালের শেষ দিকে আমাদের বলছিল। 'যেসব লোক আল কায়েদার বিপক্ষে লড়াই করেছে, লড়াই শেষে সরকার তাদের ভুলে গেছে। অনেকে আল কায়েদার হাতে নিহত হয়েছে। এমনকি তাদের অনেকে খোদ ইরাকি বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছে। যদি না বাগদাদ তার কৌশল পরিবর্তন করে, তবে জনগণ আইসিসের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এ ধরনের উদ্যোগে কতটুকু সাড়া দেবে সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।' এই আন্দোলনের সূচনার ইতিহাস বুঝলে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সহজ হবে।

সাহওয়া[১১]

দ্য ডেজার্ট প্রটেক্টর প্রোগ্রাম যদিও স্বল্পমেয়াদি ছিল, কিন্তু কার্যকর ছিল দারুণ। এটি ছিল রামাদির গোত্রনেতাদের সঙ্গে মার্কিন বাহিনীর মৈত্রী তৈরির প্রচেষ্টা। ২০০৬-এ আনবারের প্রাদেশিক রাজধানী রামাদি দ্বিতীয়বারের মতো একিউআইর দখলে যায়। এই শহরে জিহাদিরা ছিল খুবই শক্তিশালী ও সুরক্ষিত। তারা মার্কিন বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের মতো আলাদা শাখা খুলেছিল। যাদের কাজ ছিল শনাক্ত করা যায় না এমন আইইডি তৈরি করা। এগুলো দিয়ে তারা মার্কিন ও ইরাকি বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেয় এবং তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সমর্থ হয়। ইলেকট্রিক করাত ব্যবহার করে রাস্তার পিচ কেটে ফেলা হতো, তারপর গর্তগুলো বিস্ফোরক

---

[১১] সাহওয়া/অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্ট হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিরোধযোদ্ধাদের দমন করার জন্য মার্কিন বাহিনী কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ। তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে মিলিশিয়া হিসেবে গড়ে তোলা। ইরাকে বড় মাত্রায় দুটি সাহওয়া হয়েছিল। প্রথমটি ছিল আনবার প্রদেশের রাজধানী রামাদিতে। এর অফিশিয়াল নাম দ্য সার্জ বা তরঙ্গ। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে মার্কিন সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, এর অংশ হিসেবে ইরাকিদের সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয়ে ২০০৮ সালে তা সমাপ্ত হয়। (অনুবাদক)

দিয়ে ভর্তি করে পুনরায় উপরে পিচের প্রলেপ বসিয়ে দেওয়া হতো। বাহ্যত দেখে মনে হতো অক্ষত রাস্তাই। খালি চোখে ধরা যেত না, যতক্ষণ না সেটা বিস্ফোরিত হয়ে ব্র্যাডলি যুদ্ধযান কিংবা কোনো আব্রাম ট্যাঙ্ককে উড়িয়ে দিচ্ছে। ততক্ষণে অবশ্য আরোহীদের কম্ম সারা। এসব বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট গর্তগুলোও খুব ভোগাত। স্যুয়ারেজের লাইন ফেটে যেত, সারা রাস্তা ময়লা পানিতে নর্দমায় পরিণত হতো।

ইরাকের অন্যান্য অঞ্চলের মতো রামাদির প্রাদেশিক সরকারকেও দুটি তালিকা রাখতে হতো। একটি প্রাদেশিক সরকারি কর্মকর্তাদের, অন্যটি সিকিউরিটি ফোর্স ও পৌরসভার সেসব কর্মকর্তার, যারা একিউআইর সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্রে ঘায়েল হয়েছে—তেল চোরাচালানের পয়সা। উত্তরের বাজি অয়েল রিফাইনারি থেকে ব্যারেল ব্যারেল অপরিশোধিত চোরাই তেল নিয়মিত রামাদিতে আসত, সেখান থেকে চলে যেত ইরাকের ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রির জন্য। সাদ্দাম আমলে এটিই ছিল গোত্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া। কিন্তু বর্তমানে আইএসআইর 'ভাই'দের সঙ্গে কাজ করা একটু কঠিনই বটে।

খোদ গোত্রনেতারাই অপহরণ ও হত্যার শিকার হওয়ার ভয়ে থাকত। কারণ তেল চোরাচালান ছিল বিদ্রোহীদের অর্থের উৎস। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ এখান থেকেই হয়। এ নিয়ে গন্ডগোল বেধে ইতিমধ্যেই আলবু আয়েশা ও আলবু দিয়াবের দুই শেখ খুন হয়েছেন। অন্যরাও তেল নিয়ে ঝামেলার কারণে টার্গেটে পরিণত হয়। নৈশচরবৃত্তি খুব বেড়ে গিয়েছিল। যেসব পরিবার বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ইরাক পুলিশ ও অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাদেরকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ দেয়। অল্প কদিনেই একটা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে রেভল্যুশনারিজ অব আনবারের ব্যানারে। এটা ছিল সাহওয়া কিংবা অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্টের সূচনা। এই প্রতিবিপ্লবীরা রামাদিতে এতটাই সফল হয় যে একিউআই তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা চালাতে বাধ্য হয়।

রামাদিতে মার্কিনি ও ইরাকি সরকারি বাহিনীর অন্যতম সফলতা ছিল তারা যুদ্ধপরবর্তী কৌশল হিসেবে স্থানীয় পুলিশ নিয়োগ দেয়। কিন্তু সেই নিয়োগপ্রক্রিয়া রামাদির কেন্দ্রস্থলে সম্পন্ন করা হয়নি। কারণ, এর নিরাপত্তাব্যবস্থা এখনো নড়বড়ে, বিদ্রোহীদের আক্রমণের সহজ লক্ষ্যবস্তু। দুই বছর আগের গ্লাস ফ্যাক্টরি ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি হওয়া খুবই সম্ভব। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া সরিয়ে নেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী গোত্রীয় এলাকায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ধীরে ধীরে পরিপক্ব হয়ে ওঠে। আমেরিকান ও গোত্রনেতাদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা তৈরি হতে শুরু করে। ফলে এই আন্দোলনকে অফিশিয়ালি স্বীকৃতি দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

এই আন্দোলনে মার্কিনিদের গুরুত্বপূর্ণ একজন মিত্র ছিল আবদুস সাত্তার আর-রিশাওয়ি, ইতিপূর্বে মার্কিনিরাই তার বাড়িতে দুবার অভিযান চালিয়েছে বিদ্রোহীদের আর্থিক সহায়তা করার অভিযোগে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের ফলে সে 'শত্রুর শত্রু'র সঙ্গে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করে। মার্কিনিদের সঙ্গে যোগ দেয়। 'বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোত্রগুলোর জন্য আমরা ছিলাম সেকেন্ড অপশন,' মার্কিন এক লেফটেন্যান্ট সাংবাদিক জর্জ প্যাকারকে বলেছিলেন। ইতিপূর্বে জেনারেল ম্যাকমাস্টারেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল তেল আফারে। আর-রিশাওয়ি পরবর্তী সময়ে মার্কিনিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রে পরিণত হয়।

একিউআই তাকে দমন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের প্রতি গোত্রীয় মুগ্ধতা তত দিনে উবে গেছে, উল্টো এগুলো জ্বলামুখে পরিণত হয়েছে। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আর-রিশাওয়ি 'আনবার ইমার্জেন্সি কাউন্সিল' গঠন করে, যারা একিউআইর বিরুদ্ধে কোয়ালিশন বাহিনীকে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিল। এই কাউন্সিলে ১৭টি গোত্র যোগ দেয়। খুব দ্রুতই কাউন্সিল বর্ধিত হয় এবং নাম পাল্টে 'আনবার অ্যাওয়াকেনিং' রাখা হয়। রিশাওয়ি ২০০৬ সালের অক্টোবরে ইরাকি পুলিশ ফোর্সে ৪০০ জনের অন্তর্ভুক্তি তদারকি করে, নভেম্বরে আরও ৫০০ জন। তার দূরদর্শিতাবলে সে বুঝতে পেরেছিল যে এই ৯০০ জনের রিক্রুটমেন্ট আনবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না। কারণ তারা এখনো অপরিপক্ব। প্রশিক্ষণের জন্য এদেরকে জর্ডান পাঠানো হবে। তত দিন এখানে নিরাপত্তা ঘাটতি থাকবে। একিউআই নিঃসন্দেহে এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাইবে।

সে প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকিকে একটি অস্থায়ী আধা সামরিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠনে সম্মত করতে সমর্থ হয়। 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স ইউনিট' নামে এটি গঠন করা হয়। তাদের নেতৃত্বে নবিশ কেউ ছিল না। বরং ইরাকি আর্মির অবসরপ্রাপ্ত ঝানু গোত্রনেতারা ছিল, যারা যুদ্ধ কীভাবে লড়তে হয়, তা ভালোই জানত। ২০০৭ সালের নববর্ষের আগেই ইউনিটের সদস্য দুই হাজার ছাড়িয়ে যায়। এই অনিয়মিত বাহিনীকে স্থায়ী করার জন্য মার্কিনিরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে গোটা রামাদিতে অনেক সাব-পুলিশ স্টেশন তৈরি করে। এটি গোত্রনেতাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে খুব প্রভাবিত করে। তারা ভাবতে শুরু করে, মার্কিন-ইরাক কোয়ালিশন বাহিনী এখানে স্থায়ীভাবে আইনের শাসন বলবৎ করবে। ফলে নতুন বিদ্রোহ সহজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। শহরের আশপাশে ভিবিআইইইডি আক্রমণ হ্রাস পায়।

আর-রিশাওয়ির প্রাথমিক সাফল্যের ফলে অতিশয়োক্তি ও অতি-আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। মার্কিনিদের কানেও এসব তখন মধু ঢালত। 'আল্লাহর শপথ! যদি

আমার উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, উন্নত সামরিক যান ও পর্যাপ্ত সহায়তা থাকত, তবে আল কায়েদাকে ইরাক তো ইরাক, আফগানিস্তান থেকেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারতাম,' ২০০৭ সালে সে নিউইয়র্ক টাইমসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলে। একই কথার পুনরাবৃত্তি করে প্রেসিডেন্ট বুশের সামনে, যখন বাগদাদ সফরকালে তাদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ইরাক থেকে আল কায়েদার বিনাশ দেখে কবরে যাওয়ার ভাগ্য জুটেনি তার। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক দিন পরই মুজাহিদিনরা তাকে হত্যা করে। আনবার অ্যাওয়াকেনিং ছিল নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন, ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নমুখী নয়। ফলে অল্প কদিনের ভেতরেই এটি ব্রিগেড লেভেলে পৌঁছে যায়। এটা সম্ভব হয়েছিল তড়িৎ-চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার কিছু কমান্ডারের ফলে, যারা কদিন আগেও বিদ্রোহীদের সঙ্গে একত্রে চা পান করত।

২০০৫ সালের নির্বাচনের পর কর্তৃপক্ষ বুঝে যায়—সব সুন্নি বিদ্রোহীকে যুদ্ধ, বন্দী কিংবা হত্যা করে দমন করতে হবে না। কিছু কিছু দলকে অন্যভাবেও 'ম্যানেজ' করা যাবে। জেনারেল ক্যাসির ব্রিটিশ ডেপুটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল গ্রিয়াম ল্যাম্ব অনেক বলেছে যে এটা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। সুন্নিরা যখন বুঝে গেল একিউআইর উপস্থিতি তাদের নিজেদের জন্যও ধ্বংসাত্মক, তুলনামূলক কম কট্টরপন্থী অনেক গ্রুপই কোয়ালিশন বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করে। কিন্তু বড় সমস্যা ছিল কার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে আর কে দিল্লি তক চলে গেছে তা খুঁজে বের করা। একিউআইর সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল খুবই দুরূহ, নিঃসন্দেহে। কিন্তু ইরাকে তাদের ইসলামিক স্টেট গঠনের সহযোগীদের কী খবর? ল্যাম্ব সাক্ষাৎ করেছিল 'আনসারুস সুন্নাহ'-এর এক আমিরের সাথে। এটি একটি সালাফি গ্রুপ, যারা আইসিসের পদ্ধতির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমির তাকে বলেছিল, 'বিদেশি দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং এই লড়াই চলবে। কিন্তু আনসারুস সুন্নাহ মনে করে, ইরাকের সবচেয়ে বড় শত্রু মাসরি-বাগদাদির জল্লাদ ও ধর্ষকেরা। আনবারে সাড়ে তিন বছর তাদেরকে কাছ থেকে দেখেছি। এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে তোমরা আমাদের দেশের জন্য হুমকি হলেও আমাদের ইমান ও জীবনাচারের জন্য হুমকি না, তা হচ্ছে একিউআই।'

নতুন ঢেউ

একিউআইর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে গতানুগতিক সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরের ফলে ইরাকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর 'নবতরঙ্গ' (এই প্রোগ্রামের ইংরেজি নাম সার্জ) সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে, বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। ২০০৭ সালে ওয়াশিংটনে বহু রাজনৈতিক বিতর্কের পর এই

প্রোগ্রাম শুরু হয়। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের পর জেনারেল প্যাট্রিয়াসের তত্ত্বাবধানে ইরাকে স্থানীয় যোদ্ধাদের নিয়ে নতুন পাঁচটি ব্রিগেড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রায় ৩০ হাজার নতুন সেনা। ফলে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায়। নতুন স্ট্র্যাটেজি ছিল—শুধু একিউআইর বিরুদ্ধেই লড়াই হবে না, এখন থেকে রাষ্ট্র সমর্থিত শিয়া মিলিশিয়াদের সুবিশাল নেটওয়ার্ক এবং ইরানি প্রক্সিদের বিরুদ্ধেও লড়াই হবে সমানতালে। তারা একিউআইর চেয়ে মার্কিনিদের ক্ষতি কোনো অংশে কম করেনি। তাই এখন হঠাৎ করেই সুন্নি বেসামরিক জনগণকেও জিহাদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই স্ট্র্যাটেজির উদ্ভাবককে এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জেনারেল প্যাট্রিয়াস ও মেরিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেমস ম্যাট্রিস মাঠপর্যায়ে এই কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২৮২ পৃষ্ঠার এক বিশাল গাইডলাইন রচনা করেন। এর নাম ছিল সিওআইএন (COIN) বা কাউন্টার ইন সার্জেন্সি। ছড়ানো-ছিটানো গেরিলাদের দমন করার জন্য তারা যে এলাকায় থাকে, যাদের সহযোগিতায় তাদের প্ল্যান বাস্তবায়ন করে খোদ তাদেরকেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা ছিল এই স্ট্র্যাটেজির মূলকথা। অনেকটা সাগরকে মাছের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার মতো। এই পরিকল্পনামাফিক প্রতি এক হাজার জন সাধারণ মানুষের বিপরীতে ২০ জন সেনা ও পুলিশ থাকবে নিরাপত্তার জন্য। এর ভেতর ইরাকি আর্মি ও পুলিশও অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নি গোত্রগুলোকে এ কথা বোঝানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না যে একিউআইকে দমন করা তাদের জন্য লাভজনক। তারা সেটা বহু আগেই বুঝে গেছে এবং ইরাকি সেনাবাহিনীর চাইতে অনেক বেশি দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করে আসছে। প্যাট্রিয়াস সরেজমিনে তা প্রত্যক্ষ করেন।

তাঁকে ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিষ্ক্রিয়তা আর দুর্নীতির ভারে এই প্রোগ্রামটা ছিল জর্জরিত। অনেক ক্যাডেট ছিল অযোগ্য কিংবা যুদ্ধ করতে অনাগ্রহী। বাকিরা অস্ত্র চুরি করে নিয়ে বেচে দিত। এগুলো প্রায়ই সেই শত্রুর হাতে যেত, যাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এই অস্ত্র আনা হয়েছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২০০৭ সালে 'ইউএস গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিবিলিটি অফিস' একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে দেখা যায়, নথিভুক্ত সংগ্রহশালা থেকে মাত্র ১ লাখ ৯০ হাজার একে-৪৭ লাপাত্তা হয়েছে। মানে হচ্ছে আমেরিকানদের ট্যাক্সের পয়সায় কেনা অস্ত্রশস্ত্র মার্কিনিদের হত্যায়ই ব্যবহৃত হচ্ছিল।

সার্জের প্রথম দুটি ব্রিগেড একিউআইর ভ্রমরকুঞ্জ বাগদাদে মোতায়েন করা হয়। একিউআই কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করে নতুন এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করার

তোড়জোড় শুরু করে। বাগদাদ বেল্ট ছিল তাদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র। এর কাছাকাছি থাকা চেকপোস্টগুলো ভিবিআইইডি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ফেব্রুয়ারির এক দিনেই এ রকম পাঁচটি হামলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ মারা যায়। শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায় বাস করে এমন এলাকাগুলো সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হয়। পরস্পরকে অপহরণ, হত্যা, নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক নির্মূল অভিযান ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই সমস্যার সমাধানে মার্কিন বাহিনীর পরামর্শ ছিল—মজবুত কংক্রিটের দেয়াল তুলে দুই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

'এই অঞ্চলটা (বাগদাদ বেল্ট) ছিল বাগদাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ অংশ। ২০০৫-২০০৭ সময়কালে এসব এলাকার সুন্নি পরিবারগুলো একিউআইর প্রধান সমর্থনকেন্দ্র ছিল। অবশেষে আমরা বাগদাদে জয়ী হতে পেরেছি। কারণ বহু বছর ব্যয় করে তারা যে সাপোর্ট চেইন গড়ে তুলেছিল, আমরা সেটা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম,' জিম হিকি আমাদের বলছিলেন।

দিয়ালার সেকাল-একাল[১২]

ইরাকের রাজধানীতে একিউআইর বিরুদ্ধে মার্কিনিদের ব্যর্থতা ছিল অনেকটা কূটচালের ফল। ২০০৬ সালের জুনে হিব্বিবে জারকাবিকে হত্যা করার পর জয়েন্ট সিকিউরিটি তাদের কিছু গোয়েন্দা নথি হস্তগত করে। যাতে দেখা যায়, বিদ্রোহীরা ভাবছিল মার্কিনিদের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা একে ট্রায়াঙ্গাল অব ডেথ নামে ডাকত। এর অবস্থান ছিল বাগদাদের দক্ষিণাঞ্চলে। হত্যার কিছুদিন আগে হেডকোয়ার্টার হিসেবে তিনি আরেকটি জায়গা চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু কোয়ালিশন বাহিনীর এই জয় ছিল সাময়িক। এগুলো হঠাৎ পাওয়া সাফল্য, কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফসল নয়।

এক জায়গায় একিউআইর পতন কি দেশব্যাপী তাদের পরাজয়? খোদ ইউএস ডিফেন্সের ভেতরেই এ নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। জেনারেল প্যাট্রিয়াসের পূর্বসূরি জর্জ ক্যাসির তত্ত্বাবধানে একটি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কমিশন তাদের রিপোর্টের উপসংহারে বলে, জারকাবির প্রধান আক্রমণের স্রোত ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসছে। যেমন আত্মঘাতী হামলা, স্নাইপার আক্রমণ, আইইডি বম্বিং। সেই সঙ্গে মুজাহিদিনদের সংখ্যাও কমে আসছিল।

---

[১২] ইরাকি অ্যাওয়াকেনিং, সাহওয়া কিংবা সার্জ যা-ই বলি না কেন, এর মূল কেন্দ্র ছিল দুটি। একটি আনবার, অপরটি দিয়ালা। দিয়ালা দক্ষিণ-পূর্ব ইরাকের একটি প্রদেশ, এর প্রাদেশিক রাজধানী বাকুবা। (অনুবাদক)

ক্যাসির রিপোর্টে আরও বলা হয়, ইরাকের ১৮টি প্রদেশের মধ্যে শুধু চারটিতে একিউআই শক্তিশালী ছিল। তাদের আক্রমণ সেগুলো ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল। দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা অবশিষ্ট প্রদেশগুলোতে বসবাস করত। তারা সম্মিলিতভাবে মাত্র ৬ শতাংশ আক্রমণের শিকার হয়। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, গোটা ইরাকে একিউআই দ্রুত শক্তি হারাচ্ছে।

ক্যাসির এই আশাবাদী রিপোর্টের বিরোধিতা করেছেন ডেরিক হার্ভি। তাঁর ভাষ্যমতে, এই স্টাডিটা শর্ট টাইম সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে এর সাফল্য প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি ডিআইএ কমিশনের জরিপের কথা উল্লেখ করেন। এতে দেখা যায়, সাধারণ ইরাকিদের সরকারের ওপর ভরসা প্রায় শূন্যের কোঠায়। পক্ষান্তরে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধকারীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এটি ভালো কোনো নিদর্শন নয়। কারণ জনগণের সমর্থন সেনাবাহিনীর শক্তির অনেক বড় উৎস। এটি না থাকলে ন্যাশনাল আর্মি বড় ধরনের গোলযোগে পড়ার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীর বিদ্রোহীদের আক্রমণ গণনা পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছেন।

তারা শুধু সফল আক্রমণগুলোই গণনা করেছে, অর্থাৎ যেগুলোর ফলে মানুষ হতাহত হয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ আক্রমণগুলোর কী হবে? একিউআইর যেসব ভিবিআইইডি কোনো কারণে বিস্ফোরিত হয়নি কিংবা বিস্ফোরিত হলেও কেউ হতাহত হয়নি, সেগুলো কি তাদের শক্তিমত্তা ও আক্রমণ চালানোর সক্ষমতার প্রমাণ নয়? দিন শেষে কিন্তু হার্ভির নৈরাশ্যবাদী গবেষণাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। একিউআই শহর থেকে শহরে তাদের কমান্ড সেন্টার স্থানান্তর করেছে লাগাতার। ফলে ক্যাসির কাউন্টার টেরোরিজম স্ট্র্যাটেজি সাপলুডু খেলায় পরিণত হয়েছে।

২০০৭ সালে একিউআই দিয়ালা প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী বাকুবায় নিজেদের হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করে, আগের বছর যেমন করেছিল রামাদিতে। তবে এবার শুধু শহরের কেন্দ্রস্থল দখল করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলগুলোও করায়ত্ত করে নেয়। দিয়ালা নদীর কোল ঘেঁষে বয়ে চলা এই অঞ্চল এবং এর সবুজাভ প্রকৃতি তাদের কার্যক্রমকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ছাদ হিসেবে কাজ করেছে। তাদের ব্যাকআপ সেন্টার ছিল নিকটস্থ বাহরুজ শহর। এককালে এটি ছিল বাথিস্টদের দুর্গ। এখানে জনসম্মুখে হত্যা কিংবা অপহরণ করা হতো। যদি ভাগ্য সহায় হতো, তবে নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হতো না। একিউআই শহরের রুটির কারখানাগুলোর দখল নিয়ে নেয়। যারা এখনো বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ হয়নি, তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করে। পরবর্তী সময়ে বাহরুজ ইরাক যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুতর যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর একটি হয়ে ওঠে।

২০০৭ সালের মার্চে লড়াই শুরু হয়। ইউএস স্ট্রাইকার ব্যাটালিয়ন এবং একটি প্যারাট্রুপার স্কোয়াড্রন শহর পুনর্দখলে অভিযান শুরু করে। তারা বিদ্রোহীদের ভয়াবহ আরপিজি ও স্নাইপার আক্রমণের কবলে পড়ে। যোদ্ধারা ছোট ছোট মার্কিন সেনাদলকে ফাঁদে ফেলে টার্গেট করে। সার্জেন্ট বেঞ্জামিন হ্যানার ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, 'তারা খুবই নিয়ন্ত্রিত। তাদের প্ল্যান অত্যন্ত ভালো, হিউম্যান নেটওয়ার্কিংও চমৎকার। তাদের পূর্বসতর্কীকরণ প্রক্রিয়া বেশ কার্যকর। ফাঁদ তৈরিতে তারা ছিল ওস্তাদ। তারা এক মাইলের মধ্যে ২৭টি আইইডি বসিয়েছে, কিন্তু প্রতি তিনটি কিংবা চারটির মধ্যে একটি কার্যকর। বাকিগুলো ভুয়া।' গর্ডন ও ট্রেইলরকে স্টাফ সার্জেন্ট শন ম্যাকগুইর বলেছেন, 'তাদের মতো সংগঠন আমি কখনো দেখিনি। তারা ছিল সুসংগঠিত। দুর্দান্ত প্রশিক্ষিত। গুলি ছুড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তারা তোমাকে ট্র্যাপে ফেলবে, তোমার ওপর তাদের কলাকৌশল প্রয়োগ করবে। মনে হবে, তুমি ইউএস সোলজারদের ট্রেনিং দেখছ।'

বাহরুজে জিহাদিরা আরেকটি ভয়ংকর অস্ত্রের যথাযথ ব্যবহার করেছে—হাউস বর্ন ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা এইচবিআইইডি। কৌশলটা ছিল—বাসাবাড়ির দেয়ালের মাঝে বিস্ফোরক বসিয়ে রাখত। মার্কিন সৈন্যরা প্রবেশ করামাত্রই বিস্ফোরিত হতো। ২০১৩ সালে আইসিস নিনাওয়াতে উচ্চমাত্রার বিস্ফোরকসহ এইচবিআইইডি ব্যবহার করেছে ইরাকি সৈন্য ও পুলিশের বিরুদ্ধে। ব্যাপক অঙ্গহানি ঘটেছে কিংবা ভয়েই তারা পালিয়ে গেছে। পরের বছর আইসিস খুব সহজেই মসুল দখল করে নেয়। ফলে ইতিমধ্যেই আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগা ইরাকি বাহিনী প্রায় হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

বাহরুজ যুদ্ধের অনেক অনেক পর দিয়ালা পুনরায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কবলে পড়ে। সুন্নি সাহওয়াতরা (জাগরণ কর্মী) নিপীড়ক প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তাদেরকে দমন করার জন্য শিয়া মিলিশিয়ারাও যুদ্ধে নামে। এ ছাড়া এই শহরকে আরও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আবু বকর আল বাগদাদি ছিলেন দিয়ালারই এক গোত্রের সন্তান। বুবারদি গোত্রের। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আইসিস দিয়ালায় নতুন ওলায়াত বা প্রদেশ ঘোষণা করে। তাদের মুখপাত্র আদনানিও ঘোষণা করেন যে শিয়াদের বিরুদ্ধে জিহাদিদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবে দিয়ালা।

ভেড়া-সিংহের দ্বৈরথ

বাহরুজ যুদ্ধে গ্রিয়াম ল্যাম্বের দক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পায়। সে তুলনামূলক কম কট্টর সুন্নি বিদ্রোহীদের একিউআইর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। সব গ্রুপের সাথেই কাজ করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের কেউই পূর্বতন মিত্রের

সঙ্গে আর হাত মেলায়নি। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল ইসলামিক আর্মি। ২০০৪ সালে দ্বিতীয় ফালুজা যুদ্ধের কদিন পরই দলটির নেতা ইসমাইল জুবাইরি ওয়াশিংটন পোস্টকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। তিনি ছিলেন একজন সুন্নি গোত্রনেতা। তাঁর দল ছিল সর্বজনীন ইরাকি। সুন্নি, কুর্দি, শিয়া সবই ছিল তাঁর দলে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিদেশি আগ্রাসীদের তাড়ানো।

ইসলামিক আর্মি ছিল ইরাকের সর্ববৃহৎ সালাফিস্ট-বাথিস্ট দল। ২০০৭ সালের এপ্রিলে তারা একিউআইর ওপর এতটাই বিরক্ত হয় যে সরাসরি বিন লাদেনের নিকট আবেদন জানায়, তাঁর শিষ্যের ঘাড়ে লাগাম দিতে। এতে কোনো কাজ হয়নি। ফলে তারা আমেরিকানদের শরণাপন্ন হয়। ইসলামিক আর্মির এক কমান্ডার আবু আজজাম মার্কিন সেনাবাহিনীকে বাগদাদ বেল্টের পুনর্দখলে সহায়তা করার প্রস্তাব দেন। বিশেষত আবু গারাইব। এখানে সুন্নিরা শিয়া মিলিশিয়া ও একিউআইর দ্বিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হতো। আবু আজজাম মার্কিন বাহিনী ও প্রায় তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মাঝে এক মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেন, যারা অ্যাওয়াকেনিং স্টাইলে একটি সেনাবাহিনী গঠনে ইচ্ছুক ছিল।

এই তিন হাজারের মাঝে '১৯২০ ব্রিগেডে'র আবু মারুফও ছিল। সে ছিল আবু গারাইবে কোয়ালিশন বাহিনীর সপ্তম মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি। মার্কিনিরা এমন কারও সঙ্গে দোস্তি পাতাতে অনিচ্ছুক ছিল যে কয়েক সপ্তাহ আগেও খুঁজে খুঁজে তাদেরকে ঠেঙ্গাচ্ছিল। তাই তারা তার আনুগত্য বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। বেল্ট সিটি রিদওয়ানিয়ার প্রধান ১০ জন একিউআই নেতার নাম মার্কিনিদের হাতে আসে। নামগুলো তারা আবু মারুফকে দেয়। কয়েক দিন পর সে সেলফোনে একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়, যাতে দেখা যায় ১০ জনের একজনকে বন্দী করে নির্যাতন করা হচ্ছে।

আবু মারুফের সঙ্গে ছিল বাগদাদের শক্তিশালী জুবিয়া গোত্র। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে একিউআইর বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক কিছু অভিযান চালায়। ফলে তার আনুগত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। পশ্চিম বাগদাদে মার্কিন বাহিনীর সহায়তা করে ফুরসানুর রাফিদাইন (নাইটস অব টু রিভার্স) নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এরা মার্কিন বিমানের বোম্বিং টার্গেট নির্ধারণে সহায়তা করত। পর্যায়ক্রমে এই সাহওয়াও অনানুষ্ঠানিক সিভিল ওয়ার থেকে প্যাট্রিয়াসের কাউন্টার ইনসার্জেন্সি প্রোগ্রামের অফিশিয়াল অঙ্গসংস্থায় পরিণত হয়। তত্ত্বাবধানে ছিল আঞ্চলিক অ্যাওয়াকেনিং কাউন্সিল, যারা সরাসরি ইউএস মিলিটারি ও ইরাকি প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট জবাবদিহি করত। প্রথমে এর নাম দেওয়া হয় কনসার্নড লোকাল সিটিজেন প্রোগ্রাম। কদিন বাদে নাম পাল্টে রাখা হয় সন্স অব ইরাক। ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদানের পূর্ব অভিজ্ঞতা

থেকে প্যাট্রিয়াস ভালোই শিক্ষা পেয়েছিল। তাই এবার সে সতর্ক হয়ে যায়। সে অ্যাওয়াকেনিং স্বেচ্ছাসেবীদের বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহ করে সেগুলো কেন্দ্রীয় ডাটাবেসে রেখে দেয়। এখান থেকে তাদের ট্র্যাক করা হতো।

দীর্ঘ সময় ইরাকে কাটানো মার্কিন কূটনীতিবিদ আলি খিদিরির ভাষায়, 'সাহওয়াকে বুঝতে ভুল করেছে মানুষ। এটি যত না সামরিক কৌশল ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল কূটনৈতিক প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে ইরাকের বিভিন্ন মতাদর্শের নেতাদের একসাথে কাজ করতে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরাকি নেতাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আস্থা তৈরির সময়-সুযোগ করে দেওয়া। এ জন্যই সাহওয়া শুরু হওয়ার পর ২০০৯ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় ৯০ শতাংশ সহিংসতা হ্রাস পায়।'

অবাক হওয়ার কিছু নেই- সেই নির্বাচনে সুন্নিপ্রধান প্রদেশগুলোতে সেসব গোত্রনেতা জয়ী হন, যাঁরা একিউআইকে বিনাশ করতে পেরেছিলেন। আর-রিশাওয়ির ভাই আনবারের প্রাদেশিক কাউন্সিলে একটি সিট পায়। একইভাবে নিনাওয়া ও দিয়ালাতে সুন্নি দলগুলো সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন নিশ্চিত করে।

জালে বন্দী একিউআই

২০১০ এর জুন। পেন্টাগনে সংবাদ সম্মেলন করছেন জেনারেল অদিয়ারনো। তাঁর দাবি অনুযায়ী বিগত তিন মাসে মার্কিন সেনাবাহিনী একিউআইর শীর্ষ ৪২ জন নেতার মধ্যে ৩৪ জনকে বন্দী কিংবা হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা এখন নিজেদের পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছে। ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। একিউআই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় মূলত জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ড, ইরাকি সার্জ বা সাহওয়া ব্রিগেড, সন্স অব ইরাকের মিলিশিয়াদের উপর্যুপরি আক্রমণে। গোদের ওপর বিষফোড়া হিসেবে ছিল তাদের ভঙ্গুর যোগাযোগব্যবস্থা।

বিগত কয়েক বছর ধরেই ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি জিহাদিদের টেলিযোগাযোগে আড়ি পেতে আসছিল। সেগুলো তারা পাঠিয়ে দিত সিআইএ ও জয়েন্ট সিকিউরিটির কাছে। অতঃপর এদেরকে ট্র্যাক করে হয়তো গ্রেপ্তার করত কিংবা 'নাই' করে দিত। ডেরিক হার্ভির ভাষায়, এটি ছিল ডারউইনিজম। 'যেসব মাথামোটারা সেলফোন ব্যবহার করত, তারা একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছিল। মেষের পাল খুঁজে বের করার পথ ছিল এই সেলফোন। তবে এর একটা নেতিবাচক দিকও ছিল। পালের গোদাদেরকে ট্রেস করার জন্য কখনো কখনো প্রভাবশালী

নেতাদের ছাড় দিতে হতো, যাদের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে আইসিসও একই ফাঁদে পা দিচ্ছে।'

সার্জ কিংবা অ্যাওয়াকেনিংয়ের পাশাপাশি আরও একটি কারণে ২০০৭ থেকে একিউআইর ভাগ্যতারকা অস্তমিত হতে শুরু করে। ফলে সাম্প্রদায়িক ও ভ্রাতৃঘাতী রক্তারক্তি ছাপিয়ে সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে আবার সর্ব-ইরাকি জাতীয়তাবাদ জেগে উঠতে শুরু করে। সে বছর ইরাকি গায়িকা সাদা আল হোসাইনি তাঁর হৃদয়কাড়া মনোজ্ঞ ব্যালে 'বাগদাদ' এর কল্যাণে মিডল ইস্ট স্টার একাডেমি পুরস্কার পান। এটি ছিল আমেরিকান আইডল পুরস্কারের সমতুল্য। জাতীয় পতাকায় মুড়িয়ে তিনি এটি উপস্থাপন করেন। সে বছরই ইরাক সৌদিকে হারিয়ে এশিয়ান ফুটবল কাপ জয় করে।

ফলে একিউআইর শক্তির প্রধান উৎস সুন্নি যুবকদের মাঝে তাদের জনপ্রিয়তা ক্ষীয়মান হতে শুরু করে। 'ইরাক আফটার আমেরিকা'র লেখক জ্যল রেবর্ন একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যা তিনি আনবার প্রদেশের হাব্বানিয়াহ শহরের এক পুলিশের মুখে শুনেছিলেন। '২০০৭ এর ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় আমি ঘরের বাইরে পা ফেলে হতভম্ব হয়ে যাই। কিছু যুবক আগুন জ্বালিয়ে তাদের গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ক্রিসমাস উদ্‌যাপন করছে। সঙ্গে অ্যালকোহলও নিচ্ছে। একিউআই আমলে যা ছিল অকল্পনীয়। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম—খ্রিষ্টানদের মতো ক্রিসমাস পালন করছ, অথচ গেল বছর এই টাইমেও তো তোমরা আল কায়েদা ছিলে! যুবকটি হেসেই খুন। বলে কী! আল কায়েদা? সে তো গত বছরের কাহিনি।' তাকফিরিরা অতীত উপাখ্যানে পরিণত হয়ে গেছে—এই ভ্রান্তিবিলাস ইরাকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডকে একটি চরম শিক্ষা দেয়। যখন পাঁচ বছর পর এই 'অতীত উপাখ্যান' দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসে।

দেশের বাইরে একিউআইর সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রভাব তাদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও পড়ে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করে। মোল্লা নাদিম আল জিবৌরি ছিলেন বাগদাদের ঠিক উত্তরে অবস্থিত ধুলুইয়া শহরের অধিবাসী। জারকাবির মৃত্যুর পর তিনি মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি অ্যাওয়াকেনিং প্রোগ্রামে যোগ দেন। এর কিছুদিন পরই জর্ডানে চলে যান। সেখানে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা একত্র হতেন। প্রায়ই জর্ডানি টিভি চ্যানেলে তাঁকে দেখা যেত। সাধারণত একিউআইর নির্মমতার নিন্দা করতেন।

২০১১ সালের বসন্তে নুরি আল মালিকির সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন। ইরাকি এক টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেন। এর পরদিনই পশ্চিম বাগদাদে ড্রাইভিং করার সময় তাঁকে গুলি করে হত্যা

করা হয়। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্কাইপ যোগাযোগ করেছিলেন। সেই আলাপচারিতায় যোগ দেওয়া এক মার্কিন সেনা কমান্ডারের বরাতে বলা হয়, আল জাবৌরি তাদেরকে নিশ্চিত করেছিলেন যে আইএসআই মূলত গঠন করা হয়েছিল একিউআইর পরিকল্পনায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি যোদ্ধাদের জাতীয়তাবাদী মোড়কে উপস্থাপন করা। কিন্তু অন্যান্য সুন্নি বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাদের এই চাল বুঝে ফেলে। আইএসআই জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মাঝে তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এই জাতীয়তাবাদীরা যুদ্ধ না করে বেঘোরে মরছিল। আর মরার আগে দেখে যাচ্ছিল গ্রিন জোনে জারকাবির আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক বিদ্রোহীই একিউআইতে যোগ দিয়েছিল দৈবচক্রে। জাবৌরির ভাষায়, 'একিউআই আল কায়েদার মতো ইরাক বিদ্রোহের রাজনৈতিক ধারা হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে।'

সব স্বৈরতন্ত্রই শুরু হয় মিথ দিয়ে। এগুলো দেশের সীমারেখা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একিউআই'ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। যুদ্ধের প্রথম দিকে তারা নিজেদের প্রভাবশালী দুটি ইমেজ দাঁড় করায়। এক. তারা হচ্ছে বিদ্রোহীদের অগ্রদূত, যারা বিদেশি দখলদারদের ঝেঁটিয়ে-পিটিয়ে দেশছাড়া করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। দুই. হারানো সুন্নি ঐতিহ্যের রক্ষক। কিন্তু তাদের লাগাতার কট্টরপন্থার ফলে উভয় ভাবমূর্তি উবে যায়।

প্যাট্রিয়াস তাঁর দক্ষ পরিচালনায় প্রতি-বিপ্লবরোধী এমন ওষুধ তৈরি করেছেন, যা ইরাকের অভ্যন্তরে নিজস্ব অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যা দ্বারা বিদেশি ক্ষতিকর ভাইরাস বিনষ্ট হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তখন ইরাকে ১ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন সেনা ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টেছে। গোত্রনেতারা বাগদাদকে বিশ্বাস করেন না। সেই সঙ্গে আইসিসের বিরুদ্ধে তাঁরা শিয়া মিলিশিয়াদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি নন।

সাবেক ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার রাফি আল ইশাওয়ির সিনিয়র রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর জাবের আল জাব্বারি বলেছেন, 'জনগণ এখন আর অ্যাওয়াকেনিংয়ের মতো চটকদার শব্দে ভোলে না। কারণ, ব্যবহার শেষ হতে না হতেই সরকার গোত্রগুলোকে ছুড়ে ফেলে। সন্স অব ইরাকের বিরুদ্ধে ডিগবাজি মারে। সরকার তাদের অধিকার আদায় করেনি। তাদের বেতন পরিশোধ করেনি। এমনকি তাদের অনেককে নিয়ে জেলে পোরে। আমার মনে হয় না গোত্রগুলো আরেকটা অ্যাওয়াকেনিংয়ে রাজি হবে। সরকার সর্বোচ্চ যেটা করতে পারে তা হচ্ছে ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের অঙ্গসংস্থা হিসেবে প্রাদেশিক ন্যাশনাল গার্ড গঠন করা। তারা আর্মি কিংবা পুলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে না বরং মিলিশিয়া হিসেবে কাজ করবে।'

একিউআইর উত্তরসূরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর আইসিস প্রতিটা পদক্ষেপ নিচ্ছিল মেপে মেপে, যেন আগের ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। তাদের প্রোপাগান্ডায় ব্যাপক মাত্রায় সাহওয়া বা অ্যাওয়াকেনিং শব্দটির অপব্যবহার করা হয়। যেসব গোত্র তাদের বিরোধিতা করেছিল, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। যারা আগে এই প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছিল, তাদেরকে একবার 'তওবা' করার সুযোগ দিয়ে পুনরায় আইসিসে যোগদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। ২০১৪ সালের অক্টোবরে সাহওয়ায় নিহত আল রিশাওয়ির ভাই শেখ আহমেদ আবু রিশা গার্ডিয়ানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমাদের সঙ্গে কেউ নতুন সাহওয়ার ব্যাপারে কথা বলেনি, ন্যাশনাল গার্ড তৈরির ব্যাপারেও কিছু বলেনি।' সে মাসেই রামাদিতে একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এতে দেড় শ মৃতদেহ ছিল। সবগুলো ছিল আলবু নিমরের সৈন্যদের।

ষষ্ঠ অধ্যায়
এবার শুধু যাওয়ার পালা

সাহওয়া আন্দোলন ও কাউন্টার ইনসার্জেন্সি প্রোগ্রামের সফলতার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর জিহাদি মারা যেতে লাগল। পাশাপাশি তাদের যোদ্ধারা ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার হয়ে আমেরিকা কর্তৃক পরিচালিত বন্দিশিবিরগুলোতে ভিড় করতে লাগল। আইসিসের বর্তমান প্রধান আবু বকর আল বাগদাদি ও তাঁর প্রধান প্রধান লেফটেন্যান্টদের প্রায় সবাই একসময় মার্কিনিদের হাতে বন্দী ছিলেন। তাঁরা এখন উল্লেখযোগ্য কোনো নিরাপত্তা হুমকি নন ভেবে ছেড়ে দেওয়া হয়। অথবা প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকি নিরাপত্তা হুমকির চেয়েও বেশি তাড়িত ছিলেন অন্য কোনো শক্তি দ্বারা।

অনেক মার্কিন কর্মকর্তা আমাদেরকে বলেছেন, বন্দীদের চিহ্নিত করা ও শ্রেণিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার অভাব ছিল প্রকট। জেলে আমরা বাগদাদিকে আমির বানিয়েছিলাম। কচুর আমির! ভেবেছিলাম এভাবে তাদেরকে সহজে বুঝতে পারব।

বিদ্রোহের আঁতুড়ঘর

'একিউআই আর আইসিস যে শুধু মার্কিন বন্দিশিবিরগুলোকে নিজেদের ইউনিভার্সিটি হিসেবে ব্যবহার করেছে, তা-ই নয়, বরং প্রায়ই তারা স্বেচ্ছায় সেসব জেলে যাওয়ার চেষ্টা করত নতুন সদস্য সংগ্রহ করার জন্য,' বলছিলেন মেজর জেনারেল ডাগ স্টোন। ২০০৭ সালে স্টোন ইরাকে মার্কিন বন্দিশিবির ও জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রগুলোর দায়িত্ব পান। তাঁর কাজ ছিল পুনর্বাসন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা। আবু গারাইবের পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে আমেরিকাকে শুধু কলঙ্কিতই করেনি, ইরাকে তার যুদ্ধক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এবং যুদ্ধক্ষেত্রের এই বন্দিশিবিরগুলো জিহাদিদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের উৎকৃষ্ট স্থান বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

দক্ষিণের বসরা প্রদেশে অবস্থিত ক্যাম্প বুকা, অন্যতম কুখ্যাত একটি কারাগার। মার্কিন সেনাবাহিনীর অনুমান অনুযায়ী, এখানকার ১৫ হাজার বন্দীর মাঝে কমপক্ষে ১ হাজার ৩৫০ জন ছিল ভয়ংকর তাকফিরি বিদ্রোহী। তবুও

এখানে কে কার সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছে তা নজরদারি করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সাহওয়া ও ক্রমবর্ধমান মিলিটারি অপারেশনের ফলে হঠাৎ করেই বন্দীর সংখ্যা এক লাফে ২৬ হাজারে পৌঁছায়। এটি স্টোন যখন ২০০৭ সালে দায়িত্ব নেন, তখনকার হিসাব।

'হুমকি-ধমকি প্রতিদিনই ঘটত, হত্যাকাণ্ড ঘটত মাসে-দুমাসে একবার। আমি যখন পৌঁছি তখন এটি ছিল সাক্ষাৎ নরক। নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় ছিল না। তারা সিগারেট আর দেশলাই দিয়ে তাঁবু, ম্যাট্রেস জ্বালিয়ে দিত। পুনর্নির্মাণ করে দিলে কদিন বাদেই আবার পুড়িয়ে দিত। ভাবতাম কচুর গোটা বন্দিশিবিরটা জ্বালিয়ে দিলেই হয়, ল্যাটা চুকে যায়,' স্টোনের ভাষ্য।

স্টোন একটি ডি-র‍্যাডিক্যালাইজেশন (উগ্রপন্থা নিরোধ) প্রোগ্রাম শুরু করেন। তুলনামূলক মধ্যপন্থী ইমামদের দিয়ে লেকচারের ব্যবস্থা করেন। যাঁরা কোরআনুল কারিম ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলতেন। কট্টরপন্থীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে তারা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তা ভুল। পাশাপাশি তিনি বন্দীদের তাঁবু থেকে ভবনে স্থানান্তর করতে শুরু করেন। 'মডিউলার ডিটেইনি হাউজিং ইউনিটে' স্থানান্তর করা হয়। 'ইতিপূর্বে আমরা একই ব্লকে হাজার হাজার বন্দীকে রাখতাম। যেসব বন্দীকে অন্য বন্দীরা নির্যাতন-নিপীড়ন করত, তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য মডিউলার ডিটেইনি ব্যবহার করি। সবলদের থেকে দুর্বলদের আলাদা করে দিই।' এখানে তাঁর ১৮ মাসের কর্মজীবনে আট শতাধিক বন্দীকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন অথবা জিজ্ঞাসাবাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী একিউআই সদস্যদের মাঝে বহুমুখী প্রবণতা ছিল।

সেন্ট্রাল কমান্ডে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত এক পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে তিনি তাঁর প্রাপ্ত ফলাফলের সারাংশ পেশ করেন। তাতে দেখা যায়, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মোল্লা নাজিম জিবৌরি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা-ই ফলে যাচ্ছে। বিদেশি যোদ্ধাদের খুব একটা পাত্তা দেওয়া হচ্ছিল না, কারণ ইরাকিরা নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে চাচ্ছিল। বাথিস্টরা আইএসআইর ব্যানার ব্যবহার করে কিছু কিছু অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব ফিরে পেতে চাইছে। স্থানীয় মুজাহিদিনরা আঞ্চলিক কিংবা বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারের চেয়ে নিজের শহর নিয়ে চিন্তিত ছিল বেশি। একিউআই নারী ও শিশুদের আত্মঘাতী হামলায় ব্যবহারের ফলে অনেকেই বিরক্ত ছিল। এতে যোগদানের প্রধান কারণ ছিল অর্থ, আদর্শ নয়।

সর্বোপরি একিউআইর আমির আবু আইয়ুব আল মাসরি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। অধিকাংশ যুবক আইএসআই নেতা আবু উমর আল বাগদাদি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ইরাকে স্টোন কর্মজীবনের শুরুতে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ

করেন। অনেক ছেলেই ক্যাম্প বুকায় এসেছিল একিউআইতে যোগদানের উদ্দেশ্যে। ক্যাম্পের রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া, কোন ব্লকে কারা বন্দী, সেসব জেনেই তারা এখানে এসেছে। 'কখনো তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা পড়ত। তারপর যেসব কম্পাউন্ডে অনেক আল কায়েদা বন্দী থাকত, তাদেরকে সেখানে রাখার আবেদন করত। ক্যাম্প বুকায় তাকফিরিরা ছিল খুব সুসংহত। সদস্যদের জন্য থাকার জায়গা, শুক্রবার রাতে ইবাদতের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি একটা ব্লকের ডাকনাম ছিল 'ক্যাম্প খিলাফাহ'! আমি যখন এটা শুনতে পেলাম, বুঝতে পেরেছি যে তারা হয়তো খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে—পারবে।'

ইরাকে বন্দিশিবিরগুলোর নিয়ম ছিল—যখন কেউ মার্কিন বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হতো, তার নামধাম ও বায়োমেট্রিক ডাটা সংরক্ষণ করা হতো। আইরিশ স্ক্যান, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ডিনএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হতো। তবে প্রায়ই দেখা যেত, তারা যে নাম বলেছে সেটি ভুয়া। অনেকে আবার প্রতিবার গ্রেপ্তারে আলাদা আলাদা নাম ব্যবহার করত। তখন বায়োমেট্রিক তথ্য খুঁজে তার অপরাধের ফিরিস্তি বের করতে হতো। কর্মজীবনের শুরুর দিকে স্টোন একবার দেখতে পান একজন বন্দীর উপাধি বাগদাদি। এতে অবশ্য ভ্রু কুঁচকানোর কিছু ছিল না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় সব বিদ্রোহীই নিজের এলাকা কিংবা দেশের নাম ব্যবহার করত। তবে এই বাগদাদি ছিল কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের। 'আমার লোকেরা তার নাম তালিকাভুক্ত করেছিল। তার পরিচিতিতে উল্লেখ ছিল সে আল কায়েদার খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সাইকোলজিস্ট তাকে চিহ্নিত করেছে বিপজ্জনক লোক হিসেবে। সে স্যোশিওপ্যাথ ছিল না, কিন্তু একজন ভয়ংকর লোক ছিল, যার ভয়ংকর পরিকল্পনা রয়েছে।'

সে নিজেকে একজন খতিব দাবি করত। ক্যাম্পে কিছু বন্দী ছিল, যারা নিজেদের মুহাম্মদ সা.-এর বংশধর হিসেবে পরিচয় দিত। বাগদাদি যদিও এই দাবি করতেন না, কিন্তু ধর্মকর্মে তাঁর ঝোঁক ছিল অত্যধিক।

তিনি শরিয়া কোর্ট পরিচালনা করতেন এবং ইমাম হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজ পড়াতেন। কিছুটা গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, পাশাপাশি জেলের ভেতর ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। 'তার মতো আরও শত শত বন্দী ছিল যাদেরকে আমরা লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে তালিকাভুক্ত করেছিলাম। কিন্তু সে ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মডারেট ইমামদের দীক্ষা-কার্যক্রম তার ওপর থোড়াই প্রভাব ফেলতে পেরেছে। চুপচাপ, অনাড়ম্বর লোকটি খুব শক্তিশালী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাখত। সে করল কী! সহসা সে "জেনারেলদের" সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করল। এর মানে হচ্ছে আমাদের নানা কিসিমের বন্দী ছিল। কিছু ছিল ছিঁচকে অপরাধী, আর কিছু ছিল

ইরাকি আর্মির সাবেক কর্মকর্তা, তারা নিজেদের জেনারেল হিসেবে পরিচয় দিত। যদিও সাদ্দামের সেনাবাহিনীতে তারা ছিল নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা,' স্টোনের ভাষ্য।

ইরাকি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাদ্দাম হোসেনসহ বাথ পার্টির সিনিয়র নেতাদের বাগদাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে মার্কিন সেনাবাহিনীর আরেকটি বন্দিশিবির 'ক্যাম্প ক্রোপারে' রাখা হতো। ক্রোপার ছিল ক্যাম্প বুকার বন্দীদের জন্য একটি প্রসেসিং সেন্টার। কিছু জেনারেল বাগদাদির ধর্মীয় মতাদর্শে উজ্জীবিত হন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা তাকফিরি গ্রুপে যোগ দেন। স্টোন বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস এই বাগদাদি ছিলেন একটি ফাঁদ। আইএসআই তাঁকে আবু উমর আল বাগদাদির ছদ্মবেশে ক্যাম্প বুকায় পাঠিয়েছে যোদ্ধা সংগ্রহের জন্য। 'আপনি যদি কোনো সামরিক সংগঠন গড়ে তুলতে চান, তবে বন্দিশিবিরগুলো হচ্ছে পার্ফেক্ট জায়গা। এখানে আমরা তাদের স্বাস্থ্যসেবা দিই, ডেন্টাল সাপোর্ট দিই, অন্ন-বস্ত্র দিয়ে লালন-পালন করি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা তাদেরকে যুদ্ধে মারা যাওয়া থেকে রক্ষা করি। বসরায় মার্কিন পরিচালিত ক্যাম্প বুকা থাকতে আর কি সেফ হাউসের দরকার?'

গার্ডিয়ানকে দেওয়া একজন সাবেক আইসিস সদস্যের সাক্ষাৎকারেও স্টোনের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়। আবু আহমেদ তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এই ক্যাম্পে যেভাবে সবাই একত্র হতে পারতাম, বাগদাদ কিংবা অন্যত্র সেই সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। বলতে গেলে অসম্ভব এবং খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এখানে আমরা ছিলাম নিরাপদ, আল কায়েদার নেতাদের থেকে মাত্র কয়েক শ মিটার দূরে।'

জিহাদি বন্দীরা কীভাবে আন্ডারওয়্যারের বেল্টে একে অপরের নাম্বার, ঠিকানা লিখে রাখত, সে বর্ণনাও দেন। ফলে মুক্তির সময় দেখা গেল, তারা জেলের ভেতরেই এক সুবিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। 'মুক্তির পর আমরা পরস্পরকে কল দিতে শুরু করলাম। যারা যারা আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের ফোন নাম্বার আর গ্রামের নাম আমার সাদা আন্ডারওয়্যারেই মজুদ ছিল। ২০০৯ সালের দিকে আমরা সেটাই করছিলাম, যা ধরা পড়ার আগে করতাম। তবে এবার আমরা আরেকটু ভালোভাবে করছিলাম, এই-ই যা।'

ছদ্মবেশী বাগদাদি নিম্ন কিংবা মাঝারি পদমর্যাদার অফিসারদের কেন রিক্রুট করছিলেন তার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন পেন্টাগনের সাবেক কর্মকর্তা রিচার্ড। 'আমরা ইরাকি সেনাবাহিনীকে জোকস হিসেবে নিয়েছিলাম, কিন্তু তারা ছিল একটা পেশাদার সেনাবাহিনী, একটা বৃহৎ সেনাবাহিনী। ক্যাপ্টেন, মেজর, ওয়ারেন্ট অফিসারদের মতো জুনিয়র অফিসারদের আমরা গোনায় ধরিনি। কিন্তু আরব আর্মিতে তারাই ছিল মূল পেশাদার। একে তারা পেশা হিসেবে নিয়েছে। কারণ সাদ্দামের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গোত্রীয় কানেকশন ছিল,

অর্থবিত্ত ছিল। তারা নিজেদের অর্থে চলার সামর্থ্য ছিল। চিন্তা ছিল মাঝারি মানের কর্মকর্তাদের নিয়ে। এরাই যুদ্ধে জড়িয়েছে বেশি। এ ছাড়া তাদের অর্থোপার্জনের ভিন্ন কোনো উপায় নেই। পরিবার ক্ষুধায় মরছিল, টাকার তীব্র প্রয়োজন ছিল এদের।

'আমি যদি সফলভাবে কোনো কনভয় অ্যাম্বুশ করতে পারি, কয়েকটা আইইডি অ্যাটাক করতে পারি, এরা আমাকে পয়সা দেবে, প্রচুর পয়সা। ছোটখাটো সাবেক সেনা কর্মকর্তারা এই কাজে প্রভূত সফলতা অর্জন করে এবং ধীরে ধীরে আল কায়েদাসহ অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।' ২০০৮ সালের দিকে ক্যাম্প বুকার প্রায় ৭০ ভাগ বন্দী এক বছর কিংবা তার বেশি সময়ের জন্য বন্দী ছিল।

ক্রেইগ হোয়াইটসাইড, নিউপোর্ট, রোড আইল্যান্ডের নেভাল ওয়ার কলেজের প্রফেসর ওয়ার অন দ্য রকস ওয়েবসাইটের জন্য লিখিত এক আর্টিকেলে বলেন, 'এর মানে হচ্ছে কোয়ালিশন বাহিনী কিংবা ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সহিংসতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আপনার বেশির ভাগ বন্দী মাত্র দুয়েক বছর কারারুদ্ধ ছিল। এমনও নজির আছে যে একই ব্যক্তি কয়েক দফা ক্যাম্প বুকায় বন্দী হয়েছে আবার ছাড়াও পেয়েছে, অথচ তারা ছিল রাস্তার পাশে মাইন স্থাপনে পারদর্শী।'

নুরি আল মালিকি বনাম ওয়াশিংটন

স্ট্যাটাস ফোর্সেস এগ্রিমেন্টের ফলে ২০০৯ সালে ক্যাম্প বুকা বন্ধ হয়ে যায়। বাগদাদ ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার এই চুক্তির ফলে মার্কিনিদের হাতে থাকা সব বন্দীকে হয়তো মুক্তি দিতে হবে কিংবা ইরাকি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। ২০০৯ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ইরাকের সব শহর থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নিতে হবে। নিরাপত্তার দায়িত্ব ইরাকি কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে হবে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নুরি আল মালিকি ও বুশ বাগদাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানটি অবশ্য কূটনৈতিক সফলতার চেয়ে বুশকে লক্ষ্য করে সাংবাদিক আল জায়েদির জুতা নিক্ষেপের কারণে বেশি বিখ্যাত।

মূলত ২০০৮ সালের শেষ দিক থেকে মার্কিন বাহিনী ইরাকের উপশহরগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। কাজ ছিল সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ করা। তারা সুন্নি ও বহুজাতিক বসতিগুলোকে শিয়া ডেথ স্কোয়াড থেকে রক্ষা করত। এসব স্কোয়াড পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়মুক্তি উপভোগ করত। পাশাপাশি শিয়া এলাকাগুলোকেও সুন্নি বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দিত। নুরি আল মালিকি এই চুক্তিকে মার্কিন বাহিনীর বিপক্ষে তাঁর বড় বিজয় হিসেবে চিত্রিত

করার চেষ্টা করতেন। যদিও আদতে সেটি ছিল দ্বিপক্ষীয় একটি সমঝোতা। ৩০ জুন ২০০৯, চুক্তি কার্যকর হওয়ার এই দিনটিকে 'বিদেশি দখলদার বিতাড়ন' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁর নবগঠিত সরকার যেভাবে এটি উদ্‌যাপন করেছে, তা ছিল ইরাকের মৃত্যুসম।

জুয়েল রেবর্ন, স্ট্যাটাস ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট এবং ইরাকের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিষয়ে একজন গবেষক বলেন, 'অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়, এমনকি সুন্নি বিদ্রোহীদেরও। ২০০৮-২০০৯ সালের দিকে মালিকি ভাবতেন আমরা নিরীহ লোকদের গণহারে বন্দী করে রেখেছি। সমস্যাটা ছিল আমরা (মার্কিনিরা) অনেককেই বন্দী করেছি ইন্টেলিজেন্সের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। ইন্টেলিজেন্স সিগন্যাল ও হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে। কিন্তু আমরা আমাদের কর্মকৌশল ইরাকি কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যাখ্যা করিনি। ফলে তারা বুঝতে পারছে না যে এসব বন্দী আসলেই ভয়ংকর। এ ছাড়া তাদেরকে ইন্টেলিজেন্স-প্রদত্ত তথ্য দিলে তারা বলে—কার কথার ভিত্তিতে এটা বলছ? চাক্ষুষ সাক্ষী না আনতে পারলে বিষয়টা এখনেই ইতি। কারণ ইরাকের গোটা আইনব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে চাক্ষুষ সাক্ষীর ওপর। যেকোনো ঘটনার দুজন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে সেটা অপরিবর্তনীয়।'

যুদ্ধকালীন মার্কিন বাহিনীর বিচারিক ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে যুদ্ধ শেষে অনেক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর মাঝে একিউআইর কিছু সংশোধন-অযোগ্য সদস্যও ছিল। ২০০৯ সালের মার্চে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রয়াত সাংবাদিক অ্যান্থনি শাদিদ এক রিপোর্টে বলেন, 'এই মাসে ১০৬ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বাগদাদের উম্মুল কুরা মসজিদে উপস্থিত করা হয়। এর মধ্যে জারকাবির সাবেক ড্রাইভার মুহাম্মদ আলি মুরাদও ছিল। সে ইরাকি পুলিশ স্টেশনে দুটি ভয়াবহ ভিবিআইইডি হামলায় অভিযুক্ত ছিল। পাশাপাশি ক্যাম্প বুকার বন্দীদের নিয়ে একটি নতুন জিহাদি সেল গঠনের দায়েও অভিযুক্ত। তা সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। শাদিদ ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলে, মুক্ত বন্দীদের ৬০ শতাংশ পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। শিয়া কিংবা সুন্নি, সবাই বিদ্রোহে যোগ দেবে কিংবা কোনো স্পেশাল ফোর্সে অংশগ্রহণ করবে। আল কায়েদা শুধু মার্কিনিদের ইরাক ত্যাগের অপেক্ষায় ছিল। পুনরায় বিপ্লবের ঝান্ডা ওড়াতে উন্মুখ হয়ে ছিল তারা।'

বাগদাদ কর্তৃপক্ষ যাদের মুক্তিপত্রে সিল মারেনি, জিহাদিরা তাদের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। কখনো বখরা দিয়ে, কখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। রেবর্নের ভাষায়, 'আল কায়েদা সদস্যদের গ্রেপ্তার করা ছিল ডালভাত। আমরা ডজনে ডজনে তাদেরকে গ্রেপ্তার

করতাম। কিন্তু আল কায়েদা নিজের লোকদের ছাড়িয়ে নিতে গোটা একটা সিস্টেমই দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। তাদের মামলা হয়তো কোর্টে চালানের ব্যবস্থা করত অথবা ঘুষের বিনিময়ে দ্রুত মুক্তি পেয়ে যেত। কোনোটাতে কাজ না হলে শেষ পথ তো ছিলই—জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়া। ২০০৮-২০০৯ সালের দিকে এই কাজের জন্য তাদের আলাদা একজন "বন্দিশিবির-আমির" ছিল। তার দায়িত্ব ছিল জিহাদিদের জেল থেকে মুক্ত করা। যেমন ছিল সীমান্ত-আমির, যে সিরিয়া থেকে ইরাকে বিদেশি যোদ্ধাদের চালান করত।

"আরে! ইরাকের আদালতে আহমাদের বিচারকাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এই হলো তার মামলার সাক্ষীদের তালিকা। যাও, মামলা পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা করো। কাজ না হলে শুইয়ে দাও।" মসুলে এটা ছিল নিত্যদিনের চিত্র। বিচারব্যবস্থা ও বন্দিশিবিরের পূর্ণ দায়িত্ব আমরা কখনোই পাইনি।'

সাহওয়ার ছন্দপতন[১৩]

নুরি আল মালিকি 'নিরাপত্তা হুমকি'র নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেন। সেই সংজ্ঞা ছিল তাঁর নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রভাবিত। যারা শুধু আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত, তারা মূলত অপরাধী নয়। তাদেরকে আর কারারুদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন নেই। সশস্ত্র যোদ্ধাদের মতো এত উদারতা সাহওয়াতদের (সাহওয়ার সদস্য) কপালে জোটেনি। অ্যাওয়াকেনিং বা সাহওয়ার

---

[১৩] ২০০৫ সালে আনবারের আলবু মাহাল গোত্র তাদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়, আস সালমানি গোত্র কর্তৃক। আলবু মাহাল গোত্র ইরাক-সিরিয়া সীমান্তে বিদেশি যোদ্ধাদের আনা-নেওয়া করত। আস সালমানি গোত্র ছিল আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত। ফলে আলবু মাহাল গোত্র সেখানকার মার্কিন সেনাবাহিনীর সাথে আঁতাত করে। মার্কিনিরা তাদেরকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ২০০৬ সালে আনবার প্রদেশ একিউআইর দখলে যায়। প্রথম দিকে সুন্নি গোত্রনেতারা তাদেরকে স্বাগত জানায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেওয়ায় নেতারা শিয়া সরকারের সাথে জোটবদ্ধ হয়। মার্কিন সেনাবাহিনী এসব স্বেচ্ছাসেবীর বেতন বহন করত। ২০০৮ সালের অক্টোবরে ইরাক সরকার ৫৪ হাজার সাহওয়াতের বেতন-ভাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাহওয়াতদের নিয়ে মার্কিন পরিকল্পনা ছিল ধীরে ধীরে তাদেরকে মূল সেনাবাহীনির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। নুরি আল মালিকির সরকার এই পরিকল্পনায় সায় দেয়নি। তারা চায়নি শিয়া সেনাবাহিনীতে সুন্নিরা তৃতীয় আরেকটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হোক। তাই তারা সাহওয়াতদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়। নির্মম সুন্নিনিধন শুরু করে। ৫৪ হাজার সদস্যের মধ্য থেকে মাত্র ১০ হাজার জনকে সেনাবাহিনীতে নিতে সম্মত হয় কিন্তু সেটা কখনোই আর হয়ে ওঠেনি। ২০১০ সালে নুরি আল মালিকি পুনর্নির্বাচিত হলে একিউআই-সাহওয়াত নির্মূল অভিযান শুরু করে। ২০০৯-২০১৩ সালের ভেতর প্রায় দেড় হাজার অ্যাওয়াকেনিং সদস্যকে হত্যা করে। তাদের এই মিশনের নাম ছিল দ্য ক্ল্যাঙ্কিং অব দ্য সোর্ডস। মালিকির সুন্নিনিধনের ফলে আবার আইএসআই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ২০১৪ সালে পুরোদমে আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। (অনুবাদক)

সদস্যরা, যারা ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্স কিংবা শিয়া মিলিশিয়া গ্রুপের সঙ্গে মিলে লড়াই করেছে, তারা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এত সুযোগ পায়নি। সন্স অব ইরাকের অপরাধকর্মের মামলা দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলমান ছিল, যদিও একসময় তারা ছিল রাষ্ট্রসমর্থিত সশস্ত্র গ্রুপ।

তারা মালিকি সরকারের কোনো কাজে আসছিল না। ক্রমক্ষীয়মাণ মার্কিন নিরাপত্তাও উবে যাচ্ছিল। ফলে যে সরকারের সেবাদাস হিসেবে এত দিন কাজ করে এসেছে, সেই সরকারই তাদেরকে নিপীড়ন-উৎপীড়ন করতে শুরু করে। অনেককে সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

'সুন্নিরা সব সময় অবৈধ ও আইন-বহির্ভূতভাবে গ্রেপ্তার হওয়া লোকদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বলেছে। সন্ত্রাসবাদের এসব মামলা তুলে নেওয়া এখন তাদের প্রধান দাবি'—ইরাকের একজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা আমাদেরকে বলেছেন। দিয়ালা প্রদেশে এই দাবি খুব জোরদার ছিল। চড়া মূল্যের বিনিময়ে এখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। ২০০৮ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী মালিকি ইরাকি স্পেশাল অপারেশন ফোর্সেসকে দিয়ালার প্রাদেশিক সরকারের অফিস থেকে একজন স্থানীয় কাউন্সিলর ও ইউনিভার্সিটি অব দিয়ালার প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন সুন্নি। ইরাকি স্পেশাল অপারেশন ফোর্সেস ছিল ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর মাঝে অন্যতম সফল কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। এই গ্রেপ্তার অভিযানে প্রাদেশিক গভর্নরের প্রেস সেক্রেটারি নিহত হন।

২০০৯ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন সেকেন্ড ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের তৃতীয় স্ট্রাইকার ব্রিগেড দিয়ালায় আসে। এক বছর ধরে তারা সুন্নি রাজনৈতিক শক্তি দমন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে। একদিকে ছিল একিউআই, যেসব সাধারণ মানুষ তাদের শাসন মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে এখন ধরে ধরে হত্যা করছে। অপরদিকে যারা সাহওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল, সরকার তাদেরকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় গ্রেপ্তার করছিল। যেহেতু এই প্রদেশে সাহওয়ার সঙ্গে জড়িত সিংহভাগই ছিল সুন্নি।

শিয়া বন্দীদের সঙ্গে এমনটা হয়নি। তাদেরকে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়। সমাজে পুনর্বাসিত করা হয়। তা ছাড়া দিয়ালা গভর্নরের ভাষ্যমতে, তাঁর প্রেস সেক্রেটারিকে হত্যার পর মালিকি সরকারের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ফলে ২০১২ সালে তারা ইরাক ত্যাগ করে। এর চেয়েও ভয়ানক হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাওয়াকেনিং সদস্যদের বেতন পরিশোধ করত না। দুয়েক মাসের বেতন বাকি পড়ার পর তারা হয়তো সাহওয়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে কিংবা তাদের পূর্ব-প্রতিপক্ষ বিদ্রোহী গ্রুপে যোগ দিয়েছে।

আনবারের পরিস্থিতিও এর চেয়ে ভালো ছিল না। শাদিদ উত্তর-পূর্ব ফালুজার আল কারমাহ শহরের পুলিশপ্রধান কর্নেল সাদ আব্বাস মাহমুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তিনি ২৫ বার হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে গিয়ে বেঁচে গেছেন। 'তাকে কোরআনুল কারিমের একটি কপি দেওয়া হয়েছিল, যার নীল কভারের ভেতর বিস্ফোরক বসানো ছিল। দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই তার দুলাইমিয়ার ডিশে বিষ প্রয়োগ করা হয়। দুলাইমিয়া হচ্ছে মুরগি, দুম্বা, চর্বির টুকরা ও চালের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্য। ১০ দিন হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফেরার পরপরই ফালুজায় তার বাড়ির পাশে দুটি বোমা পোঁতা হয়।' মাহমুদ ছিলেন আল কারমা শহরে সন্স অব ইরাকের তিন হাজার সদস্যের ইনচার্জ। এদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১৩০ ডলার। এটিও তিন মাস যাবৎ পাওয়ার নামগন্ধ নেই।

সাহওয়ার মূল পরিকল্পনায় এসব স্বেচ্ছাসেবীকে সরকারি বিভিন্ন সেক্টরে একীভূত করার কথা ছিল। যেমন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া। ইরাকের যে প্রতিষ্ঠানটি একীভূতকরণের দায়িত্বে ছিল, সেটি হচ্ছে 'ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ফলোআপ কমিটি ফর ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন'। এটা সত্য যে ২০১০ নাগাদ তারা প্রায় ৩০ হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে রাষ্ট্রের চাকরির জন্য সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ক্যান্ডিডেট হিসেবে ঘোষণা করে। তবু তারা চাকরিক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, যার কিছু ছিল খুবই নিম্নস্তরের পদ। মার্কিনিদের এই প্ল্যান এগিয়ে নিতে ও বাস্তবায়ন করতে নুরি আল মালিকির কোনো আগ্রহ ছিল না।

হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার আগে মোল্লা নাদিম জিবৌরি বলেছিলেন, ২০১০ সালের মাঝামাঝিতে একিউআইর পুরো ৪০ শতাংশ সদস্য ছিল সন্স অব ইরাকের দলত্যাগী কিংবা পলাতক সদস্য। সংখ্যাটা অতিরঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু তাঁর বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার ও গোত্রনেতাদের মাঝে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক উন্মোচিত করেছে।

প্রথমত, ইরাকের জাতীয় নির্বাচনে মালিকি যতটা সহজে জয় পাবেন বলে ভেবেছিলেন, আদতে ততটা হয়নি। মূলত তিনি জয় পানইনি। নির্বাচনের আগেই মালিকির স্বৈরতন্ত্রের ফলে মার্কিনিদের মূল্যায়ন ছিল—ক্ষমতাসীনরা পরাজিত হলে ভয়াবহ সংঘর্ষ বাধবে কিংবা তারা ক্ষমতায় থাকার জন্য গণতন্ত্র বাতিল করবে। অধিকাংশ সুন্নির বিশ্বাস—বাস্তবে এটিই ঘটেছে। নির্বাচনের আগে ইরাকের অ্যাকাউন্টিবিলিটি অ্যান্ড জাস্টিস কমিশন পাঁচ শতাধিক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেছে বাথ পার্টির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকার অজুহাতে। এদের বেশির ভাগই ছিল সুন্নি এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী আয়াদ আলাওয়ির নেতৃত্বাধীন ইরাকিয়া জোটের। আলাওয়ি শিয়া হওয়া সত্ত্বেও মূলধারার সুন্নিদের প্রথম পছন্দ ছিলেন

তিনি। অদিয়ার্নো এই প্রার্থিতা বাতিলের পেছনে ইরানের কুদস ফোর্সের হাত আছে বলে মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। নির্বাচন-পূর্ব এত সব ছলাকলার পরও ২০১০ সালের ৭ মার্চে ভোটের হার ছিল ৬০ শতাংশ। দেশজুড়ে সহিংসতার খবরও এসেছে।

আল মালিকির জন্য নির্বাচন মোটেই সুখকর কিছু ছিল না। আলাওয়ির ইরাকিয়া ব্লক মালিকির স্টেট অব ল' কোয়ালিশনের চেয়ে দুই আসন বেশি পায়। ৯১-৮৯ ব্যবধানে জয়ী হয়। দক্ষিণাঞ্চলের শিয়া অধ্যুষিত এলাকায়ও ইরাকিয়া ভালো ফলাফল করেছে, প্রায় দুই লাখ ভোট পেয়েছে। এই নির্বাচনে সংসদের আসনসংখ্যা ২৭৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৩২৫ করা হয়। নুরি আল মালিকি সরকার গঠনের জন্য অন্য কোনো ব্লকের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হন। পরাজয়ের ফলে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সত্ত্বেও মালিকি অভিযোগ করেন জাতিসংঘের প্রতিনিধি দল ইরাকের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়েছে তাঁকে উৎখাত করার জন্য।

তাঁর মতে, এগুলো সব নিউ-বাথিস্টদের ষড়যন্ত্র। আমেরিকা পেছন থেকে এর কলকাঠি নেড়েছে। তাই তিনি ভোট পুনর্গণনার দাবি তোলেন। তাঁর সামর্থ্যের সবকিছু তিনি ব্যবহার করেন। নির্বাচনের ফলাফল তাঁর পক্ষে নেওয়ার জন্য তিনি সংবিধান সংশোধনের দাবি উত্থাপন করেন। নির্বাচন কমিশন ইরাকিয়া ব্লককে বিজয়ী ঘোষণা করে। পরদিনই প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানি তেহরানে দৌড় দেন স্টেট অ্যান্ড ল' কোয়ালিশন ও ন্যাশনাল ইরাকি অ্যালায়েন্সের (শিয়াদের একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম) মাঝে সমঝোতার জন্য। যেকোনো মূল্যে ইরাকিয়াকে থামাতে হবে। এর জন্য যদি তাদের বিদেশি গুরু ইরানের তত্ত্বাবধান ও আশীর্বাদে প্রতিদ্বন্দ্বী শিয়া গ্রুপগুলোকে একত্র হতে হয়, তবুও। এই আলোচনার মাধ্যমে নতুন সরকার ঘোষিত হবে, নতুন আইনি কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে।

মালিকি একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করেন, যাতে কুর্দি ও ইরাকিয়া ব্লককেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থেকে যান মালিকি নিজে। অদিয়ার্নো ভাবছিলেন নির্বাচনের নামে এই নির্লজ্জ প্রহসন ও একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে ইরানের হস্তক্ষেপ ইরাকের সুন্নিরা কীভাবে নেবে। আলি খিদিরিও একই চিন্তা করছিলেন। তিনি ছিলেন ইরাকে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন কূটনীতিক। ২০০৩ সালের আগ্রাসনের পরপরই তিনি গ্রিন জোনে গিয়ে হাজির হন এবং সার্জ ও অ্যাওয়াকেনিংয়ের সময় রেইন ক্রোকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। খিদিরির ভাষ্য ছিল ২০০৯ সালের নির্বাচনে মার্কিন বাহিনীর তত্ত্বাবধান সুন্নিদের হতাশাই শুধু বাড়িয়েছে। অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিও এই মনোভাব দূরীকরণে কোনো ভূমিকা রাখেনি। রাষ্ট্রদূত হিল ইরাকিয়ার বিজয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'আফ্রিকানার্স'র বিজয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিল। প্রেসিডেন্ট ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেন তাঁর খেদ ঝেড়েছিলেন 'কচুর মালিকি সুন্নিদের ঘৃণা করে' বলে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক এই প্রধানমন্ত্রীর পুনরাগমন মেনে নিয়েছিল। খিদিরি আমাদের সঙ্গে স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, 'আমি এক লোককে চিনতাম। খুবই শান্তিপ্রিয়। সবচেয়ে উদারমনা ইরাকিদের একজন। বাথ পার্টির একজন খুবই জুনিয়র নেতা। সাদ্দাম-প্রশাসনে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিল। সে আমাকে বলেছিল—'দেখো, আমি ইতিপূর্বে কখনো সাম্প্রদায়িক ছিলাম না। আমি ইরানকে মোটেও পছন্দ করি না। তাদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ লড়াই হয়েছে। আমি আমার মাতৃভূমিকে ভালোবাসি। আমি পুরোদস্তুর একজন জাতীয়তাবাদী। কিন্তু এখন আমি মনেপ্রাণে সাম্প্রদায়িক। কারণ এখানে উদারমনা কিংবা সেক্যুলারদের কোনো জায়গা নেই। আমরা অভাগা। যেসব সাম্প্রদায়িক লোককে আমি ঘৃণা করতাম, এখন আমি নিজেই তাদের একজন।'

কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ

সার্জের ফলাফল যেমন মার্কিন নীতিনির্ধারকদের মাঝে বহুল বিতর্কিত, তেমনি ২০১১ সালে ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও। এর ফলে কি আইএসআই পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে? ওবামা প্রশাসন আরও দক্ষ ও তড়িৎকর্মা কূটনীতির মাধ্যমে এই সেনা প্রত্যাহার এড়াতে পারত? যার ফলে স্ট্যাটাস ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে।

সিনিয়র মার্কিন ও ইরাকি সেনাকর্মকর্তাদের মাঝে স্ট্যাটাস ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না বললেই চলে। ওবামার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মাইক মুলেন কমপক্ষে ১৬ হাজার সেনা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটি টিমের মতে সংখ্যাটি ছিল খুব বেশি। জো বাইডেন মুলেনকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে আমার ভাইস প্রেসিডেন্সি বাজি ধরে বলতে পারি, মালিকি স্ট্যাটাস ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট বিস্তৃত করতে রাজি হবে।' কিন্তু মালিকি রাজি হননি। কারণ প্রেসিডেন্ট ওবামা যে অল্প কিছুসংখ্যক সেনা রাখতে সম্মত হয়েছেন, মালিকির চরম বিভক্ত সংসদ সেটারও অনুমোদন দেবে কি না সন্দেহ ছিল। ওবামার প্রস্তাব ছিল ৩ হাজার ৫০০ সেনা স্থায়ীভাবে ইরাকে থাকবে, আরও দেড় হাজার সদস্য ইরাকি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সন্ত্রাসবিরোধী অপারেশন চালানোর জন্য নিয়মিত বিরতিতে আসা-যাওয়া করবে।

ধোঁয়াশাপূর্ণ সেনা প্রত্যাহারে সবচেয়ে বড় বিতর্ক ছিল—ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুত নেওয়া হয়ে যাচ্ছে কি না? ফলে দেশটিতে কি দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে? কর্নেল রিক ওয়েলশ সাহওয়ার সময় ন্যাশনাল ট্রাইবাল লিডার প্রোগ্রাম পরিচালনা করতেন, এর উদ্দেশ্য ছিল চলমান শিয়া-সুন্নি গোত্রীয় দ্বন্দ্ব সমাধানের দায়িত্ব স্টেট ডিপার্টমেন্টে হস্তান্তর করা। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সন্স অব ইরাকের সদস্যরা সংঘর্ষের সময় সঠিক পক্ষাবলম্বন করবে, ভঙ্গুর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে, 'দূতাবাসের সবচেয়ে চালু কৌতুক ছিল : যদি তুমি দূতাবাস কী করছে তা জানতে আগ্রহী হও, তবে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রদূতের নিকট গিয়ে দেখো শেলফে কয়টা মদের বোতল আছে, তারপর হিসাব করো রবিবার কয়টা ছিল।

'তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হতো না ইরাকে কোনো যুদ্ধ কিংবা সংঘর্ষ চলছে। সবচেয়ে তুখোড় ও ধারালো মস্তিষ্কের প্রয়োজন ছিল নির্বাচন-পূর্ব ও অব্যবহিত নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে। কারণ তখন সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে মালিকির তীব্র রেষারেষি চলছিল। সন্স অব ইরাকের গোত্রনেতারা তাঁর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। তাঁরা এই উটকো ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন স্টেট ডিপার্টমেন্টের জবাব ছিল, "আমরা খুবই দুঃখিত! ইরাক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমরা এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না!"

'মডারেট সেই ইরাকির চেহারাটা এখনো আমার চোখে ভাসে। রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে সে জিজ্ঞেস করছিল, "তোমরা হস্তক্ষেপ করতে পারো না?" না, আমরা পারি না। আমি তো দেখলাম কদিন আগে মাত্র প্রেসিডেন্ট ওবামা লিবিয়ায় বোম্বিংয়ের আদেশ দিল, লিবিয়া স্বাধীন দেশ নয়? আরও শুনতে পেলাম, তোমার প্রেসিডেন্ট মিসরের ব্যাপারে বলছে—হোসনি মোবারককে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। মিসরকেও কি স্বাধীন মনে করো না? প্রেসিডেন্ট তো সিরিয়াতেও হস্তক্ষেপ করেছে বলে শুনতে পেলাম। বাশার আসাদকে যেতে হবে বলেনি? স্বাধীন-সার্বভৌম ইরানের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করোনি? তোমরা আমাদের দেশে নির্লজ্জ আগ্রাসন চালাওনি? এখনো তো এখানেই বসে আছ!

'চারপাশের দেশগুলোতে তোমরা বহুদিনের স্বৈরশাসকদেরকে উৎখাত করোনি? অথচ আমাদের দেশে উদীয়মান স্বৈরশাসককে নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা নেই। তোমরা কিনা আবার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে এসেছ আমাদের দেশে!'

২০১১ সালে ওবামা মুখভরে বলেছিলেন, ইরাক এখন গণতান্ত্রিকভাবে সফল একটি দেশ। এর কদিন পরই মালিকির ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সালাহ আল মুতলাক সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ইরাক আষ্টেপৃষ্ঠে স্বৈরতন্ত্রের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনো রাখঢাক ছাড়াই তিনি বলেন, 'এটি এক

ব্যক্তির অভিনীত একদলীয় নাটক। নুরি আল মালিকি আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম স্বৈরশাসক।' ইউনাইটেড স্টেটসকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা হচ্ছে অন্ধ ও নির্বোধ। যা করতে চেয়েছিল, বাগদাদে তা করতে পারার অলীক কল্পনায় বিভোর। 'রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আর্দালি-চাপরাশিও ইরানের কথায় নাচে। গোটা সরকারই ইরানের বসানো।'

খোদ নিজের মন্ত্রিসভা থেকে উত্থিত এই সমালোচনার জবাবে মালিকি ট্যাঙ্ক বহরকে আদেশ দেন আল মুতলাকের বাসভবন ঘেরাও করতে! পাশাপাশি তাঁর অর্থমন্ত্রী রাফি আল ইশাওয়ি, ভাইস প্রেসিডেন্ট তারিক আল হাশিমির বাড়িতেও এই বহর হানা দেয়। ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ আল হাশিমি ইরাকের কুর্দিস্তানে পালিয়ে যান। ইরাক ত্যাগের সময় মালিকির নিরাপত্তা বাহিনী ইরাক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে হাশিমির বিমান আটকে দেয়। পরে যদিও হাশিমিকে যাওয়ার অনুমতি দেয়, কিন্তু তাঁর তিন দেহরক্ষীকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সবাই-ই কাস্টডিতে মারা যায়! এর পরদিনই খোদ হাশিমির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

তুরস্কে পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কুর্দিস্তানে নির্বাসিত ছিলেন। ২০১২ সালে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার আদেশ জারি করা হয়। এটি এসেছিল এমন এক আদালত থেকে, যা মালিকির ব্যক্তিগত ইশারায় নাচত। সুন্নি রাজনীতিবিদদের দমন করার এ রকম আরও বহু ক্র্যাকডাউনের ফলে ইরাকজুড়ে সুন্নি এলাকাগুলোতে আরব বসন্তের মতো বিদ্রোহের দাবালন জ্বলে ওঠে। মালিকির প্রতিক্রিয়া শুধু সেই আগুনে ঘৃতাহুতিই দিয়েছে।

ইরাকের প্রাদেশিক নির্বাচনের তিন দিন পর, ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তে ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনী কিরকুকের নিকটস্থ হাওয়িজায় এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ গুঁড়িয়ে দেয়। নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি ছিল তারা এক ইরাকি সৈন্যের হত্যাকারীকে খুঁজছে। সেখানে আদতে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে নানান ঘটনা রটলেও এর পরিণাম ছিল অভিন্ন। ২০ জন সুন্নি নিহত হয়, আহত হয় শতাধিক। হাওয়িজার নিষ্ঠুরতার ফলে ইরাকজুড়ে সুন্নি বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। তারা পুলিশ সদস্য ও আর্মি চেক পয়েন্টগুলো টার্গেট করে। হাওয়িজা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইরাক পার্লামেন্টের মুখপাত্র ওসামা আল নুজাইফি মালিকির পদত্যাগ দাবি করেন।

মসুল ও বাগদাদে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সুন্নি মসজিদ উড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিক্রিয়ায় ইরাকি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। শিয়া এলাকাগুলোতে একিউআই স্টাইল আক্রমণ তীব্রতা পায়। সুন্নিরা একটি জাতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়। আদ দৌরির নকশবন্দী আর্মি ও সাহওয়া মিলিশিয়ারা এতে আন্দোলিত হয়।

এই ঘটনা সংকটপূর্ণ ইরাককে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে। একে ব্যবহার করেই ২০১২-২০১৩ সালে একিউআই তাদের ব্রেকিং দ্য ওয়াল কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর আওতায় ইরাকের আটটি বন্দিশিবিরে দুঃসাহসিক অভিযান চালানো হয়। তাদের সাবেক নেতাদের মুক্ত করে সংগঠনকে আবার পরিপুষ্ট করে তোলা হয়। 'ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার'-এর জেসিকা লুইস আইসিসের উত্থানকে চারটি আলাদা ধাপে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ধাপে চারটি বন্দিশিবিরে আক্রমণ চালানো হয়। এর মাঝে তিকরিতের তাসফিরাত জেলখানাও ছিল। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে এতে আক্রমণ চালিয়ে শ' খানেক বন্দীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের অর্ধেকই ছিল আল কায়েদার সদস্য, যারা মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ছিল।

দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হয় গ্রিন লাইনে। এটি ইরাক ও কুর্দিস্তানের আধা স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক সরকারের সীমান্ত এলাকা। ইরাক ও ইরবিলের (কুর্দিস্তানের রাজধানী) মাঝে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয় ধাপে ভিবিআইইডির দুঃস্বপ্ন ফিরে আসে বাগদাদ ও বেল্ট অব বাগদাদে। টার্গেট ছিল ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনী ও শিয়া বেসামরিক এলাকাগুলো। এ ক্ষেত্রে তারা ইরাকের আরও একটি বৃহৎ দলকে ব্যবহারের চেষ্টা করে—মালিকি সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসা সুন্নি প্রতিবাদকারীরা। আরব বসন্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ফালুজা ও অন্যান্য এলাকায় পথে নেমে আসে। চতুর্থ ও চূড়ান্ত ধাপ শুরু হয় ২০১৩ সালের মে'র মাঝামাঝিতে। শিয়াদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়ানোর চেষ্টার মাধ্যমে। উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূচনা করা ও শিয়া মিলিশিয়াদের পুনরুত্থান ঘটানো।

লুইসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ব্রেকিং দ্য ওয়ালের সময় চালানো প্রায় অর্ধেক ভিবিআইইডি আক্রমণই এই ধাপে হয়। কাকতালীয়ভাবে তখন সুন্নি প্রতিবাদের প্লাবন চলছিল। বন্দিশিবির ভাঙার সবচেয়ে সফল ঘটনাটি এ সময়ই ঘটে। ২০১৩ সালের জুলাইতে আবু গারাইব কারাগার ভেঙে পাঁচ শতাধিক বন্দী মুক্ত হয়। ওবামা প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে পাঁচ থেকে দশটি আত্মঘাতী হামলা হতো। কিন্তু ব্রেকিং দ্য ওয়াল প্রোগ্রামের শেষ তিন মাসে এই সংখ্যাটি ত্রিশে গিয়ে পৌঁছায়! সে বছর গ্রীষ্মের শেষ দিকে প্রতি মাসে ৭০০ ইরাকি নিহত হতো। এবং সুন্নিদের প্রতিবাদ চরম মাত্রার জিহাদি আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

ডিসেম্বরের শেষে আইসিসের উন্মত্ত হত্যাকাণ্ডের ফলে মালিকি সরকার রামাদিতে ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে সরকারবিরোধী আন্দোলনে

সমাপ্তি টানার জন্য। কিন্তু গোত্রীয় প্রতিরোধের মুখে তাদের প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ২০১৪ সালের নববর্ষের দিনে আইসিস ফালুজা দখল করে নেয়। একে ইসলামি ইমারাত হিসেবে ঘোষণা করে এবং সুন্নিদেরকে মালিকির উৎপীড়ন থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রিক ওয়েলশের ভাষ্যমতে, 'মালিকি সুন্নিদের এত দূরে সরিয়ে দিয়েছেন যে তাদের জেগে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা পুনর্গঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু সক্ষম হয়নি। গোত্রীয় মানসম্মান হুমকির মুখে ছিল, প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। এই সংকটের হোতা নুরি আল মালিকি।'

সপ্তম অধ্যায়
বাশার আল আসাদ : সিরিয়া ও আল কায়েদা

ইরাকে আইসিসের উত্থানের পাশাপাশি সিরিয়াতেও কিছু ভূমি তাদের দখলে যায়। বাশার আল আসাদ নিজেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বলি হিসেবে উপস্থাপন করতে এই ঘটনা ব্যবহার করেন। আসাদ রেজিমের এই দাবি উপহাসে পরিণত হয়, যখন তদন্তে সরষের ভূত বেরিয়ে আসে। দেখা যায়, ইরাক থেকে মার্কিনিদের প্রত্যাবর্তনের আগে সিরিয়াই একিউআইকে জিইয়ে রাখতে সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। আনবারের অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্টের নেতা আর-রিশাওয়ি একিউআই কর্তৃক খুন হওয়ার আগে নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল, 'এগুলো সব সিরিয়ার দুষ্কর্ম। সিরিয়া খুবই নিন্দনীয় কাজ করছে।' সর্বমহল থেকে আসাদের ওপর নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। কে নেই? মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সন্স অব ইরাকের সদস্য, তাঁর নিজের সাবেক কূটনীতিক, সামরিক কর্মকর্তা, সিরিয়ান বিদ্রোহী গ্রুপ এমনকি আল মালিকির সরকারও নিশ্চিত করে যে আসাদ রেজিম জারকাবিস্টদের পালে হাওয়া দিচ্ছে।

ইরাক-সিরিয়ায় আজকের আইসিসের উত্থানের তত্ত্বানুসন্ধান সফল হবে না, যদি না আমরা আইসিসের পূর্বসূরির সঙ্গে দামেস্কের দীর্ঘ বাসর ও দহরম-মহরমের বিষয়টি যাচাই করি।

হাফিজ আল আসাদের ইসলামিজম

ইরাকি বাথ পার্টি ইসলামি বিপ্লবের সম্ভাবনা নস্যাৎ করার জন্য কী চেষ্টা করেছে তা আমরা আগেই দেখেছি। ইরাকের দোসর সিরিয়ান বাথ পার্টিও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। ১৯৭৬-এ সিরিয়ান মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান ঘটে। ১৯৮২ সালে হাফিজ তাঁর অনুগত পেটোয়া বাহিনী দিয়ে নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করেন। ফলে হাফিজের সুন্নি মিত্রদের সঙ্গে তাঁর কৌশলগত সম্পর্ক ঝাপসা ও ঘোলাটে হয়ে যায়। এদের মাঝে ছিল সুন্নি ইসলামি দল, সুন্নি প্যারামিলিশিয়া এবং পারস্পরিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থে জোটবদ্ধ হওয়া মিত্ররা—যাদের প্রধান শত্রু ছিল আমেরিকা ও ইসরায়েল।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে স্কলার ইয়াল জিসার মন্তব্য করেন, 'যারা মসজিদ ও সংসদের শুভ পরিণয়ের স্বপ্ন দেখে হাফিজ আল আসাদ এখন তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন নয়, তাদের যমদূত নয়। কারণ সে বুঝে গিয়েছে আঞ্চলিক প্রভাব, প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর ছড়ি ঘোরানো এবং খোদ সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ শান্তি সম্ভবত শুধু ইসলামিস্টদের দ্বারাই সম্ভব।'

২০০০ সালে হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর লন্ডনপড়ুয়া চোখের চিকিৎসক ছেলে বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় এলে সেই প্রচেষ্টা তীব্রতা পায়। উদাহরণত বলা যায়, সিরিয়ায় মুসলিম ব্রাদারহুড আইনত নিষিদ্ধ হলেও অতিসাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালিদ মিশালকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে দামেস্কের কোনোরূপ আপত্তি ছিল না।

এখনো দেশি ও বিদেশি যোদ্ধাদের সমন্বয়ে উত্থিত বিদ্রোহ দমনে আসাদ রেজিম হিজবুল্লাহ ও ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। অথচ এই দুটি দলই মার্কিন কালো তালিকাভুক্ত। সিরিয়ার বিদ্রোহী দলগুলো নিঃসন্দেহে ইসলামিস্ট ও জিহাদিস্টদের নিয়ে গঠিত, যাদের অনেকেই আসাদের বন্দিশিবিরের ভুক্তভোগী, বাকিরা ইরাকে তার সরকারের সাবেক চ্যালাচামুণ্ডা। যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামকে উৎখাতের বহু আগে থেকেই ইরাককে অস্থিতিশীল করার জন্য আসাদ সেখানে বিদেশি যোদ্ধা সাপ্লাই দিচ্ছিলেন। এমনকি দামেস্কের মার্কিন দূতাবাসে অবস্থিত একটি শাখা সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের সিরিয়া-ইরাক সীমান্তে বাস ভ্রমণে সহায়তা করত। ২০০৭ সালে ইরাকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ঘোষণা দেয় যে তারা 'সাদ্দামের একজন ফেদাইন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে, যে সিরিয়ায় ইরাকি ও বিদেশি যোদ্ধাদের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করত।' অবশ্য তার নাম প্রকাশ করা হয়নি।

সেই বছর মার্কিন বাহিনী মুসান্নাকে হত্যা করে। তিনি ছিলেন সিরিয়া-ইরাক সীমান্ত শহর সিনজারে আল কায়েদার আমির। যৌথ বাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল কেভিন বার্গনারের ভাষ্যমতে, 'মুসান্না ছিল আন্তর্জাতিক যোদ্ধাদের আসা-যাওয়ার মাধ্যম। তার চ্যানেল হয়েই তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করত।' অন্যান্য উচ্চপদস্থ নেতাদের মতো মুসান্নার কাছেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু গোয়েন্দা নথিপত্র ছিল। এগুলো পরবর্তী সময়ে সিনজার রেকর্ডস নামে পরিচিতি পায়। ২০০৮ সালে ওয়েস্ট পয়েন্টে অবস্থিত কমব্যাটিং টেরোরিজম সেন্টার (সিটিসি) এই রেকর্ডগুলোর ওপর এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, ইরাকে ৩৭৬ জন বিদেশি যোদ্ধার মাঝে অর্ধেকের বেশি আত্মঘাতী হামলাকারী হিসেবে নাম লিখিয়েছে। এ থেকে একিউআইর বিদেশি যোদ্ধা উৎসর্গের ক্ষমতা অনুমিত হয়।

সিনজার রেকর্ডস থেকে আরও জানা যায়, বিদেশি যোদ্ধারা সিরিয়ার দার আজজুর প্রদেশ হয়ে ইরাকে প্রবেশ করত। সিরিয়ান অংশে আলবু কামাল শহরটি রুট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এটি ছিল ইরাকের সীমান্ত শহর কাইয়িম সংলগ্ন। ২০০৪ সালে দ্বিতীয় ফালুজা যুদ্ধের পর জারকাবি কাইয়িম শহরকে তাঁর হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরের বছর এখানে অ্যাওয়াকেনিং শুরু হয়। সিটিসির ভাষ্যমতে, বিদেশি যোদ্ধাদের এই প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ধাপে বিভক্ত। প্রথম ধাপের সূচনা হয় আগ্রাসনের অল্প কদিন আগে। যখন সাদ্দাম আরবদের অত্যাসন্ন বিপ্লবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আহ্বানে দার আজজুর ও হাসাকার কিছু বেদুইন গোত্র সাড়া দেয়। সিরিয়া থেকে আসা অন্য জিহাদিস্টরা শায়খ আহমদ কুফতারো দ্বারা প্রভাবিত। সিরিয়ান এই মুফতি সাদ্দামের আহ্বানের পর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে মসজিদ-মাদরাসা থেকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে শুরু করেন।

সিটিসির গবেষণামতে, 'সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের গ্রাম ও শহরগুলো বিদ্রোহীদের রাখার জন্য প্রচুর অনুদান পায়। স্থানীয় ধর্মীয় ও গোত্রনেতারা ইরাকে যাতায়াত ও বসবাসের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, মার্কিন আগ্রাসনের আগমুহূর্তে শত শত যোদ্ধা আলবু কামাল ও হাসাকা হয়ে ইরাকে প্রবেশ করে। ফলে বাসা ভাড়া, খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুর দাম বেড়ে যায়। লাভবান হয় স্থানীয়রা। সিরিয়ান কর্তৃপক্ষ যোদ্ধাদের এই স্রোত প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু তা থামানোর কোনো চেষ্টা করেনি।'

দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় প্রথম ফালুজা যুদ্ধের সময়। এ সময় আসাদ রেজিম যোদ্ধাদের প্রবাহ বন্ধের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যাপক দুর্নীতির কারণে তা ব্যর্থ হয়। দু-এক পয়সা ঘুষ পেলে সিরিয়ান মুখাবারাত অফিসাররা সীমান্ত পারাপারে বাধা দিত না। তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছে ২০০৫ সালে। সে বছর সাবেক লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরিকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। জাতিসংঘ এর জন্য আসাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সহযোগী হিজবুল্লাহর প্রতি আঙুল তোলে। ফলে হিজবুল্লাহ ও আসাদবিরোধী তীব্র জনমত গড়ে ওঠে এবং সিরিয়ান সেনাবাহিনী লেবানন ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ঘটনা সিডার রেভল্যুশন নামে পরিচিত। এর পরপরই ইরাকে বিদেশি যোদ্ধাদের নতুন প্রবাহ শুরু হয়।

ফোনকল

বাশার আল আসাদ সব সময়ই ইরাকের জিহাদিদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের সংযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। বরং তিনি ওয়াশিংটনের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করে আসছেন বলে দাবি করেন। তবে তাঁর সরকারের

সাবেক কর্মকর্তাদের ভাষ্য হচ্ছে—আসাদ কর্তৃক একিউআইকে রাষ্ট্রীয় মদদ দেওয়া কোনো গোপন বিষয় নয়। এই সহায়তা দেওয়া হতো দুটি উদ্দেশ্যে। এক. বুশ প্রশাসনকে একটি পরিষ্কার সতর্কবার্তা দেওয়া, যেন ইরাকের পর সিরিয়ার দিকে চোখ না তোলে। পাশাপাশি ইসলামিস্টদের দৃষ্টি তাঁর দেশ থেকে সরিয়ে রাখা। যতক্ষণ তিনি তাদেরকে পার্শ্ববর্তী দেশে ব্যস্ত রাখবেন, তারা সিরিয়ায় মনোনিবেশ করার ফুরসত পাবে না।

ওয়াশিংটনে সিরিয়ান কূটনীতিকদের মাঝে একজন ছিলেন বাসসাম বারাবানদি। ২০১১-এর বিপ্লবের পর তিনি প্রত্যক্ষভাবে শত শত ভিন্নমতাবলম্বী ও অ্যাক্টিভিস্টকে মার্কিন ভিসা পেতে সহায়তা করেছেন। সিরিয়ায় অবস্থানরত তাদের আত্মীয়স্বজনের মাঝে যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশ ত্যাগ করতে চেয়েছে, তাদেরকেও সহায়তা করেছেন। তিনি আমাদেরকে বলেন, 'আমেরিকা আরব দেশগুলোতে সরকার পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করছে, আসাদের সমস্যা এটুকুই ছিল না। তার সমস্যা আরও জটিল। আসাদ বুঝতে পেরেছিল ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের ওপর সংখ্যালঘু সুন্নি শাসনের অবসান ঘটানো। এর পরই আসবে তার নিজের পালা। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের শিয়া-আলাভি শাসক। তাই তখন থেকেই সে মুজাহিদিনদের সঙ্গে হাত মেলায়। সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা করে। এর দ্বারা সে আমেরিকাকে এই বার্তা দিতে চেয়েছিল—আমার পেছনে লেগো না। তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে যোদ্ধা পাঠিয়ে ইরাককে আমি তোমাদের সেনাবাহিনীর বধ্যভূমিতে পরিণত করব।'

প্রথম পাঁচ বছর মার্কিনিরা তাঁর হুমকির জবাব দিয়েছে কূটনৈতিক পন্থায়। আসাদও সময়-সুযোগমতো তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—এই দ্যাখো, আমার দেশে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক আমি গুঁড়িয়ে দিচ্ছি। পুরোটাই ছিল ছলনা। সিরিয়া মূলত সন্ত্রাসবাদে সহায়তাকে দর-কষাকষির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। সাদ্দামের সৎভাই সাবাওয়ি ইবরাহিম আল হাসসান তিকরিতি সিরিয়ায় আত্মগোপন করে ছিলেন। আমেরিকা-ইরাক উভয়েই তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছিল। আসাদ একপর্যায়ে তাঁকে মার্কিনিদের হাতে তুলে দেন। সাবেক কূটনীতিবিদ বারাবানদি আমাদেরকে সে ঘটনা শুনিয়েছেন। '২০০৫ সালে মার্কিনিরা সিরিয়ায় গিয়ে সাবাওয়িকে গ্রেপ্তারে আসাদের সহায়তা চায়। তিনি সিরিয়া-ইরাক সীমান্তে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে বাথিস্ট যোদ্ধাদের পরিচালনা করতেন। বাশারই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল। ইরাকি ও মার্কিনিরা তার সহায়তা চায়। বিনিময়ে তার সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের মুলা প্রদর্শন করে। এতে কাজ হয়, আসাদ গলে যায়।'

দামেস্কের সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ইমাদ মোস্তাফা, আমেরিকায় তৎকালীন সিরিয়ান রাষ্ট্রদূত। মিটিংয়ে আরও ছিলেন আমেরিকার আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট। সেখানে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়। সেদিনের ঘটনা বলেছেন ইমাদ। মিটিংয়ের দুই দিন পর বাশার আল আসাদের ভগ্নিপতি এবং সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের শীর্ষস্থানীয় অফিসার আসেফ শওকত ইমাদকে কল দেন, 'তোমার আমেরিকান বন্ধুদেরকে বলো সাবাওয়ি অমুক দিন ইরাকের অমুক জায়গায় থাকবে।' মার্কিনিদের তাঁর অবস্থানস্থল জানিয়ে দেওয়া হয়, সেখান থেকে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়।

ওয়াশিংটনভিত্তিক 'ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসি'র টনি বাদরান আল কায়েদার সঙ্গে আসাদের আঁতাতকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণের একটি কৌশল বলে মনে করেন। 'এটি ছিল আঞ্চলিক শক্তি ও আঞ্চলিক অবস্থান নির্ণয়ের পন্থা। আসাদের বিশ্বাস ছিল, যত দিন সে নিজেকে একটি অপরিহার্য আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রকাশ করতে পারবে, তত দিন অন্যরা তাকে গুরুত্ব দেবে। এর ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে তার বৈদেশিক নীতি ছিল "ফোন ওঠাও, আমাদের কল দাও। কী আলোচনা হচ্ছে তা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোমরা আমাকে গোনায় ধরছ, সেটা। তোমরা আমাকে যে স্মরণ করছ, ওতেই হবে।" আমেরিকাকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করাটাই ছিল তার জন্য ভীষণ আমোদের। এর ফলে সে নিজেকে আরব-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি কিংবা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের প্রধান মিত্র হিসেবে জাহির করার সুযোগ পায়। সে নিজেই সমস্যা তৈরি করত, তারপর—ওহ! তোমরা এই বিপদে পড়েছ? দাঁড়াও আমি আসছি—মহাশয় সমাধানের টোটকা নিয়ে হাজির হতো।'

আবুল কা'কা ও শাকের আল আবসি

বাদরান তাঁর মতের সপক্ষে উদাহরণ হিসেবে কুর্দিশ ধর্মীয় নেতা শেখ মাহমুদ গুল আঘাসির কথা উল্লেখ করেন। ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ। শেখ মাহমুদ এমনিতে আবুল কা'কা নামে পরিচিত ছিলেন। নাইন ইলেভেনের পর স্বল্প সময়ের জন্য আসাদ রেজিম তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। সিরিয়াকে তিনি পুরোপুরি শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান জেনেও কদিন পরই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। বেরিয়ে এসে তিনি মার্কিন সেনাদের কসাইখানার গবাদিপশুর মতো জবাই করার আহ্বান জানান। তা সত্ত্বেও আলেপ্পোতে খোলামেলাভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

২০০৩ সালে সাংবাদিক নিকোলাস ব্লানফোর্ড তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। নিকোলাসের ভাষ্য অনুযায়ী, কা'কা প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

ইহুদিদের শাপশাপান্ত করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। সেসব অনুষ্ঠানে সিরিয়ান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকতেন। এসব অনুষ্ঠানের ফলে কা'কার অনুসারীদের মাঝে গুরুর কাজকারবার নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। এটা তীব্রতর হয় যখন জানা যায় কা'কা সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীকে সিরিয়ান ওয়াহাবিদের একটি তালিকা হস্তান্তর করেছেন। কা'কা কি ডাবল এজেন্ট? এই প্রশ্ন জোরেশোরে উঠতে থাকে। একদিকে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জিহাদে উৎসাহিত করছেন, অন্যদিকে নিজেই জিহাদিদের সরকারের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন।

ব্ল্যানফোর্ডের কথা হচ্ছে, সরকার কা'কাকে তত দিনই দুধকলা দিয়ে পুষেছে, যত দিন সরকারের যোদ্ধা প্রয়োজন ছিল, আর কা'কা ছিলেন সরকারকে বিদেশি যোদ্ধা সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ 'রপ্তানিকারক'। সিরিয়ার অভ্যন্তরে চালানো আক্রমণগুলো ছিল সাজানো নাটক। যোদ্ধা সংগ্রহের প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এগুলো প্রয়োজন ছিল। কা'কার মসজিদের দেয়ালে মাঝ বরাবর লাল দাগে বিভক্ত একটি বোমার ছবি অঙ্কিত ছিল। এটি ছিল এই সিক্রেটের সাংকেতিক চিহ্ন।

মুখাবারাতের সঙ্গে এই বাগ্মী নেতার সম্পর্ক ছিল সিরিয়ার সবচেয়ে আলোচিত ওপেন সিক্রেট। সিরিয়ান এমপি মুহাম্মদ হাবাশের মতে কা'কা ছিলেন ভীষণ ধোঁয়াশাপূর্ণ চরিত্র। মুহাম্মদ হাবাশ ২০০৮ সালে দামেস্কের সিদনাইয়্যা জেলখানার চরমপন্থা-নিরোধ (de-radicalization) প্রকল্পের প্রধান ছিলেন। 'আলেপ্পোর একটি জনবহুল এলাকার এক মসজিদে তিনি তাঁর জিহাদি মতবাদ প্রচার করতেন। এ মসজিদে শুধু যে মতবাদ প্রচার হতো তাই নয়, বরং ইরাক-গমনেচ্ছু যোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। তিনি যে ধরনের বক্তৃতা দিতেন, অন্য কোনো ইমাম এমন বক্তৃতা দিলে বাকি জীবন চৌদ্দ শিকের ভেতরেই কাটানো লাগত। শুধু তিনিই নন, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, এমনকি শ্রোতাসুদ্ধ জেলে যেতে হতো।'

হাবাশ ২০০৬ সালে কা'কার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। 'আমি একটি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে লেকচার দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানে কেউ একজন বক্তৃতা দেয়। তার ক্যারিশম্যাটিক বক্তৃতায় তন্ময় হয়ে যাই। পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে আমার অফিসে সাক্ষাৎ করা যাবে কি না জিজ্ঞেস করি। আমি তাকে বলি, আমি আপনার ব্যাপারে জানতে ইচ্ছুক। কথা বলার সময় আপনার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটে। তার সঙ্গে দুজন তরুণ শাগরেদ ছিল। তারাও মুগ্ধ হয়ে কথা শুনছিল। বক্তৃতার মাঝে সে তাদেরকেও জড়াচ্ছিল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তার নেতৃত্বগুণ অসাধারণ। সে বছর আলেপ্পোকে ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা করা

হয়েছিল। আলেপ্পো নিয়ে তাকে আমার প্ল্যান বললাম। ইসলামিক পুনর্গঠন নিয়ে আমার আলাদা প্রজেক্ট ছিল। তার মতো কাউকে খুঁজছিলাম।

'আমরা একমত হয়েছিলাম রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সেখানে এসব কর্মকাণ্ডের কিছু সুযোগ থাকবে। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ একজন এসে বলল, এ হচ্ছে আবুল কা'কা। আমি কেন তার সঙ্গে কথা বলেছি জানতে চাইল। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না এই লোক কা'কা। কারণ সে স্যুট-টাই পরিহিত জেন্টলম্যান ছিল। ছিমছম দাড়ি। তার সহিংসতার যেসব গল্প শুনেছি, তার চালচলনে সেসবের কিছুই দেখা যায়নি।'

এই দৈব সাক্ষাতের পর হাবাশ নিয়মিতই কা'কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। 'সে আমাকে খুব আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সঙ্গে তার কর্মকাণ্ড বলেছিল। বলছিল আমেরিকাকে সে সিরিয়া থেকে দূরে রাখছে। সে না থাকলে আমেরিকা সিরিয়ায় ঢুকে যেত। সে ছিল সরকারের অস্ত্র। কিন্তু শেষমেশ সরকারের গুলি খেয়েই তাকে মরতে হয়েছিল।'

এমনই আরেকটি ঘটনা হচ্ছে শাকের আল আবাসির। ফিলিস্তিনি নেতা। ফাতাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গ্রুপ পরিচালনা করতেন। ২০০২ সালে তিনি আর জারকাবি মিলেই মার্কিন নাগরিক লরেন্স ফোলিকে হত্যার ছক এঁকেছিলেন।

ডেভিড শেঙ্কার, পেন্টাগনের লেভান্ত বিষয়ক শীর্ষস্থানীয় সাবেক পলিসি মেকার। বর্তমানে ওয়াশিংটন ইন্সটিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসির প্রোগ্রাম অন আরব পলিটিকসের পরিচালক। তিনি বলেছিলেন, 'শাকের আল আবাসি ছিল ফোলি হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী। দামেস্কে যৌথভাবে এটি বাস্তবায়ন করেছে। আমি শতভাগ নিশ্চিত যে দামেস্কের এই পরিকল্পনায় আসাদ যুক্ত। তার মদদ, ইঙ্গিত ও সহায়তায়ই এটি ঘটেছে। এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। মূল কালপ্রিট জারকাবি নয়, আল আবাসি। তখন সে সিরিয়ায় ছিল। তারপর দূর থেকে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করতে জর্ডান চলে যায়।'

জর্ডানে জারকাবি ও আল আবাসি দুজনের ওপরই মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছিল। তাঁদের অনুপস্থিতিতে এই সাজা ঘোষণা করা হয়। জর্ডান দীর্ঘদিন যাবৎ দামেস্ককে আবাসিকে হস্তান্তর করার জন্য আবেদন জানিয়ে আসছিল। আসাদ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন আবাসিকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে। শেঙ্কারের ভাষ্য, 'অ্যারাবিক প্রেসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এর পরপরই আবাসিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এবং ইরাকে গমনেচ্ছু আল কায়েদা সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য সিরিয়ান ভূমিতে সে একটি প্রশিক্ষণ শিবির খোলে।' সিরিয়ায় তাঁর সঙ্গে যা-ই ঘটে থাকুক

না কেন, ২০০৭ সালে তিনি সিরিয়া ত্যাগ করেন। কারণ সে বছর লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির নাহরুল বারিদে লেবানিজ আর্মড ফোর্সেসের (এলএএফ) বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এটি ছিল ফাতহুল ইসলামের (ফাতাহ) একটি সশস্ত্র বিপ্লব।

এলএএফ যদিও সেই বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিল কিন্তু আল আবাসি কখনোই ধরা পড়েননি। পরবর্তী সময়ে ফাতাহ তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে যে আল আবাসি সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন, সেখানে সম্ভবত নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে হত্যা করে। শেঙ্কারের মতে, আল আবাসিকে মূলত সিরিয়া থেকে লেবাননে পাঠানো হয়েছিল। নাহরুল বারিদ ক্যাম্পে উত্তেজনার গোটা সময়টা জুড়ে সিরিয়ান মুখাবারাতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আমরা কীভাবে তা বুঝলাম? 'সেখানে আসাদপন্থী একজন লেবানিজ ধর্মগুরু ছিল। ফাতহি ইয়াকিন। সে বেশ কয়েকবার নাহরুল বারিদ ক্যাম্পে গিয়েছিল আবাসির সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। এর কয়েক সপ্তাহ পরই দামেস্কে আসাদের সঙ্গে এক ফটোতে তাকে দেখা যায়।'

আবু গাশিয়া হত্যাকাণ্ড

সিরিয়া থেকে ইরাকে যাওয়া অধিকাংশ যোদ্ধাকে রাখা হতো আসাদের ভগ্নিপতি আসেফ শওকতের তত্ত্বাবধানে। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি নামের একটি অনিয়মিত নিরাপত্তা কমিটি গঠন করে একে সিরিয়ান বিপ্লব প্রতিরোধের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শওকত ছিলেন এই কমিটির প্রধান। দামেস্কে ২০১২ সালে এক দুঃসাহসিক আক্রমণে তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি নিহত হওয়ার পরপরই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি ভেঙে যায়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, এটি সিরিয়ান বিদ্রোহীদের কাজ। ছদ্মবেশে তারা কমিটিতে ঢুকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। কিন্তু নতুন প্রাপ্ত কিছু নথিপত্র থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল অভ্যন্তরীণ সংঘাত। ইরান সমর্থিত গ্রুপ করেছে, যারা শওকতের বিরোধী ছিল। কমিটিতে দুটি গ্রুপ ছিল, ইরান-সমর্থকেরা বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে। শওকতকে রাজি করাতে না পেরে সরিয়ে দিয়েছে। শওকত বোকা ছিলেন না, দয়ালুও নন। অতীতে এ দুটির কোনোটিই তাঁর মাঝে দেখা যায়নি। তাঁর জিহাদি গ্যাংয়ের একজন ছিল আবু গাশিয়া। আসল নাম বাদরান তুর্কি হিশান আল মাজিদি। সে ছিল ইরাকের মসুলের অধিবাসী। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ তাকে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ২০০৪ সালে আবু গাশিয়া একিউআইর লজিস্টিক

কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ পায়। খোদ জারকাবি তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। জারকাবির মৃত্যুর পর আবু আইয়ুব আল মাসরির অধীনেও সে কাজ করে।

২০০৭-এর বসন্তে আবু গাশিয়া একিউআই সদস্যদের সিরিয়ান বর্ডার ক্রস করে ইরাকে প্রবেশের ব্যবস্থা করে। উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নথিতে দেখা যায়, 'ভগ্নিপতি শওকত ও একিউআই নেতা আবু গাশিয়ার দহরম-মহরম সম্পর্কে বাশার আল আসাদ খুব ভালো জানত।' এমনিতে আবু গাশিয়া পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করত। তার ডানহাত ছিল তার কাজিন গাজি ফিদা হিশান, আবু ফয়সাল নামেও পরিচিত। সে উত্তর-পূর্ব দামেস্কের জাবাদানি শহরে থাকত। এটি ছিল সিরিয়া থেকে লেবাননে অস্ত্র চোরাচালানের প্রধান আখড়া। একিউআই যখন পশ্চিম ইরাক দখলের চেষ্টা শুরু করে। এই প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য আবু গাশিয়া ও আবু ফয়সাল মার্কিন বাহিনীর ফাঁড়ি ও ইরাকি পুলিশ ফাঁড়িগুলোতে রকেট হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

গ্যাংয়ের আরেক সদস্য ছিল তার ভাই আকরাম তুর্কি হিশান আল মাজিদি, আবু জাররাহ। সেও জাবাদানিতে থাকত। অস্ত্র চোরাচালানের দায়িত্বে ছিল। মার্কিন সরকারের ভাষ্যে 'সে ইরাকি ও মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যার আদেশ দিয়েছিল।' আরেকজন কাজিন ছিল সাদ্দাহ জালুত আল মারসুমি, সাদ্দাহ নামে পরিচিত। সে ছিল আল কায়েদার অর্থ জোগানদাতা। সে ও তার গোত্র মিলে সিরিয়া থেকে ইরাকে আত্মঘাতী বোমারু সরবরাহ করত। আবু গাশিয়ার পূর্বসূরি ছিল সিরিয়ান সুলেইমান খালিদ দারবিশ। ২০০৫ সালে ইরাকের কাইয়িম শহরে জয়েন্ট সিকিউরিটি তাকে হত্যা করে। শহরটি কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর আলবু কামালের পাশে অবস্থিত এই শহর উভয় দিকেই মানুষ ও অর্থ প্রবাহের ট্রানজিট পয়েন্ট ছিল। ২০০৮ সাল নাগাদ আবু গাশিয়ার চোরাচালান রুট বন্ধ করার বেশ কয়েকটি মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। প্যাট্রিয়াস দামেস্কে গিয়ে সরাসরি আসাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য বুশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। আশা ছিল, আরেকটি সাবাওয়ি-স্টাইল চুক্তি হয়তো সম্ভব হবে। কিন্তু হোয়াইট হাউসের উত্তর ছিল—না। পরিবর্তে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আসাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়, যা সফলতার মুখ দেখেনি।

২০০৮-এর অক্টোবরে আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিআইএর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টালের জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ড সিরিয়ার সীমান্ত শহর আলবু কামালে এক গোপন অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পায়। উদ্দেশ্য ছিল আবু গাশিয়াকে হত্যা করা। ২৬ অক্টোবর ২০০৮-এ এক স্পেশাল অপারেশন চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। ২০১১ সালে

অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযানের মতোই ছিল সেই অপারেশন।

অকাট্য প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও আসাদ ইরাকে যোদ্ধা পাঠানোর সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা লাগাতার অস্বীকার করে এসেছেন। অপারেশনের কয়েক সপ্তাহ বাদে ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি ডেভিড মিলিব্যান্ড দামেস্ক সফরে যান। পুনরায় বাশার আল আসাদকে এসব আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড বন্ধের অনুরোধ করেন। জবাবে কিছুই না জানা ও অসম্পৃক্ততার সেই পুরোনো রেকর্ড আরও জোরেশোরে বাজানো হয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নথিতে সেই মিটিংয়ের বিবরণ পাওয়া যায়, দামেস্কের মার্কিন দূতাবাসের তৎকালীন শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের জবানিতে। 'আসাদ ২৬ অক্টোবরের মার্কিন অভিযানের ব্যাপারে অভিযোগ জানান। প্রত্যুত্তরে মিলিব্যান্ড বলেন, মার্কিনিরা চিহ্নিত বিদেশি যোদ্ধা আবু গাশিয়ার স্থাপনায় আক্রমণ করেছে। এ ক্ষেত্রে সিরিয়ার উচিত ছিল পশ্চিমা ও মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করা। মিলিব্যান্ড উল্টো প্রশ্ন করেন, আমেরিকা সিরিয়ায় আবু গাশিয়ার অবস্থানের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়ার পরও আসাদ কেন কোনো অ্যাকশন নেননি? আসাদের জবাব ছিল, আবু গাশিয়া আলবু কামালে থেকে থাকলেও ওখানে আক্রমণ করা মার্কিন বাহিনীর কম্ম নয়, সমস্যা সমাধানের পথ এটা নয়।

এটা ছিল সবে শুরু। এক বছর পর আসাদ রেজিমের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে কোনেলি তাঁর মতামত পেশ করেন এভাবে, 'সর্বস্তরের সরকারি আমলারা মিথ্যাবাদী। জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা মিথ্যার ওপর গোঁ ধরে থাকে। এমনকি মিথ্যা বলে হাতেনাতে ধরা খেলেও বিন্দুমাত্র শরমিন্দা হয় না।' গাশিয়া হত্যাকাণ্ড তখন মিডিয়ায় তেমন প্রচার পায়নি। আসাদের বিরুদ্ধে জিহাদিস্টদের সঙ্গে আঁতাতের সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ আসে ২০০৮ সালে। মার্কিন ফেডারেল কোর্ট দুজন মার্কিন নাগরিকের অপহরণ ও হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে দামেস্ককে অভিযুক্ত করে। অলিন ইউজিন আর্মস্ট্রং ও জ্যাক হ্যান্সলি ছিল আমেরিকান কন্ট্রাক্টর। দুজনকেই একিউআইর এজেন্টরা নৃসংশভাবে শিরশ্ছেদ করে খুন করে।

আর্মস্ট্রং ও হ্যান্সলির পরিবার আদালতে মামলা দায়ের করে। এতে তারা শুধু আসাদ সরকারকেই আসামি করেনি, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, ব্যক্তিগতভাবে বাশার আল আসাদ ও শওকতকেও আসামি করা হয়। আদালত ফরেন সভরেইন ইমিউনিটি অ্যাক্টের উল্লেখপূর্বক অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু সিরিয়াকে বিবাদী হিসেবে নির্ধারণ করে। ওই আইনের বলে আমেরিকায় কোনো দেশের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার সংকুচিত করা হয়। যেহেতু আসাদ ও শওকতের বিরুদ্ধে কোনো

সমন জারি করা হয়নি, তাই আসামির তালিকা থেকে তাঁদেরকেও বাদ দেওয়া হয়। মামলার রায়ে, যা বিচারক রোজম্যারি কোলিয়ার কর্তৃক লিখিত হয়েছিল, শাকের আল আবাসি, আবুল কা'কা, আবু গাশিয়া এবং ফোলি হত্যাকাণ্ড সবগুলোর উল্লেখ করা হয়। রায়ের উপসংহারে বলা হয়, 'সিরিয়া জারকাবি ও আল কায়েদাকে ইরাকে প্রভূত সহায়তা করেছে, যা অবশেষে আর্মস্ট্রং ও হ্যান্সির শিরশ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিরিয়ার অবকাঠামোগত সহায়তা, সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি এবং তত্ত্বাবধান হয়েছে খোদ আসাদ ও জেনারেল শওকতের অধীনে। তাদের অফিশিয়াল রুটিনওয়ার্কের অধীনে।' ২০১১ সালের মে মাসে সিরিয়া এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে কিন্তু হেরে যায়।

বিরহের সুর

মার্কিন কাউন্টার টেরোরিজম সার্কেলে প্রচলিত মত হচ্ছে, ২০০৮ সালে আবু গাশিয়া হত্যাকাণ্ডের পর আসাদ জিহাদিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক গুটিয়ে আনে। সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে জিহাদি নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়। বিদেশি যোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করে। কিন্তু নতুন প্রাপ্ত প্রমাণাদি এই মূল্যায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে গার্ডিয়ানের সাংবাদিক মার্টিন শুলোভ আইসিসের ওপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ ছাপেন। এতে নুরি আল মালিকির সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ যে অভিযোগ করে আসছে, তার সত্যতা পাওয়া যায়। তাঁর অভিযোগ ছিল ১৯ আগস্ট ২০০৯ সালে ইরাকের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলায় সিরিয়ার মদদ ছিল। সেদিন ইরাকের অর্থমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাগদাদে একটি পুলিশ কনভয়ের ওপর একের পর এক সিরিজ ভিবিআইইডি আক্রমণ হয়। সরকারি আমলা, সাংবাদিকসহ শতাধিক মানুষ নিহত হয়। আহত হয় ছয় শতাধিক। নুরি আল মালিকি উভয় ষড়যন্ত্রের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বাথিস্টদের অভিযুক্ত করেন। সে বছরের নভেম্বরে সরকার একটি বার্তা প্রচার করে। সরকারের দাবি অনুযায়ী এটি ছিল আগস্টের হামলায় জড়িত তিন বাথ-সদস্যের স্বীকারোক্তি।

প্রথম দিকে বাগদাদ সরাসরি আসাদের দিকে আঙুল তুলতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা শুধু বলে আসছিল ষড়যন্ত্রের পট রচিত হয়েছে সিরিয়ায়। কিন্তু সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়া দুই বাথ-সদস্যকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বাগদাদ দামেস্ক থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করে নেয়। প্রত্যুত্তরে বাশারও বাগদাদ থেকে তাঁর কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করে নেন। যে দুজনকে তিনি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান, তাঁদের একজন হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইউনুস আল

আহমাদ। তাঁর ব্যাপারে আসাদের ভাষ্য ছিল, তাঁকে ইতিমধ্যেই সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কিছু সময়ের জন্য বাশার আল আসাদ আহমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁকে ইরাকের বাথিস্ট বিদ্রোহীদের নেতা বানাতে চেয়েছিলেন, তাদের চেয়েও ভয়ংকর, প্রতিষ্ঠিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নকশবন্দীদের প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আদ দৌরি, অবশ্য তিনিও ছিলেন সিরিয়ান ভূমিতে। ২০০৯ সালে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরাক আরও গুরুতর অভিযোগ তোলে। ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোশিয়ার জাবেরি বাহরাইনে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স নিশ্চিত করেছে, বাথিস্টরা সিরিয়ায় আখড়া গেড়েছে। তারা সিরিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তাও পাচ্ছে। ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দাপ্রধান জেনারেল হোসেইন আলি কামাল এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত।'

কামাল তাঁর পেশাদারির কারণে মার্কিনিদের শ্রদ্ধাভাজন ও আস্থাভাজন ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি ক্যানসারে মারা যান। শুলোভকে তিনি বলেছিলেন, আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে সিরিয়া আল কায়েদা ও ইরাকি বাথিস্টদের সঙ্গে দুটি গোপন বৈঠকের আয়োজন করেছে ২০০৯ সালে। দুটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে জাবাদানিতে। শুলোভ কামালের সেসব মিটিংয়ের বর্ণনায় বলেন, 'সে আমার সামনে সমস্ত প্রমাণ মেলে ধরে। পূর্ব ইরাকে প্রবেশের জন্য তাদের ব্যবহৃত রুটের ম্যাপও দেখায়। সিরিয়ান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মাঝারি পর্যায়ের অফিসারদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের বিবরণও ছিল।'

কামালের ভাষ্যমতে, তাঁর এমন একজন 'অমূল্য রত্ন' ছিল, যে জাবাদানির এক মিটিং রেকর্ডও করেছে। মিটিংটা ছিল বাথিস্টদের নেতৃত্বে। 'সে আমাদের সর্বকালের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সোর্সদের একজন। আমাদের জানামতে এটিই ছিল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বৈঠক, যেখানে সব দল উপস্থিত ছিল। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট।' ইরাকে তখনো মার্কিন উপস্থিতি ছিল। কিন্তু সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স, বাথিস্ট ও আল কায়েদার যৌথ অ্যাজেন্ডা ছিল মালিকি সরকারকে দুর্বল করে তোলা, অস্থিতিশীল করে তোলা।

কামাল শুলোভকে বলেন, সিরিয়ার অভ্যন্তরে থাকা সোর্স তাঁকে বলেছে, ষড়যন্ত্রকারীরা লক্ষ করেছে তাদের মূল টার্গেটগুলোতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তাই তারা 'ভিন্ন' কৌশল ও লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছে। কামাল মাসের পর মাস মাথা কুটে মরেছেন কী হতে পারে তাঁদের নতুন টার্গেট তা খুঁজে পেতে। অবশেষে আগস্টের ভয়াবহ হামলা নিজেই জানান দিয়ে গেল কী সেই 'নতুন টার্গেট'।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আলি মামলুকির রাহবার

সুন্নি জিহাদিস্টদের সঙ্গে আসাদের যোগসাজশ ও সহযোগিতার মোটিভ আসাদের জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক আলি মামলুকির চাইতে ভালো কেউ বলতে পারেনি। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সন্ত্রাসবিরোধী অপারেশনের সমন্বয়ক ড্যানিয়েল বেঞ্জামিন এবং সিরিয়ার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ফয়সাল আল মিকদাদের মধ্যকার এক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে মামলুকি পশ্চিমা কূটনীতিকদের চমকে দেন। তাঁর ভাষ্যমতে, তিনি আসাদের উৎসাহেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ আসাদ নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিলে সিরিয়া-আমেরিকা সম্পর্কোন্নয়ন করতে চান। ওবামা দায়িত্ব নিয়েই দামেস্কের সঙ্গে নতুন করে যাত্রা শুরুর অঙ্গীকার করেন।

সিরিয়া ইতিপূর্বে যে 'অস্থিতিশীলতা তৈরি'র নীতি নিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে মামলুক বলেন, এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ দমন করতে চাইলে সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক 'স্বাভাবিক' করতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নথি থেকে জানা যায়, মামলুক ও বাশার আল আসাদ ওয়াশিংটনের কাছে তিনটি আবদার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। যার সবগুলোই টনি বাদরানের কথাকে সত্য প্রতিপন্ন করে। এক. সিরিয়া যেকোনো আঞ্চলিক অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। দুই. সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় রাজনীতি একটি অব্যর্থ অস্ত্র। সুতরাং মার্কিন-সিরিয়ান দ্বিপক্ষীয় উন্নততর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সহায়ক হবে। তিন. এই চুক্তি সিরিয়ার জন্য কল্যাণকর, জনগণকে এই বুঝ দেওয়ার লক্ষ্যে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নিতে হবে। পাশাপাশি সিরিয়ান বিমানের জন্য পার্টস ও প্রেসিডেন্ট আসাদের জন্য স্পেশাল বিমান আমদানিতে বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।

তারপর মামলুক খুবই অদ্ভুত একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। জিহাদিস্টদের প্রতিরোধে তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন, 'এটি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল মেথড, থিওরিটিক্যাল নয়। যার সারকথা হলো, আমরা এখনই জিহাদিস্টদের হত্যা কিংবা গ্রেপ্তার করতে শুরু করব না। বরং এখন আমরা তাদের মাঝে নিজেদের লোক অনুপ্রবেশ করাব, তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারব।'

কিন্তু অতীত দশকগুলোতে দেখা গেছে, সিরিয়ান ঝোপ আর মার্কিনিদের 'ঝোপ' কখনোই খাপ খায় না! জিহাদি গ্রুপের মাঝে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ, এটা কি কোনো মুলা ছিল নাকি প্রচ্ছন্ন হুমকি? মামলুকের পরবর্তী পয়েন্টেই এর জবাব রয়েছে। তিনি ড্যানিয়েল বেঞ্জামিনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে এখনো বিদেশি যোদ্ধারা সিরিয়া হয়ে ইরাকে প্রবেশ করছে! আবু গাশিয়া হত্যাকাণ্ডের ১৬ মাস

পরে এবং বাগদাদে বিধ্বংসী ভিবিআইইডি হামলার সাত মাস পরে অবশেষে সিরিয়া স্বীকার করল যে যোদ্ধারা তাদের ভূমি ব্যবহার করছে।

মামলুক আরও বলেন, 'সিরিয়া সরকার ইতিমধ্যেই জিহাদিদের দমন করতে শুরু করেছে। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমরা তা চালিয়ে যাব। কিন্তু যদি আমরা পরস্পর সহযোগিতার হাত বাড়াই, তবে আরও ভালো ফলাফল আসবে এবং আমরা আমাদের স্বার্থ আরও বেশি রক্ষা করতে পারব।' আমেরিকান কূটনীতিবিদেরা সিরিয়াকে মাফিয়া গ্যাংয়ের সঙ্গে তুলনা করত। যা-ই হোক, মামলুক নবগঠিত হোয়াইট হাউসকে এমন একটি অফার দিয়েছেন, যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

অষ্টম অধ্যায়
পুনর্জন্ম : আবু বকর আল বাগদাদির নেতৃত্বে আইসিস

আইসিসের পত্রিকা দাবিকের বর্ণনা অনুযায়ী ১১ বছরের নিরলস সংগ্রাম অবশেষে সুমিষ্ট ও পরিপক্ব হতে শুরু করেছে। যার প্রথম ধাপ হচ্ছে ২০১৪ সালের জুনে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ। আবু উমর আল বাগদাদি মুজাহিদিনদের সহায়তায় আধুনিক যুগের প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। মুসলিমদের প্রাণের ভূমি মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেমের অদূরেই। সাহওয়া, সার্জ ও নিজেদের নেতাদের হারিয়ে তারা আনবারের মরু এলাকায় পশ্চাদপসারণ করে। এখানে তাদের সৈনিকেরা পুনরায় একত্র হয়েছে, প্ল্যান করেছে, প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

আল মাসরি ও আল বাগদাদির মৃত্যু

২০০৮-এর জুন মাসে স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টালের জায়গায় জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ডের দায়িত্বে আসেন ভাইস অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ম্যাকর‍্যাভেন। নেভি সিলের সদস্য। ২০১১ সালে তিনি অপারেশন নেপচুন স্পেয়ারের নেতৃত্ব দেন। এই অপারেশনে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনকে শহীদ করা হয়। ২০১০ সালে ওবামা প্রশাসনের নীতি ছিল—ইরাকে কম গুরুত্ব দিয়ে আল কায়েদা ও তালেবানের প্রধান ঘাঁটি আফগানিস্তানে বেশি মনোনিবেশ করা। তা সত্ত্বেও ম্যাকর‍্যাভান ইরাকে আল কায়েদার বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রথম অভিযানটি ছিল আবু খালাফ হত্যাকাণ্ড। আবু গাশিয়ার সমগোত্রীয়। অক্টোবরে তার মৃত্যুর পর আবু খালাফ শরিয়াভিত্তিক সহযোগিতা নেটওয়ার্কের দায়িত্ব নেন। পরবর্তী সময়ে একজন ইউএস কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'সম্ভবত খালাফই ছিল ইরাকে একিউআইর সবচেয়ে ভয়ংকর সমন্বয়ক। তার মৃত্যু একিউআইতে নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি করেছিল।' দ্বিতীয় ধাক্কাটা ছিল মানাফ আবদুর রহমান আর রাযির মৃত্যু। বাগদাদের আল কায়েদাপ্রধান। তাঁর অনুসারীদের মাঝে তিনি দ্য ডিক্টেটর নামে পরিচিত ছিলেন। আর রাযি বাথিস্ট ও সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। ২০০৯ সালে বাগদাদে ভয়াবহ সিরিজ

বোমা হামলা তিনিই চালিয়েছিলেন। এগুলোর টার্গেট ছিল মালিকি সরকার, মার্কিন সেনাবাহিনী নয়।

ইরাক কর্তৃপক্ষ তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি গোপন রেখেছিল। কিন্তু যখন মার্কিন বাহিনী তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়, তখন বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। আর রায়িকে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ করে দিতে তারা মালিকিকে বাধ্য করে। তিনি তাঁর নেটওয়ার্কের তথ্য দেন। দুজন বার্তাবাহকের নাম বলেন। জেএসওসি ২০১০ সালের এপ্রিলে বার্তাবাহকদের ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়। আনবার ও সালাহউদ্দিন প্রদেশের সীমান্তবর্তী সারসারাহ্ অঞ্চলে তাদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়।

বার্তাবাহকেরা যে সেফ হাউসে ছিল, সেখানে আবু আইয়ুব আল মাসরি ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি। বেজমেন্টের একটি গোপন কক্ষে আত্মগোপনে ছিলেন। শুধু একটি সুড়ঙ্গপথে সেই কক্ষে যাওয়া যেত। সুড়ঙ্গের গোপন প্রবেশপথ ছিল রান্নাঘরের সিঙ্কের নিচে। তাঁর সঙ্গে আরও একজনকে পাওয়া যায়। তাঁর পরিচিতি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে অনেকের ধারণা, তিনি ছিলেন আবু উমর আল বাগদাদি। অবশ্য এই নামে আদৌ কেউ রয়েছে কি না, নাকি এটি নিছক একটি কাল্পনিক চরিত্র, সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কাউন্টার টেরোরিজম বিশেষজ্ঞ লেইদ আলখৌরির মতে, 'তাদের হত্যাকাণ্ড ছিল আইএসআইর দুর্বলতার প্রমাণ। মাসরি মুসলিমদের সতর্কতা, সচেতনতা শেখাতেন। কীভাবে যোগাযোগব্যবস্থা নিরাপদ করতে হবে, কীভাবে মার্কিন আক্রমণ এড়ানো যাবে সেসব। একিউআইর নেতা হিসেবে জনসংযোগে তাঁর দক্ষতা ছিল বেশ পাকা। তাঁর অনুসারীদের জন্য তিনি একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছিলেন। এতে বৈশ্বিক জিহাদের রূপরেখা ধাপে ধাপে সবিস্তারে বর্ণিত ছিল, কীভাবে বিশ্বব্যাপী জিহাদ ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর অনুসারীদের ওয়েবসাইট হ্যাকিং শিখতে উৎসাহ দিতেন। পাশাপাশি বিজ্ঞান ও ইসলামি আদর্শের সমন্বয় সাধনের কথা বলতেন।

এ সময় আইএসআইর জনপ্রিয়তা ও শক্তিমত্তা একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কমান্ডারদের একের পর এক কৌশলগত ভুল সিদ্ধান্তের ফলে এই দশা হয়। নেতাদের ৮০ শতাংশ নিহত হন। তথাকথিত আবু উমর আল বাগদাদিকে আমির হিসেবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে 'ইরাকায়নে'র যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তা তেমন কাজে আসেনি। বাগদাদির খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি ছিল। সুন্নি বিদ্রোহীদের নামমাত্র নেতৃত্ব পেয়ে তিনি বর্তে গিয়েছিলেন। নিজেকে আমিরুল মুমিনিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, যা শুধু ইসলামিক শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তার প্রাপ্য। যেমন তালেবানের সাবেক প্রধান মোল্লা ওমরকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

আলখৌরির মতে, 'এই উপাধি ধারণ জিহাদিস্টদের মাঝে নেতৃত্বের প্রশ্নে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি করে, কে আসল আমির?' এই প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বাগদাদির উত্তরসূরি ইবরাহিম আওয়াদ আল বাদরির দৃশ্যপটে আসার আগ পর্যন্ত।

নতুন বাগদাদি

আল বাদরি, যাঁর নতুন ছদ্মনাম ছিল আবু বকর আল বাগদাদি। আইএসআইর শুরা কাউন্সিলের নিহত দুই নেতার পরবর্তীতে একক নেতা মনোনয়ন দেওয়া হয়। বলতে গেলে তিনি সহসাই ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছেন। ইরাক ও মার্কিন ইন্টেলিজেন্স তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে আইসিস সিরিয়া ও ইরাকের বিপুল অংশ দখল করে নেওয়ার পর। মিডিয়া তখন অজ্ঞাত এই বাগদাদির পরিচয় উদ্ধার করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে যা জানা যায়, এর বেশির ভাগই প্রোপাগান্ডা। পক্ষ-বিপক্ষ এসব ছড়িয়েছে আইমান আল জাওয়াহিরির চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠা খিলাফাহকে বিতর্কিত ও কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে। তবে পক্ষ-বিপক্ষ বিভক্ত হতে বেশ সময় লেগেছে।

লেইদ আলখৌরির ভাষায়, 'কেউ ভাবতে পারেনি সে আল কায়েদাকে টেক্কা দেবে। গোপন যোগাযোগে সে আল কায়েদা নেতা জাওয়াহিরির নিকট বাইয়াতের আবেদনই শুধু করেনি, বরং জানতে চেয়েছে বাইয়াত প্রকাশ্যে নেবে নাকি গোপনে। প্রত্যুত্তরে জাওয়াহিরি বলেন, বাইয়াত গোপনই থাকুক। এতে জটিলতা এড়ানো যাবে, আইএসআইর ওপর আন্তর্জাতিক চাপ কম আসবে।'

তাঁর জন্ম ১৯৭১ সালে। সামারা শহরের অদূরে। একজন ইসলামিক স্কলার ছিলেন। বাগদাদের উপশহর আদামিয়ায় ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্স ইন বাগদাদের ইসলামিক স্টাডিজ থেকে মাস্টার্স ও ডক্টরেট সমাপন করেন। তবচি শহরের স্থানীয় মসজিদ লাগোয়া সাদামাটা এক অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতেন। তবচি পশ্চিম বাগদাদের একটি শহর। শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায় বসবাস করে। তাঁর বাল্যবন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই বলেছেন, তিনি ছিলেন খুবই শান্তশিষ্ট, চাপা স্বভাবের। কোনো বিচারেই তিনি উগ্র কিংবা ধর্মান্ধ ছিলেন না। তাঁর বর্তমান ভাবমূর্তির সঙ্গে প্রথম জীবনের বাগদাদির কোনো মিল নেই। শুধু অনিয়ন নামের একটি পত্রিকা তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য দিয়েছে, সেটাও এক ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'প্রতিবেশীরা সিরিয়াল কিলারকে সিরিয়াল কিলার হিসেবেই জানত'। বাগদাদি চোখে চশমা লাগিয়ে, স্কুটারে চড়ে একজন স্কলারের মতোই চলাফেরা করতেন। আইসিস বিষয়ে এক্সপার্ট ডক্টর

হিশাম আল হাশিমি ইরাক সরকারের একজন উপদেষ্টা। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে তিনি বাগদাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'একজন নেতার ক্যারিশমা তার মাঝে ছিল না। আমি যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সে ছিল প্রচণ্ড লাজুক, উঁচু স্বরে কথা বলতে পারত না। বেশি কথাও বলত না। ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী ছিল, তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কোরআনুল কারিম। সাধারণ এক গ্রামীণ পরিবারের ছেলে ছিল। শহুরে পাংকুদের দুই চোখে দেখতে পারত না। তার স্বপ্নগুলোও ছিল সাদামাটা, ধর্ম মন্ত্রণালয়ে একটি সরকারি চাকরি হলেই ব্যস।'

বাগদাদির প্রতিবেশী আবু আলি তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ডেইলি টেলিগ্রাফকে বলেন, 'সে ১৮ বছর বয়সে তবচিতে এসেছিল। আমাদের মসজিদে একজন স্থায়ী ইমাম ছিল। ইমাম সাহেব কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থীরা নামাজ পড়াত। ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থী হিসেবে বাগদাদি কখনো কখনো নামাজ পড়িয়েছে কিন্তু বক্তৃতা দেয়নি।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে শুরু করেন। আবু আলি নামের প্রতিবেশী একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বাগদাদির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। 'সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়ে একসাথে নাচানাচি করছিল। পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বাগদাদি। এটা দেখে সে গর্জে ওঠে—ছেলেমেয়ে এভাবে একসাথে নাচানাচি করে কীভাবে? এটা অসভ্যতা। তিনি নাচানাচি বন্ধ করে দেন।'

ওয়ায়েল ইসসাম একজন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক। ইরাক বিষয়ে মূল্যবান রিপোর্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সে বাগদাদির সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের দাবি অনুযায়ী, মেট্রিক পাস করার সময় বাগদাদি হয়তো মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন কিংবা তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সালাফিজমের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ইসসামের ভাষায়, 'বাগদাদি মুহাম্মদ হারদানের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, হারদান হচ্ছেন মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা। তিনি মুজাহিদিনদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। নব্বইয়ের দশকে সেখান থেকে ফেরার সময় তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর সালাফি! বাগদাদি হারদানের সংগঠন ও আদর্শে দীক্ষিত হন। স্বল্প সময়ের জন্য সুন্নি বিদ্রোহী গ্রুপ জাইশুল মুজাহিদিনেও যোগদান করেন।'

২০০০ সালের দিকে বাগদাদির একটি ডক্টরেট ডিগ্রি ছিল, সঙ্গে ছিল বউ-বাচ্চা। ২০০৩ সালে আমেরিকা ইরাকে আগ্রাসন চালায়। আইসিসের ভবিষ্যৎ নেতা তখনো বিদ্রোহী ছিলেন না। আবু আলি টেলিগ্রাফকে বলেন, 'তখনো বাহ্যত মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তার তেমন ক্ষোভ ছিল না। রক্তগরম যুবকদের মতো ছিল না সে। বরং সে ছিল ধীরস্থির ও ঠান্ডা মাথার

পরিকল্পনাকারী।' সেই বছরের শেষ দিকে তিনি নিজের দল প্রতিষ্ঠা করেন—জাইশু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। পরের বছরই তিনি ভিন্ন ধাঁচের এক ইউনিভার্সিটিতে যান—ক্যাম্প বুকা।

পশ্চিমা মিডিয়ার বহুলচর্চিত দাবি হচ্ছে বাগদাদি ২০০৯ সাল পর্যন্ত ক্যাম্প বুকাতে ছিলেন। যখন এটি বন্ধ হয়, তখন তিনি মুক্তি পান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি এই অস্থায়ী ক্যাম্পে মাত্র এক বছর অবস্থান করেছিলেন। আল হাশিমি আমাদের বলেন, '২০০৪ সালে বাগদাদি ফালুজায় এক দোস্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল, দোস্তের নাম ছিল নাসিফ নুমান নাসিফ। সঙ্গে আরেকজন ছিল আবদুল ওয়াহেদ আস সুমাইর নামে। মার্কিন বাহিনী তাদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে। বাগদাদি তাদের টার্গেট ছিল না, টার্গেট ছিল নাসিফ। ৩১ জানুয়ারি ২০০৪ সালে গ্রেপ্তার হয় এবং সে বছরের ৬ ডিসেম্বর ছাড়া পায়। এরপর আর কখনো বাগদাদি গ্রেপ্তার হয়নি। বিপরীত যা আছে সব ভুল তথ্য।' আইসিসের সাবেক উচ্চপদস্থ নেতা আবু আহমেদ, বাগদাদির ক্যাম্প বুকার সাথি, গার্ডিয়ানকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কারা কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁকে একজন সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে ভেবেছিল। ইসলামিক স্টাডিজে তাঁর পিএইচডির কারণে তাঁকে বিচারক মানা হতো। বন্দীদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁর নিকট পাঠানো হতো। এ জন্য সব ব্লকে তাঁর খোলামেলা যাতায়াত ছিল। মার্কিনিরা তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিল বিভিন্ন ব্লকের বন্দীদের বিবাদ মীমাংসা করার। এই সুযোগে তিনি বেশি বেশি সৈন্য সংগ্রহে মন দেন। আবু আহমেদের মতে, এরপর তিনি নিজেই জেলখানায় সমস্যা তৈরি করতে শুরু করেন। তাঁর নীতি ছিল 'জয় করো ও বিভক্ত করো'। তাঁর এই পলিসি দারুণ কাজ করেছিল।

২০০৪ সালের শেষের দিকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেয়। কারণ তাঁকে মার্কিন কিংবা ইরাকি কর্তৃপক্ষের জন্য হুমকি মনে হয়নি। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ২০০৭ সালে জারকাবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিল, যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বিদ্রোহের 'ইরাকায়নের' লক্ষ্যে, এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। বাগদাদির কর্মচঞ্চলতা ও তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার ফলে স্বভাবতই তাঁর জন্য আদর্শিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত কোনো সংগঠনে কাজ করা সম্ভব ছিল না। এটি আল কায়েদা হলেও না।

ফালুজার একজন একিউআই কমান্ডার ইসসামকে বলেছেন, বাগদাদি যে সংগঠনেই যোগ দিয়েছেন, কদিন পরই সেখান থেকে চলে গেছেন। 'সে প্রথমে মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দেয়। কদিন পর তা ছেড়ে দেয় এবং অভিযোগ করে, তারা হচ্ছে মুরতাদ ও ইরাকে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জালমাই খলিলজাদের চর। সে জাইশুল মুজাহিদও ছেড়ে দেয় এবং তাদের বিরোধিতা শুরু করে। বিশেষত,

উত্তর-পূর্ব ফালুজার আল কারমাহ শহরে। বাগদাদি সর্বদা নিজ দল ব্যতীত অন্যান্য সুন্নি সশস্ত্র দলের ব্যাপারে কঠোর ছিল। তার মতে তাদেরকে প্রতিহত করা মার্কিনিদের প্রতিরোধ করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ভিন্ন মতাবলম্বী সুন্নিদের প্রতিহত করার ব্যাপারে বাগদাদির অনড় অবস্থান ইরাক ও সিরিয়ায় আইসিসের প্রভাব বিস্তারের অন্যতম কারণ। তাঁর মতে, সুন্নিদের পারস্পরিক ও অভ্যন্তরীণ সংঘাত হলো ফিতনা। এগুলো অবশ্যই দমন করতে হবে। প্রচলিত মিথ অনুযায়ী বাগদাদি ছিলেন ভুঁইফোড়। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। ইরাক ও মার্কিনি কর্তৃপক্ষ তাঁকে খুব ভালো করে চিনত। তাঁর চাচা ইসমাইল আল বাদরি ছিলেন ইরাকের মুসলিম ওলামা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। যদিও ভাতিজার মতে, এই সংস্থাটি ছিল 'মুরতাদ'। তাঁর শ্যালিকা ছিলেন ইরাকি ইসলামিক পার্টির এক নেতার স্ত্রী। ইরাকে ব্রাদারহুডের বাহন। মার্কিনিদের ইরাক ত্যাগের আগে শ্যালিকা-পতিকে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছে বাগদাদির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সুবাদে!

এ ছাড়া হাশেমির মতে, আইএসআইর নেতা হিসেবে বাগদাদির উত্থান ছিল বিস্ময়কর। শুরা কাউন্সিলের ১১ জনের মাঝে ৯ জনই তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর নির্বাচিত হওয়ার পেছনে তিনটি কারণ ছিল। এক. প্রথমত তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের। হজরত মুহাম্মদ সা. এর বংশধর হওয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁরা পরম শ্রদ্ধেয়। তাঁর পূর্বের নেতা আবু উমরও কুরাইশি হওয়ার দাবি করতেন। ইসলামি খিলাফাহর অধিকাংশ খলিফার ঝরনাধারা এই বংশ। দ্বিতীয়ত. বাগদাদি নিজেও শুরা কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। পূর্বতন নেতা উমরের নিকটজন। সবশেষে তাঁকে নেতা হিসেবে মনোনীত করা হয় বয়সের বিবেচনায়। অন্যান্য প্রার্থীর চেয়ে এক প্রজন্ম তরুণ ছিলেন। মার্কিন বাহিনী ইরাক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধদের চাইতে তাঁকেই আইএসআইর নেতৃত্বের জন্য অধিক উপযোগী মনে হয়েছে।

বর্তমানে আইসিস তাঁকে একক খলিফা হিসেবে শ্রদ্ধা করে। 'তোমরা এক নেতার পেছনে সারিবদ্ধ হও। তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে, কিংবা ফাটল ধরাতে যে-ই আসুক, তাকে হত্যা করো'—দাবিক এভাবেই সমস্ত মুসলিমকে তার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

সাদ্দামের দ্বিতীয় ছায়া

বাগদাদির উত্থানের ফলে আইএসআই আরও একবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, কিংবা বলা ভালো, সংগঠনটি সুন্নি বিদ্রোহের প্রারম্ভিক সময়ে ফিরে যায়। অনেক সাবেক বাথ-সদস্য সংগঠনের উচ্চপদে ছিল। ইরাকাইজেশনের অংশ হিসেবে

তাদের উপস্থিতি কখনোই কোনো বিতর্ক তৈরি করেনি। জেনারেল অদিয়ার্নো জুন ২০১০-এ পেন্টাগনে দেওয়া তাঁর ব্রিফিংয়ে বলেন, খুব অল্প সময়ের ভেতর একিউআইর শীর্ষ নেতৃত্ব ধসিয়ে দেওয়া হয়। ৪২ জন নেতার মধ্য থেকে ৩৪ জনকেই কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সংগঠনটি এতই ভঙ্গুর হয়ে যায় যে তারা পাকিস্তানে আল কায়েদার হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগের সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলে।

শীর্ষ নেতৃত্বের এই শূন্যতার ফলে দূরদেশ থেকে জাওয়াহিরি ও বিন লাদেন নতুন আমির নির্বাচন করার আগেই আল কায়েদার ইরাকি শাখা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। বাগদাদির নেতৃত্বে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বর্ণনায় আইএসআইর অভ্যন্তরীণ সংকটের চিত্র পাওয়া যায়, যা কয়েক বছর পর আল কায়েদার দুই বিক্ষুব্ধ সদস্য তাদেরকে বলেছিল। তাদের ক্ষোভের জায়গাটা ছিল বাগদাদির উত্থানের ফলে আইএসআইর ভেতর বাথিস্টদের উত্থান ঘটে। আইএসআই ছিল খাঁটি সালাফি জিহাদিদের সংগঠন, কিন্তু বাথিস্টদের সালাফিজম সম্বন্ধে জানাশোনা ছিল না। ফলে তাদের উত্থানে অভ্যন্তরীণ সংকট তৈরি হয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বাগদাদি একজন কাট্টা সালাফি ও তাকফিরি ছিলেন। কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি, কট্টরপন্থী বিদ্রোহীরাও তাদের ভিন্ন মতাবলম্বী মিত্রদের থেকে সহায়তা নিতে পিছপা হয় না, আদর্শিক দূরত্ব যতই থাকুক। বিশেষত, তাদের পারিবারিক ও গোত্রীয় সম্পর্ক, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার তারা প্রায়ই প্রয়োগ করত। বাগদাদিও কি তেমনই বাথদের থেকে ফায়দা লুটেছেন? তাঁর অতীতচারণ করলে সম্ভাবনার পাল্লাই ভারী।

ডেভিড হার্ভির ভাষায়, 'স্পষ্টতই সে জারকাবি থেকে ভিন্ন। কিন্তু তার সংগঠনের আকার-আয়তন, এর কার্যপরিধি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রশাসন পরিচালনা, আটটি আঞ্চলিক সরকার পরিচালনা, নকশবন্দী আর্মির সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক, গোত্রীয় সংযোগ, সবকিছু মিলিয়ে আমি এখানে বাথিস্টদের ছায়া খুঁজে পাই। তা ছাড়া ইজজাত নামের ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সে বাগদাদির একজন গুরু আদ-দৌরির খুব ঘনিষ্ঠজন ছিল। সিরিয়ায় আইসিসের উত্থানকালে আদ দৌরি রাক্কা (যা পরবর্তী সময়ে আইসিসের সিরিয়ান রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে) ও উত্তর-পূর্ব সিরিয়া থেকে নিয়মিত কমান্ড দিত।'

তা ছাড়া আল হাশিমি আরও একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বাগদাদি তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে সাদ্দাম সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। মার্কিন বাহিনীর একজন বর্তমান সদস্য আমাদের বলেছেন, 'আমি সাদ্দাম প্রশাসনের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে এখন আল মালিকির অধীনে কর্মরত। তাকে আমি বিশেষভাবে বাগদাদির ব্যাপারে

জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি তাকে চেনেন? ঠিক ততটা না, তবে আমি তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানি, সে যে সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক থেকে এসেছে, তা জানি। সাদ্দাম আমলে সে এবং তার পরিবার যেখানে থাকত, ওগুলো ছিল বাথিস্টদের আখড়া। সামারার লোকজনের সরকারের সঙ্গে খুব খাতির আর দহরম-মহরম ছিল। বাগদাদি যখন ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, তখন সেখানে পুরোদমে ফেইথ ক্যাম্পেইন চলছিল। ভিন্ন কথায়, ভার্সিটির ভর্তি সরাসরি বাথ পার্টির নিয়ন্ত্রণে ছিল। পার্টি-পরীক্ষায় উতরানো এবং পার্টির সুপারিশ ছাড়া সেখানে ভর্তির দ্বিতীয় কোনো সুযোগ ছিল না। পার্টির সুপারিশের জন্য কাজিন, চাচা, মামা থাকতে হবে এবং তারা সরকারের উচ্চপদে থাকতে হবে। সুতরাং বাগদাদি বাথিস্ট না-ও হতে পারে। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তার পরিবারের অনেকে পার্টির সদস্য ছিল, যারা তাকে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে সহায়তা করেছে।'

শুরুর দিকের আমেরিকাবিরোধী বিদ্রোহের মূল চালিকাশক্তি ছিল সুন্নিদের প্রতিশোধস্পৃহা। সুন্নিদের রাজনৈতিক উত্থানের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাথ পার্টির ইতিহাস পর্যালোচনা প্রয়োজন। বাথিজমের সূচনা হয়েছিল জামাল আবদুন নাসেরের প্যান আরব ন্যাশনালিজম (সর্ব-আরবীয় জাতীয়তাবাদ), সাইয়্যেদ কুতুব ও মুসলিম ব্রাদারহুডের ইসলামিজম এবং বিন লাদেনের সালাফিস্ট-জিহাদিজমের মোকাবিলায়। মূলত বাথদের ইসলামিক ফেইথ ক্যাম্পেইন ছিল সালাফিজমকে বাথিজমের ভেতর গ্রাস করে নেওয়ার প্রচেষ্টা। কিন্তু বর্তমানে আইসিসের খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ফলে বাথ পার্টির সেক্যুলার সোশ্যালিস্ট মতাদর্শ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সমকালীন ইরাক বিষয়ে দুজন বিশেষজ্ঞ—আমতজিয়া বারাম ও প্যাসাচ মেলোভ্যানি এই তত্ত্বকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রতত্ত্বে বিশ্বাসী। বাগদাদিকে তাঁরা দেখেন সাদ্দাম হোসেনের যথার্থ উত্তরসূরি হিসেবে। যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন, বাগদাদি যদিও সামারার অধিবাসী, কিন্তু যুদ্ধের ছদ্মনাম হিসেবে তিনি বাগদাদি উপাধি ধারণ করেছেন। ফলে বাগদাদ আইসিসের প্রধান শক্তিকেন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়। আব্বাসি খেলাফতকালে যা ছিল মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় রাজধানী। একই কারণে সাদ্দামের দৃষ্টিতেও এটি ছিল 'ইসলামিক কষ্টিপাথর', যার দ্বারা মুসলিমদের মন জয় করা সম্ভব।

সাদ্দাম যদিও নিজেকে খলিফা দাবি করেননি, কিন্তু আব্বাসি খিলাফাতের রাজধানী বাগদাদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি নিজের ডাকনামগুলোর একটি রেখেছিলেন 'আল মানসুর' অর্থাৎ আল্লাহর মদদপ্রাপ্ত। কিন্তু এটি ছিল আব্বাসি খিলাফাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খলিফার নাম। পাশাপাশি

সাদ্দাম তাঁর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য সামরিক ইউনিটের নাম রেখেছিলেন আব্বাসি খিলাফাতের ইতিহাস থেকে। সুতরাং ইরাকের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও বাগদাদ প্রশ্নে আবু বকর আল বাগদাদি ছিলেন সাদ্দামের ভাবশিষ্য।

ডেভিড হার্ভির ভাষায়, 'আমার দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা, কলাকৌশল, যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে আইসিসের কর্মকাণ্ড সাদ্দামের চেয়ে কোনো অংশেই ভিন্ন নয়'। শিয়াবিদ্বেষের ক্ষেত্রেও সাদ্দাম-বাগদাদি এক কাতারে। সাদ্দামের ৩০ বছরের শাসনামলে প্রায় দেড় লাখ শিয়া নিধন করা হয়। বিশেষত, ১৯৯১-এর মার্চে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর কুর্দি ও শিয়া এলাকায়, যখন তারা তার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে বছর নাজাফের পথে গড়িয়ে চলা ট্যাঙ্কগুলোর গায়ে লেখা ছিল 'লা শিয়া বা'দাল ইয়াউম' অর্থাৎ আজকের পর আর শিয়া খুঁজে পাবে না। তবে তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মতাদর্শ ও মাত্রায় ভিন্নতা ছিল। শিয়াদের সমূলে বিনাশ করা সাদ্দামের রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল না। এ জন্যই ১৯৯১ গণহত্যার পরও অনেক শিয়া সেনাবাহিনী ও বাথ পার্টির উচ্চপদস্থ নেতা ছিল।

পক্ষান্তরে বাগদাদি শিয়া নিধনে বিন্দুমাত্র কসুর করেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরোপুরি জারকাবির মতাদর্শের অনুসারী। আইসিসের দৃষ্টিতে শিয়ারা ধর্মচ্যুত, ধড়িবাজ, ঠগ—মৃত্যুই তাদের একমাত্র পরিণতি।

বাগদাদীর সহচরবৃন্দ

হার্ভির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আইসিস হাইকমান্ডের প্রায় বেশির ভাগই সাবেক কিংবা প্রতিশোধপরায়ণ বাথিস্ট। তারা ইরাকি মিলিটারি কিংবা মুখাবারাতের উচ্চপদে ছিল। রাষ্ট্রীয় এলিট। আল হাশিমি বাগাদাদির অকল্পনীয় অগ্রগতির পেছনে দুজন ব্যক্তির কৃতিত্ব দেখেন। প্রথমজন আবু আবদুর রহমান আল বিলাওয়ি, মূল নাম আদনান ইসমাইল নাজম। ২০১৪ সালের জুনে আইসিসের মসুল অবরোধের সময় তিনি নিহত হন। জারকাবির আমলেই তিনি একিউআইতে যোগ দেন। বাগদাদির আমলে তিনি জেনারেল মিলিটারি কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। ইরাকের পুরো ১৮টি প্রদেশের দায়িত্বে ছিল এই কাউন্সিল। পৈতৃক সূত্রে তিনি ছিলেন আনবারের খালিদিয়া এলাকার। সাদ্দামের সেনাবাহিনীর সাবেক ক্যাপ্টেন। তিনিও ক্যাম্প বুকার 'গ্র্যাজুয়েট', তবে সেটা বাগদাদির কারাবাসের এক বছর পর, বেশিও হতে পারে।

আল হাশিমির মতে, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আবু আলি আল আনবারি। মসুলের অধিবাসী এবং সিরিয়ায় আইসিসের অপারেশন ইনচার্জ। আইসিসে যোগ দেওয়ার আগে আল আনবারিও সাদ্দামের সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের মতে, তিনি আগে আনসারুল ইসলামে যোগ

দিয়েছিলেন, কিন্তু অর্থনৈতিক নয়ছয়ের অভিযোগে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়। ইরাক-সিরিয়ার বিদ্রোহীদের বিশ্বাস, আল আনবারি বাগদাদির ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে। নয়তো ইসলামি শরিয়াহর জ্ঞানে তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ অনেকেই ছিলেন।

আবু আইয়ুব আল ইরাকি, আইসিসের মিলিটারি কাউন্সিলের আরেকজন সদস্য। তিনি ছিলেন সাদ্দামের বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ইরাকি সেনাবাহিনীর হস্তগত হওয়া নথিপত্র থেকে এমনটাই জানা যায়। আবু মুহাম্মদ আল সুয়েইদাবি ছিলেন আরেকজন বাথিস্ট, যিনি মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দী ছিলেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ান। আলখৌরির ভাষ্যমতে, তাঁর এলাকা এতই নিরাপদ ছিল যে আবু আইমান আল ইরাকি সিরিয়ায় মাইগ্রেশনের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। 'সিরিয়ায় আইসিসের উত্থানকালে ইরাকি সেখানে চলে যায়। সে নিজে নিজে সিরিয়া যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আলেপ্পো ও লাতাকিয়ায় আইসিসের নেতা সে। অবশ্যই দার আজজুরের কোনো নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে তার আঁতাত আছে। বর্তমানে সে সিরিয়ান বিদ্রোহী উপদলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে।'

ক্যাম্প বুকা ও বাথ পার্টি থেকে 'গ্র্যাজুয়েশন' শেষ করা আরেকজন ছিলেন ফাদেল আহমেদ আবদুল্লাহ আল হিয়ালি। আবু মুসলিম আত তুরকমানি এবং হাজি মুতাজ নামেও পরিচিত। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল মার্টিন ডেমজি ঘোষণা করেন, মার্কিন বিমান হামলায় তুরকমানি নিহত হয়েছেন। মার্টিন ডেমজি ছিলেন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান। অবশ্য মুজাহিদিনদের দাবি, তিনি নভেম্বরেই মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি ছিলেন আনবারির সমপর্যায়ের নেতা। ইরাকি স্পেশাল ফোর্সের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলেন। ২০০৩ সালে আক্রমণের পর পল ব্রেমার ইরাকি সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়। তিনি ছিলেন মার্কিন কূটনীতিক, ২০০৩ সালের যুদ্ধের পর তিনি ইরাক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তখন তুরকমানি প্রথমে একটি সুন্নি বিদ্রোহী গ্রুপে যোগ দেন, পরবর্তী সময়ে একিউআইতে।

বাগদাদি আস সুয়াইদি ও তুরকমানিকে বাছাই করেন ক্যাম্প বুকায় থাকাকালীন। কখনো কখনো জটিলতা তৈরি হয়েছে ব্রেমার আর মালিকির নির্বুদ্ধিতার ফলে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৪ সালের আগস্টে মসুল পতনের পর সাদ্দামের সেনাবাহিনীর একজন সাবেক জেনারেল ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সে চাকরির আবেদন করেন। তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এখন আইসিসের এক সদস্য অভিযোগ করছেন যে সেনাবাহিনী তাঁকে

নেয়নি। 'আমরা অতি শিগগিরই তোমাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলব। এবং আমি তোদের সবগুলোকে টুকরা টুকরা করব।'

হার্ডি আমাদেরকে বলেছে, 'বাথিস্টদের কথা হচ্ছে তারা ইসলামের ওপর ভর করেই এখন ক্ষমতা পুনর্দখল করবে। সাদ্দামের চিঠিপত্র ও দিকনির্দেশনা এমনটাই বলে।' মার্কিন সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স অফিসার ও কুর্দিশ পেশমেরগার সাবেক উপদেষ্টা মাইকেল প্রিজেন্টের বক্তব্য হচ্ছে শীর্ষ নেতাদের পরিচয় নিয়ে লুকোচুরি আইসিসের যুদ্ধকৌশলের অংশ। 'তাদের পুরোনো মিত্রের মাধ্যমে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না। বাথিজম বেচে তেমন সদস্য পাওয়া যাচ্ছিল না, যাওয়া সম্ভবও নয়। বিশেষত, যখন সিরিয়ায় তারা বাথ পার্টি উৎখাতের চেষ্টা করছে। সোজা কথায়, প্রত্যেক সদস্যকেই এখন দ্বিমুখী সাপ হতে হবে। একদিকে সে নিজেই বাথিস্ট, আবার সিরিয়ায় লড়ছে বাথিস্টদের বিরুদ্ধে।'

তিবলিসি থেকে আলেপ্পো

বাগদাদি সাধারণত আইসিসের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিদেশি যোদ্ধাদের চেয়ে ইরাকিদের বেশি প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'লাল দাড়িওয়ালা জিহাদি' হিসেবে পরিচিত আবু উমর আশ শিশানি। অবশ্য জন্মসূত্রে তিনি 'তারখান ব্যাতিরাশভিলি', চেচেন বংশোদ্ভূত। বয়স ছিল বিশের কোঠায়। জর্জিয়ার প্যানকিসি গর্জ অঞ্চলে মার্কিন প্রশিক্ষিত জর্জিয়ান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে। ২০০৮ সালের রুশ-জর্জিয়া যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর কদিন বাদে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। তাঁর মিলিটারি ক্যারিয়ারের এখানেই ইতি। কথাগুলো বলছিলেন তাঁর বাবা তেইমুরাজ।

এমনিতে ব্যাতিরাশভিলির অধিবাসীরা সবাই খ্রিষ্টান। কিন্তু আশ শিশানি ছিলেন কট্টর মুসলিম। এমনকি যখন তাঁকে বলা হয়েছিল তাঁর বাবা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তখন তিনি ফোন রেখে দেন। অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে তিনি একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং কিছুদিন কারাবাস করতে হয়েছিল। সেখানেই কট্টর সালাফি হিসেবে তাঁর উত্থান। ২০১০ সালে জর্জিয়ার সাধারণ ক্ষমার আওতায় তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। তারপর বেশ কবার তুরস্ক ভ্রমণে যান। সুযোগ বুঝে একবার সীমান্ত অতিক্রম করে সিরিয়ায় চলে যান।

তাঁর বাবা তেইমুরাজ বিবিসিকে বলেছেন, 'সে যদিও সিরিয়া চলে গেছে তার বিশ্বাসের কারণে, কিন্তু আমি জানি এর পেছনে আমাদের দারিদ্র্য কাজ করেছে। আমরা গরিব বলেই সে সেখানে গেছে।' তাঁর প্রথম উত্থান ঘটে ২০১২ সালে।

সেই বছর তিনি নিজেই আল কায়েদা প্রভাবিত একটি জিহাদি সেল গঠন করেন—জাইশুল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার। এটি গঠিত হয়েছিল মূলত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা মুজাহিদিনদের নিয়ে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবির ধারণা অনুযায়ী, পাঁচ শতাধিক রাশিয়ান সিরিয়ায় যুদ্ধ করছে। আর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো থেকে আছে আরও কয়েক শ। তবে নিরপেক্ষ সূত্র থেকে তাদের এই পরিসংখ্যান যাচাই করা যায়নি। রাশিয়াকে আইসিস শত্রুরাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচনা করত, তাদের প্রোপাগান্ডায়ও সেসব থাকত। উদ্দেশ্য ছিল ককেশাস অঞ্চল থেকে আরও সদস্য সংগ্রহ করা।

বেশ কয়েকবার যুদ্ধক্ষেত্রে আশ শিশানির মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। কিন্তু এখন তিনি চেচনিয়ার যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট, পুতিনের শাগরেদ রমজান কাদিরভের মনোযোগ কেড়েছেন। ২০১৪ সালের নভেম্বরে কাদিরভ তাঁর ইনস্টাগ্রামে 'ইসলামের শত্রু' শিশানির মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন। তবে কিছুক্ষণ পরই আবার তা ডিলিট করে দেন। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আইসিসের নিকট তাঁর মূল্যায়ন মুহাজিরিনদের নেতা হিসেবে। চেচেনরা অন্য জিহাদিদের দৃষ্টিতে ঝানু যোদ্ধা হিসেবে শ্রদ্ধার্হ। রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও কঠোর গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারের একজন গবেষক ক্রিস হ্যারমারের মতে, 'আইসিস কমান্ডারদের মাঝে শিশানি সবচেয়ে দৃশ্যমানদের একজন। আইসিস যদিও বাগদাদি এবং বাথিস্টদের কমান্ড ও কন্ট্রোলে পরিচালিত হয়, কিন্তু চেচেন যোদ্ধাদের হিসাব আলাদা। কারণ আমি যদি আইসিসের মিলিটারি কাউন্সিলের সদস্য হতাম, তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে আত্মঘাতী হামলাকারী হিসেবে পাঠাতাম না, বরং তাকে প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দিতাম। এ জন্যই অন্যান্য বিদেশি যোদ্ধার চেয়ে চেচেনরা আলাদাভাবে মূল্যায়িত হয়।'

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়া সংঘাত পর্যবেক্ষণকারীদের নিকট শিশানি একজন জিনিয়াস হিসেবে সুবিদিত। তুখোড় সামরিক স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে বিবেচিত। বিশেষত, আলেপ্পোর মিনাগ এয়ারবেজ দখলে জাইশুল মুহাজিরিন ওয়াল আনসারের অসাধারণ কৃতিত্বের পর। আইসিসসহ অন্য বিদ্রোহী গ্রুপগুলো বেশ কয়েক মাস যাবৎ এটি অবরোধ করে রেখেছিল। তাদের কেউ কেউ বেজের ভেতরে দুঃসাহসিক আক্রমণও চালিয়েছে, কিন্তু সিরিয়ান সৈন্যদের পাল্টা প্রতিরোধে সেগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়।

অবশেষে শিশানির কৌশলে মিনাগের পতন হয়। তিনি দুজন আত্মঘাতী হামলাকারীকে ভিবিআইইডি সজ্জিত করে পাঠান। তারা এয়ারবেজের একদম কমান্ড সেন্টারে আক্রমণ চালায়। বিস্ফোরণে কমান্ড সেন্টার উড়ে যায়। মিনাগের

পতন হয়। মিনাগের পতন ছিল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। কারণ এর ফলে বিদ্রোহীদের মনোবল উত্তুঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে সরকারি বাহিনী হীনবল হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য তাঁর বীরোচিত কিংবদন্তি সমালোচনার মুখে পড়ে। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা কমরেডরাই তাঁর সমালোচনা করেছে। খালিদ শিশানির একটি সাক্ষাৎকার ২০১৪ সালের নভেম্বরে রেডিও ফ্রি ইউরোপ/রেডিও লিবার্টিতে সম্প্রচারিত হয়। তার মতে, উমর শিশানি ছিলেন একজন নির্বোধ ফিল্ড কমান্ডার। রাশিয়ান জিহাদি ফোরামের উদ্দেশে লিখিত এক বিবৃতিতে সে বলে, 'সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে উমর আশ শিশানি পুরোপুরি অথর্ব। সামরিক কলাকৌশলে তার জ্ঞানের ব্যাপক ঘাটতি ছিল। এগুলো সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করতে পারত না। এটা লিখে রাখুন যে ধর্মহীন পশ্চিমা মিডিয়াই তাকে সামরিক প্রতিভা হিসেবে প্রচার করেছে। তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে। সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। অথচ বাস্তবতা পুরোপুরি বিপরীত। সে শুধু জানত কীভাবে যোদ্ধাদের যমের মুখে ঠেলে দেওয়া যায়। এটুকুই।'

হতে পারে এই বিবৃতি 'আঙ্গুর ফল টক' কিংবা তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। তবে এ কথা সত্য যে শিশানির কিংবদন্তি সবচেয়ে বেশি প্রচার হয়েছে ডেইলি মেইলে, এমনকি জিহাদি সমরবিদদের চেয়েও বেশি। আলখৌরি আবার বলেছেন, অনলাইন জিহাদি ফোরামগুলোতে উমর শিশানি বহু কৌতুকের 'ভাঁড়'। কারণ, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অবস্থা শোচনীয়, আর আরবি ভাষাজ্ঞান ততোধিক শোচনীয়।

যোদ্ধা সংগ্রহের কৌশল

জারকাবির সময় থেকেই বিদেশি জিহাদিদেরকে নবযুগের সালাহুদ্দিন হিসেবে চিত্রিত করা শুরু হয়। এটি ছিল জিহাদিস্টদের সদস্য সংগ্রহের অন্যতম কৌশল। সাবেক কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তা রিচার্ডের মূল্যায়ন হচ্ছে, 'প্রথমত এসব বিদেশি যোদ্ধা কারা লক্ষ করেছ? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চপ্রিয় ছেলেপেলে, বাড়িতে যাদের হিসু করার কৌটাও নেই, চাই সে বেলজিয়াম, ম্যানচেস্টার, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, ইউকে কিংবা জর্জিয়া যেখানেরই হোক না কেন। তারা হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা মসজিদের বাইরে কোনো বক্তৃতা শুনেছে আর অমনি জিহাদ করতে দৌড় দিয়েছে। অবশ্য গোটা বিশ্বেই এ জাতীয় হুজুগে লোকদের সেনাবাহিনী তাদের চর কিংবা পাইক-পেয়াদা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। টিনএজ বাউন্ডুলে, অকর্মণ্যের ধাঁড়ি, যারা করার মতো যেকোনো কিছু একটা খুঁজছে। কারণ ঘরে বসে ছেঁড়ার মতো চুলও তাদের নেই।'

পশ্চিমা মিডিয়ার রোমাঞ্চকর কভারেজ এ ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রেখেছে। আইসিসের গ্ল্যামার তারা এমন রগরগে ভাষায় বর্ণনা করত যে ভ্যাগাবন্ড যুবকদেরও তা ঐন্দ্রজালিক মোহে আচ্ছন্ন করে ফেলত। জীবনে কী করলাম জাতীয় ভাবালুতায় হারিয়ে যেত। ষোড়শী, সুন্দরী, তন্বী অস্ট্রিয়ান তরুণীর কথাই বলা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মেয়ে এক জিহাদির প্রেমে পড়ে সিরিয়ার পথে পাড়ি জমায় জিহাদে যোগ দিতে। ভাগ্য মন্দ। পথিমধ্যে ধরা পড়ে যায়। প্রিয়ের সঙ্গে জিহাদ আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মিডিয়া এ ঘটনাকে এমন চটকদার শিরোনামে বর্ণনা করেছে, যেন ৮০ বছর বয়সী রেলমন্ত্রীর শুভ পরিণয়। ফলে আইসিসের মনস্তাত্ত্বিক আবেদন মানুষজনকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। তাদেরই মতো, তাদেরই বয়সী ছেলেপেলেরা কিসের নেশায়, কিসের আশায় সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বালি-পাথরের মরুভূমিতে ছুটে যাচ্ছে? কোন সে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা তাদের দলে দলে জিহাদের ময়দানে টেনে নিচ্ছে!

মিশিগান ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপোলজিস্ট স্কট অ্যাট্রেন জিহাদিজমের পেছনে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণগুলোর ওপর একটি সমৃদ্ধ গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসের রক্তাক্ত বিপ্লবগুলোর চেয়ে আইসিস কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। 'আপনি একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ হত্যায় কখনোই উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না এর পেছনে নৈতিক অনুরাগ তৈরি করছেন। এটা অনেকটা ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের মতো। যখন রোবসপিয়েরে দেখিয়ে দিলেন সন্ত্রাসবাদ ছাড়া গণতন্ত্র আনা সম্ভব নয়, রক্তারক্তিই জনগণের শাসন নিশ্চিত করার একমাত্র হাতিয়ার, জনতা সাড়ম্বরে, সোৎসাহে খুনোখুনিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

কে আইসিসে যোগ দেবে? ১৯৪০ সালে জর্জ অরওয়েল একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি একটি বইয়ের পর্যালোচনা করেছিলেন। একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। 'নৃশংস ও নির্বোধ এক রাজার দেশ, যেখানে তরুণদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া আর বলির পাঁঠার মতো তাদের জীবন নিয়ে তামাশা করা ছাড়া কিছুই হয় না। গণতন্ত্র যখন চারদিকে যুদ্ধ, বর্বরতার বিনাশে প্রয়াসী, সেখানে এই রাজা কীভাবে তার দানবিক দর্শন বাস্তবায়ন করবে, সে ভেবেছে কি? প্রজারাই-বা কেন তার চরণতলে জীবনার্ঘ্য সঁপে দিচ্ছে অথচ বিনিময়ে সে "ত্যাগ, ঝুঁকি ও মৃত্যু" ছাড়া কিছুই পাচ্ছে না। কেন?' অরওয়েল পর্যালোচনা করছিলেন 'মাইন ক্যাম্ফ' বইটি! সেখানে যে কারণে মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, আইসিসের পদতলেও একই কারণে জীবন উৎসর্গ করছে।

নবম অধ্যায়
অপহৃত বিপ্লব : জিহাদের সিরিয়া যাত্রা

৩১ জানুয়ারি ২০১১। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। তিউনিসিয়া, মিসর ও লিবিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিপ্লব নিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁর দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বেশ বাগাড়ম্বর করছিলেন। 'সিরিয়া খুবই স্থিতিশীল। কেন? কারণ বুঝতে হলে আপনি জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে হবে। এটিই প্রধান ইস্যু।' হ্যাঁ, বাশার আল আসাদ ঠিকই বলছিলেন, এটিই প্রধান ইস্যু। এই সাক্ষাৎকারের মাত্র তিন দিন আগে তাঁর সেনাবাহিনী মিসরের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশার্থে আয়োজিত এক মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি ভণ্ডুল করে দিয়েছে, দামেস্কের পুরোনো শহরের এক খ্রিষ্টান চত্বরে।

সাক্ষাৎকারের ১৭ দিন পর রাজধানীর পাশের আল হারিকা এলাকায় পুলিশ আর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাঝে ঝামেলা বাধে। পুলিশ এক ব্যবসায়ীর ছেলেকে হেনস্থা করে। বাজারে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। যদিও আন্দোলন অত্যন্ত সুচারুভাবে শুধু স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধেই হয়েছে, কিন্তু এর স্লোগান ছিল গভীর তাৎপর্যবহ : 'সিরিয়ার জনগণ আর লাঞ্ছিত হবে না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তড়িঘড়ি সেখানে যান। জনগণের ক্ষোভের কারণ উদঘাটন করতে সচেষ্ট হন এবং যা ঘটেছে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে এই বিক্ষোভ আপাতত স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। লিবিয়া-মিসরের আন্দোলনে জনতার সংহতি প্রকাশ, সেসব দেশে সরকারের নির্যাতন, দেশীয় স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে।

'জনগণ স্বৈরশাসকের পতন চায়'

শুরুটা ছিল সংস্কার আন্দোলন হিসেবে। শাসক পরিবর্তন জনগণের দাবি ছিল না। একদিন দিরা' শহরের কিছু স্কুলবালক স্কুলের দেয়ালে গণতান্ত্রিক গ্রাফিতি আঁকছিল। পুলিশ ১৫ জনকে ধরে নিয়ে যায়। এদের মাঝে ১০ বছরের বাচ্চাও ছিল। এই মহৎ কম্মটা সারা হয়েছিল আসাদের কাজিন জেনারেল আতেফ নাজিবের তত্ত্বাবধানে। এর পরই ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা অঙ্গার স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা দেশে, দাবানলের মতো।

স্লোগানগুলো বেশির ভাগই ছিল টিভি প্রোগ্রাম থেকে নেওয়া, অন্য দেশ সম্পর্কে। কিন্তু একটি ছিল খুব ক্রিয়েটিভ। 'এবার তোমার পালা, ডাক্তার!' আসাদ ছিলেন চোখের ডাক্তার, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার পরের ঘটনা আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। বন্দী শিশু-কিশোরদের অভিভাবকেরা জেনারেল নাজিবকে বলেছিলেন, 'তাদেরকে ছেড়ে দিন, এরা আমাদের একমাত্র সন্তান।' তাঁর জবাব ছিল, 'তোমাদের বউদেরকে আমার কাছে পাঠাও, নতুন সন্তান দিয়ে দেব।' এই আগুন দামেস্ক, হোমস, বানিয়া হয়ে অবশেষে গোটা সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ছিল সহিংস। সেনাবাহিনী, দাঙ্গা পুলিশ, মুখাবারাত ও আসাদপন্থী মিলিশিয়ারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী ও অ্যাক্টিভিস্টদের ঢালাও হত্যা শুরু করে। রাস্তায় রাস্তায় সরাসরি গুলি চলে। গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হিউম্যান রাইটসের তথ্যমতে, পুলিশ বন্দীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। পাইপ দিয়ে পেটানো, চাবকানো, বৈদ্যুতিক শক, এসিডে ঝলসে দেওয়া, নখ উপড়ে ফেলা, পায়ের তলায় বেত্রাঘাত, কৃত্রিম ফাঁসিসহ নানা স্টাইলের নির্যাতন। সব বয়সী ও সব লিঙ্গের বন্দীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

মুখাবারাতের কুখ্যাত কারাগারগুলোর একটি হচ্ছে দামেস্কের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ফিলিস্তিন ব্রাঞ্চ। সেখানে বন্দী থাকা এক নারী অন্য নারীদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা বিবিসিকে দিয়েছেন এভাবে : 'সে মহিলাটির যৌনাঙ্গের ভেতর একটি ইঁদুর ছেড়ে দিয়েছে। তার গগনবিদারী চিৎকার আকাশ কাঁপিয়ে তুলছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা ফ্লোরে দেখতে পেলাম রক্তের ধারা। সৈন্যটি তাকে জিজ্ঞেস করছিল, "কেমন হলো? ভালো হলো তো?" তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। পরে সে আর কখনো চলাফেরা করতে পারেনি।'

জেনারেল নাজিবের হুমকি বিফলে যায়নি। বিপ্লবের শুরু থেকেই ধর্ষণকে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভার্জিনিয়া-ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট ফারহা বারাজির ভাষ্য অনুযায়ী ধর্ষণের ফলে অনেকেই গর্ভবতী হয়ে যায়। সিরিয়ান গাইনি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তিনি পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পান, ১১ বছরের মেয়েও গর্ভবতী। ২০১২ সালের এপ্রিলে বারাজি তাঁর অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করেন।

'মেয়েটির নাম ছিল সালমা। হোমস শহরের বাবা আমর এলাকায় থাকত। অল্পবয়সী বাচ্চা মেয়ে একটা। আসাদের অনুগত ভাড়াটিয়া মিলিশিয়া শাবিহা তাদের বাড়িতে হানা দেয়। সে তাদের বলছিল, প্লিজ, প্লিজ, তোমাদের বাড়িতে বোন নেই? তোমাদের কি আম্মু নেই? আমাকে ছেড়ে দাও। নিদেনপক্ষে আব্বুর

সামনে না!' শাবিহা সদস্যরা সালমার বাবাকে তার নিজ বাড়িরই একটি চেয়ারে বাঁধে। তাকে দেখতে বাধ্য করে কীভাবে তার মেয়েকে তিন-চারজন মিলে খুবলে খেয়েছে। ধর্ষণ করেছে। বারাজি আরও বলেন, তারা তাকে চোখ বন্ধ করতে দেয়নি। চোখ খোলা রাখতে এবং দেখতে বাধ্য করেছে।

আমাদের নিকট কমবেশি ১১টা কেস ছিল প্রেগন্যান্সির। তাদের এবরশন প্রয়োজন ছিল। বাবা আমর কিংবা ইদলিব থেকে তাদেরকে আলেপ্পোতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। সেখানে গর্ভপাত তুলনামূলক নিরাপদ। এখন তারা সবাই নিরাপদে আছে। কিন্তু আমি যখন তাদেরকে ফোন দিই, তারা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো আচরণ করে। তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের ফলে তারা সবাই এখন ভয়াবহ ট্রমায় ভুগছে।

বারাজির সাক্ষাৎকারের পর কেটে গেছে তিনটি বছর। নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লাখে। বন্দী আছে আরও দেড় লাখ। সিরিয়ান মিলিটারি পুলিশের এক চিত্রগ্রাহক, সাংকেতিক নাম 'কায়জার'। চোরাই পথে তিনি প্রায় ১৫ হাজার ছবি চালান করেছেন দেশের বাইরে। সেগুলোতে রোমহর্ষক বন্দী নির্যাতনের চিত্র রয়েছে। 'সিরিয়াতে যা চলছে এককথায় ঢালাও গণহত্যা। এটি চালাচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সন্ত্রাসী—বাশার আল আসাদ।' ২০১৪ সালের জুনে মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া এক সাক্ষাতে কায়জার এসব বলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের যুদ্ধাপরাধ-বিষয়ক দূত স্টিফেন র‍্যাপের ভাষ্যমতে, তাঁর অনুসন্ধানে উঠে আসা একদম নিরেট প্রমাণাদি বলছে, সেখানে এত নির্মম-নিষ্ঠুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, যা নাৎসিদের পরে পৃথিবী দেখেনি।

হয়তো আসাদ নয়তো আমরা এ দেশ জ্বালিয়ে দেব

চেসলো মিলোজ তাঁর বিখ্যাত কবিতা চাইল্ড অব ইউরোপ-এ স্বৈরশাসকদের উন্মাদনা নিয়ে বেশ কিছু রসালো পঙ্‌ক্তি লিখেছেন। সেখানে একুশ শতকের মানুষের জন্য তিনি বলেছেন :

'Learn to predict a fire with unerring precision
Then burn the house down to fulfill the prediction'
শেখো অগ্নিশিখার নির্ভুল পূর্বাভাস
সিদ্ধিতে তা জ্বালাও তুমি নিজের আবাস

আসাদ এই নীতির যথার্থ অনুসরণ করেছেন। কয়েক মাসের সরকারবিরোধী বিক্ষোভে তিনি যখন বুঝতে পেরেছেন তাঁর গৃহদাহ শুরু হতে যাচ্ছে, তিনি নিজেই সেটা ভস্ম করে দিতে মনস্থির করেন।

বিপ্লবের শুরু থেকেই তিনি বিপ্লবীদের আল কায়েদা সন্ত্রাসী, সৌদি, আমেরিকা, কাতার ও ইসরায়েলের দালাল বলে চিহ্নিত করেন। দালালদের এত চমৎকার জোট আধুনিক ইতিহাসে অতিশয় দুর্লভ। যেসব মধ্যপন্থী শুধু সামান্য অর্থনৈতিক সংস্কার চেয়েছিল, দালালের তালিকায় তাদের নামও উঠে যায়। এই বিরামহীন ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য ছিল খুবই সোজা। যেমনটা আমরা আগেও দেখেছি, আসাদ সব সময় পশ্চিমাদের মনোযোগ আকর্ষণে মরিয়া ছিলেন। তাদের নেকনজর পেতে ব্যাকুল ছিলেন। এমনকি তিনি যখন তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন, তখনো। বিপ্লবের তোড়ে পড়ে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পশ্চিমাদের সেসব অপরাধের জন্য দায়ী করতে শুরু করেন, যেগুলো তিনি নিজেই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তিনি নিজের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করতে সচেষ্ট হন।

সরকার নিজেই সিরিয়ায় সহিংস ইসলামিক আন্দোলন আমদানি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কুসে জাকারিয়া একজন ফিলিস্তিনি শরণার্থী। দামেস্কের উপকণ্ঠে অবস্থিত মোয়াদামিয়া শহরে বসবাস করত। ২০১৩ সালের আগস্টে আসাদ এই শহরে ভয়াবহ রাসায়নিক আক্রমণ চালান। যারা সে যাত্রায় বেঁচে গেছে, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে মাসের পর মাস অবরোধ দিয়ে রাখেন। ক্ষুধায়, পিপাসায় বাকিরা মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হয়। কিন্তু জাকারিয়া বহু বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে এই মৃত্যুপুরি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 'প্রথম থেকেই যে নীতি চলে আসছে—যদি আপনি সুন্নি হোন, বিশেষত ফিলিস্তিনি, তবে আপনার সঙ্গে আচরণ হবে পশুতুল্য'—জাকারিয়া আমাদের বলছিল। 'লা ইলাহা ইল্লা বাশার—বাশার আসাদ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই—এটা ছিল শাবিহাদের স্লোগান। আন্দোলনকারীদের ধরে লাথিয়ে, চুলের মুঠি টেনে এসব বলতে বাধ্য করা হতো। এটি ছিল খুবই সুচিন্তিত পদক্ষেপ, অভিনবও বটে।' জাকারিয়ার কথার মর্ম হচ্ছে সুন্নিদের বিরুদ্ধে এই মৌখিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক বর্বর নির্যাতনের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া। তাদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করা।

লন্ডন কিংস কলেজের একজন উগ্রপন্থা বিশেষজ্ঞ, যিনি নিজেও একজন সাবেক ইসলামিস্ট, সিরাজ মাহের আমাদেরকে বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে আসাদ বিপ্লবীদের দমন করতে আলাভিদের ব্যবহার করেছেন। শারীরিক নির্যাতন তো ছিলই, সঙ্গে ছিল সুন্নিদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ। গোটা বিশ্ব সিরিয়ায় চলমান নির্যাতনে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। বিশেষত, এই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। আসাদ সুন্নি

মুসলিমদের মনে নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ফলে উপসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশি যোদ্ধা ছুটে আসতে থাকে।' কয়েক দশকের নির্যাতন, নিপীড়ন ও দুঃশাসনের পর এ ধরনের উসকানি খুবই ফলপ্রদ হয়েছে, সহজও বটে।

সিরিয়া-ইরাকে সাম্প্রদায়িকতা অতি প্রাচীন। বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ওপর সংখ্যালঘুদের শাসনক্ষমতার অনিবার্য ফল হলো এই সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব রাসুল সা.-এর মৃত্যুর পর থেকেই চলে আসছে। রাসুলুল্লাহর উত্তরাধিকার নিয়ে এই সংঘাতের সূচনা হয়। সিরিয়া শাসন করে আলাভিরা। তাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮-১৫ শতাংশ। অপরদিকে সুন্নিরা হচ্ছে ৭৫ শতাংশ। অবশ্য সাদ্দামের মতো আসাদ সরকারের উচ্চপর্যায়েও ভিন্নমতের মানুষ ছিল। আসাদের স্ত্রী আসমা আল আসাদ একজন সুন্নি। নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর উচ্চপদেও অনেক সুন্নি রয়েছে।

আন্দোলনের প্রথম দিকে কিছু সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায়ও এতে জড়িত ছিল। কিন্তু বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে সিরিয়ার জনমিতি। সরকারের চক্ষুশূল হয়েছে সুন্নিরা। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে আন্দোলনের। ফলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আসাদের সিরিয়ায় সাধারণ মানুষের মনেও ভয় ও অনিশ্চয়তা চেপে বসে।

২০১০ সালে নিবরাস কাজিমি অবিশ্বাস্য রকম ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন—সিরিয়া থ্রো জিহাদিস্ট আই : অ্যা পারফেক্ট এনিমি। সিরিয়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর অনেকগুলো সাক্ষাৎকারের সারনির্যাস। কাজিমি দামেস্কে জন্ম নেওয়া এক প্লাস্টিক সার্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন আলাভি সম্প্রদায়ের। হাফিজ আল আসাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সিরিয়ান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার। এই সার্জনকে আসাদের সুবিধাভোগী, লেবানিজ মিলিশিয়া গ্রুপ হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহর সঙ্গে এক ফটোতে দেখা গেছে।

সাদাচোখে দেখলে এই সার্জন সিরিয়ান উচ্চ-মধ্যবিত্তদের আদর্শ নমুনা। সমাজে তাঁর স্থান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে পুরোমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে? তিনি যখন তাঁর পুরোনো মডেলের ভলবোটা ড্রাইভ করেন, পেছনের সিটে সব সময় একটা হাতে বহনযোগ্য মেশিনগান রাখতে হয়। তাঁর ভাষ্য, 'আপনি কি জানেন, সুন্নিরা বলে "মালাউন" (অভিশপ্ত) বাবা হাসান? বাবা হাসান কে জানেন? আলি রা.। হাসান-হোসাইনের পিতা। দ্বাদশ শিয়া

ইমামের প্রথমজন।[১৪] তারা আমাদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে, সুযোগ পাওয়ামাত্রই আমাদের ঢালাও হত্যা করবে।'

শিয়াদের এই ভীতি থেকে গড়ে ওঠে প্রতিবিপ্লব। মাহেরের ভাষ্য, 'অত্যন্ত সুচতুরভাবে আসাদ এখানে সাম্প্রদায়িকতা লালন-পালন ও পুষ্ট করে তুলেছে। তার নিপীড়নের সহযোগী হিসেবে। এটি কোনো শান্তিপূর্ণ গণ-অভ্যুত্থান নয়, এটি পুরোমাত্রায় সাম্প্রদায়িক। সুন্নিরা জেগে উঠছে। কারণ তারা সব সংখ্যালঘু বিনাশ করতে চায়। এটি প্রতিবিপ্লবের প্রধান আখ্যান। আসাদের মূল লক্ষ্য এখন দুটি। এক. সুন্নি বিদ্রোহীদের থেকে সিরিয়ার অবশিষ্ট সম্প্রদায়কে দূরে রাখা। আলাভি ও খ্রিষ্টান ভিন্নমতাবলম্বীরা যেন তাদের সঙ্গে ঘোট না পাকায়। যদিও অনেকেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। দুই. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করা যে সিরিয়ায় সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সন্ত্রাসীদের পাইকারি হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে।'

এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় দোসর ছিল শাবিহা। সিগারেট থেকে শুরু করে ড্রাগ, অস্ত্র সবই তারা সিরিয়ান ব্ল্যাক মার্কেটে সাপ্লাই দিত মার্সিডিজ শাহাব গাড়িতে করে। এ জন্য তাদের নাম পড়ে যায় শাবিহা। বিপ্লবের বহু আগে থেকেই তারা ব্ল্যাক মার্কেটের মাফিয়া। পেশিশক্তিনির্ভর এই দলটি ছিল মূলত আলাভিদের। মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দামেস্ক তাদেরকে ভাড়া করে। ২০১২ সালে বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী থাকা এক শাবিহার বর্ণনা অনুযায়ী শাবিহার প্রত্যেক সদস্যকে সরকার মাসিক ৪৬০ ডলার করে বেতন দিত। পাশাপাশি প্রতিটি হত্যা কিংবা বন্দীর বিনিময়ে ১৫০ ডলার করে বোনাস দেওয়া হতো। 'আমরা আসাদকে ভালোবাসি, সে আমাদের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছে। আমি যা চাই তাই নিয়ে নিতে পারি। চাইলে কাউকে হত্যা করতে পারি। সুন্দরী মেয়েকে মনে ধরলে কোনোরূপ দায় ও জবাবদিহি ছাড়াই ধর্ষণ করতে পারি।'

২০১২ সালের মে মাসে হোমসের হাউলা শহরে শাবিহাকে সিরিয়ার নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হয়। তালদু শহরে তারা রীতিমতো নারকীয় তাণ্ডব চালায়। তীব্র আর্টিলারি বম্বিংয়ের পর তারা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায়। শত শত মানুষকে জবাই করে হত্যা করে। বেশির ভাগই ছিল নারী ও শিশু। স্থানীয়রা শাবিহাদের খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারত। সিরিয়ান সেনাবাহিনী কালো বুট পরত। শাবিহারা ব্যবহার করত সাদা স্নিকার। আসাদ এই গণহত্যার জন্য

---

[১৪] সুন্নি মুসলিমদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হজরত আলি রা.। আশারায়ে মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জনের একজন, যাঁদেরকে আমরা খোলাফায়ে রাশেদিন বা সুপথপ্রাপ্ত খলিফা হিসেবে মানি। চার খলিফার একজন তিনি। তাঁরা গোটা উম্মাহর শিরোমণি। সুতরাং মন্তব্যটি সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শিয়া লোকটির মতের প্রতিফলন, সুন্নিদের আকিদার নয়। (অনুবাদক)

কালবিলম্ব না করে আল কায়েদাকে দায়ী করেন। কিন্তু জাতিসংঘের তদন্তে বেরিয়ে আসে, 'এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে এই গণহত্যায় সরকারি বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।'

সে সময় স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি পূর্বসতর্কতামূলক বিবৃতি দিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে যা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় এবং আসাদের প্রধান কৌশল হয়ে দাঁড়ায়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেছিলেন, 'এই গণহত্যায় ইরান সম্পৃক্ত। ইরানিরা সার্বিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে সিরিয়ান বাহিনীকে সহায়তা করেছে। কিন্তু শাবিহারা ছিল হুবহু ইরানি বর্গিদের মতোই ঠগ। শাবিহা আর বাসিজ মিলিশিয়া মাসতুতো ভাই। (বাসিজ মিলিশিয়া ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের অঙ্গসংগঠন, একটি স্বেচ্ছাসেবী মিলিশিয়া গ্রুপ। ইরাক-ইরান যুদ্ধে লড়ার জন্য এটি গঠন করা হয়।) ইরানিরা নিজ দেশে মানবাধিকার দমন করতে যে কৌশল ও অস্ত্র ব্যবহার করে, শাবিহারা ঠিক তা-ই করেছে।' নুল্যান্ড আরও বলেন, যে সপ্তাহে হাউলা গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, ঠিক সে সপ্তাহেই ইরানি কুদস ফোর্সের ডেপুটি কমান্ডার ইসমাইল গানি দাবি করেন, সিরিয়া যুদ্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কৃতিত্ব রয়েছে।

সুলেইমানির যুদ্ধ

ইরানের যোগসাজশ দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছে। কুদস ফোর্স ও লেবনিজ হিজবুল্লাহ সিরিয়া ও ইরানে বাসিজ মিলিশিয়ার চেয়েও পেশাদার খুনি বাহিনী গঠন করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে—ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স। সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লাখ। আসাদ যখন বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে ও হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন, তখন এই ন্যাশনাল ডিফেন্সই তাঁর অন্ধের যষ্ঠি হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আসাদ রেজিমের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য চলমান গৃহযুদ্ধেও ছায়া ফেলেছে। আর্মির বহু সদস্য ছিল সুন্নি। তারা হয়তো পক্ষ ত্যাগ করেছে, পালিয়ে গেছে কিংবা খোদ নিজেদের অফিসার কর্তৃক ব্যারাকে বন্দী হয়েছে। কারণ আলাভি কমান্ডারদের ভয়ে তারাও হয়তো পালিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেবে। অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্যরা তিন বছরের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছে।

রেভল্যুশনারি গার্ডের কর্মকর্তা সাইয়েদ হাসান এন্তেজারি ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের উৎপত্তি ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'সিরিয়ান সেনাবাহিনীর তিন বছরব্যাপী এই সংকট সামাল দেওয়ার সক্ষমতা ছিল না। কারণ যেকোনো সেনাবাহিনীই ক্লান্ত হয়ে যাবে। এ সময় ইরান এগিয়ে আসে। তারা আসাদকে বলল, তুমি কেন তোমার সমর্থকদের নিয়ে বাহিনী গঠন করছ না?

জনগণকে তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলো। আমাদের ছেলেরা (ইরানিরা) আলাভিদের সহায়তায় এগিয়ে এল। তারা গোত্রনেতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বোঝাতে লাগল যেন তারা তাদের যুবকদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে উৎসাহ দেয়। সরকারের সহায়তায় এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।'

ন্যাশনাল ডিফেন্সের প্রতিটি ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে ছিল রেভল্যুশনারি গার্ডের একজন করে কর্মকর্তা। তাদের দায়িত্ব ছিল আদর্শিকভাবে সৈন্যদের চাঙা রাখা। মনোবল ধরে রাখা। ২০১৩ সালের এপ্রিলে রয়টার্স রেভল্যুশনারি গার্ডের এই ক্যাডেটদের বেশ কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। তাদের বেশির ভাগই ছিল হোমসের এবং আলাভি। কিছু অবশ্য অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও ছিল। এমনই একজন ছিল সামির। হাতে গোনা কয়েকজন খ্রিষ্টানের একজন। ইরানে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। রয়টার্সকে সে বলেছে, 'এই যুদ্ধ সুন্নিদের বিরুদ্ধে নয়, এটি সিরিয়ার ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে—এ কথা বলে বলে ইরানিরা আমাদের কান ঝালাপালা করে ফেলেছে। কিন্তু সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল, আলাভিরা বলছে, আমরা সুন্নিদের হত্যা করতে চাই আর তাদের ষোড়শী কন্যাদের "খেতে" চাই।"

সামির যে ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সেটির নাম আমিরুল মু'মিনিন। তেহরানের ৫০ মাইল দূরে। কুদস ফোর্সের ব্যালিস্টিক মিসাইল এখানেই স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে এক ইরানি সেনা অফিসার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেন, 'প্রশিক্ষণার্থীদের বলা হয়েছিল সিরিয়াযুদ্ধ শিয়া মতবাদের মহাযুদ্ধ। এতে যারা শহীদ হবে, তারা শাহাদাতের উচ্চ মাকাম পাবে।' ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এখনো সুন্নিবিরোধী কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সমুদ্রতীরবর্তী তুরতুস প্রদেশের বানিয়াস ও বাইদা শহরে মোতায়েন করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মে মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সরেজমিন প্রদক্ষিণের পর তারা নিশ্চিত করে, 'সরকার ও সরকার-সমর্থিত গ্রুপগুলো হুটহাট ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। নারী, পুরুষ ও শিশুদের আলাদা করে ফেলছে। পুরুষদের আশপাশে কোথাও জমা করে ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মেরে ফেলছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার-সমর্থিত গ্রুপগুলো মৃতদেহ আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।'

বানিয়াস ও বায়দা শহরটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত। কিন্তু স্থানীয় খ্রিষ্টানদের বক্তব্য হচ্ছে সরকারপন্থীরা খুঁজে খুঁজে শুধু সুন্নিদের হত্যা করেছে, তাদের ঘরই শুধু পুড়িয়েছে। ওদিকে সরকারের ভাষ্য ছিল, তারা খুঁজে খুঁজে সন্ত্রাসীদের একটু শায়েস্তা করেছে। ইরানের বর্তমান সিরিয়া পলিসি অনেকটা মার্কিন দখলকৃত ইরাক পলিসির মতো। সেখানেও ইরান এখন মার্কিনিদের দোসর। পার্থক্য একটু আছে বটে। ইরাকে সে দখলদারদের চ্যালা কিন্তু সিরিয়ায় নিজেই দখলদার। আর এই দখলযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে অপেশাদার, উচ্ছৃঙ্খল এক বাহিনীর ওপর নির্ভর করে।

আসাদের বীরসেনানিরা যত বেশি ধ্বংস ও নিহত হচ্ছিল, যুদ্ধ ছেড়ে পালাচ্ছিল, সুলেইমানির ভাড়াটিয়া মিলিশিয়াদের গুরুত্ব ততই বাড়ছিল।

ফলে ইরানি উচ্চপদস্থ সামরিক পাণ্ডাদের হতাহতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছিল সমানতালে। যেমন কুদস ফোর্সের হাসসান শাতির। দামেস্ক-বৈরুত হাইওয়েতে সে নিহত হয়। ইরান শুধু রেভল্যুশনারি গার্ডের ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আইআরজিসির গ্রাউন্ড ফোর্সও পাঠিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভিন্নমত দমনে তাদের কুখ্যাতি বিশ্বজোড়া। এবং ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আজারবাইজানে স্থানীয় আজারবাইজানিদের হত্যার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আইআরজিসির বহু সদস্য, গ্রাউন্ড ফোর্সের এক ব্রিগেড কমান্ডারসহ ৪৮ জন ইরানি অফিসার বিদ্রোহীদের হাতে আটক হয়েছিল। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে এক বন্দিবিনিময় চুক্তির আওতায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউট ফর স্টাডি অব ওয়ারের প্রকাশিত এক রিপোর্টে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য বেরিয়ে আসে—ইরান সিরিয়াতে মার্কিন কৌশল অনুসরণ করছে, যা মার্কিনিরা ইরাকে প্রয়োগ করেছিল।

হোমস শহরটি সিরিয়ান বিপ্লবের জন্মভূমি। ২০১২ সালে এটি সিরিয়ান বাহিনীর নির্মম অবরোধের কবলে পড়ে। বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সরকার ১০ ফুট উঁচু কংক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করে দেয়, যা মার্কিন বাহিনী ২০০৮ সালে সদর সিটির চারপাশে করেছিল। সে সময় ইরাকে থাকা ইরানি প্রক্সিরা মার্কিন ওই প্রোগ্রামের সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আসাদকেও একই কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দেয়।

সাবেক সিরিয়ান প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ হিজাব ২০১২ সালের আগস্টে পদত্যাগের পর ঘোষণা দেন, 'সিরিয়া এখন ইরানের উপনিবেশ। বাশার আল আসাদ দেশ শাসন করছে না, বরং দেশ চলে কাশেম সুলেইমানির ইশারায়। ইরানি কুদস ফোর্সের প্রধান।' ২০১১ সালের মে মাসে জেনারেল কাশেম সুলেইমানি এবং তাঁর ডেপুটি মোহসেন সিজারির ওপর মার্কিন সরকার অবরোধ আরোপ করে। এই সিজারিই ২০০৬ সালে ইরাকে জয়েন্ট সিকিউরিটি অপারেশন কমান্ডের হাতে ধৃত হয়েছিলেন। অবরোধের কারণ ছিল 'ষড়যন্ত্র... মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সিরিয়ান জনগণের ওপর নিপীড়নে জড়িত থাকা।'

সুলেইমানি ছিলেন ইরানের সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেটের রসদ সরবরাহের পাইপলাইন। পরবর্তী সময়ে এই সরবরাহ লাইন ধরা পড়ে যায়। এর মাধ্যমেই অস্ত্র, গোলাবারুদ ও কুদস ফোর্সের সদস্যদের চালান করা হতো। ইরাকের বিমানঘাঁটি থেকে যাত্রীবাহী ও সামরিক বিমানে করে এগুলো দামেস্ক যেত। ওয়াশিংটন থেকে বাগদাদের নিকট বেশ কয়েকবার অভিযোগ জানানো হয়,

এই সাপ্লাইলাইন বন্ধ করার জন্য। কিন্তু মালিকি সরকার এ ধরনের কোনো আকাশ করিডর থাকার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করে। অবশেষে ২০১২-তে এসে ইরাক অস্বীকৃতি বন্ধ করে এবং বলে আকাশপথে শুধু 'মানবিক সহায়তা' প্রেরণ করা হচ্ছে। আরও বলে, আমেরিকা অস্ত্র চোরাচালানের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইরাক হয়ে সিরিয়ায় ইরানি চোরাচালান পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুলেইমানির চামচা ছিলেন হাদি আল আমিরি। বদর বাহিনীর প্রধান। এই বাহিনীর কুকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেই ২০০৪ সালে জারকাবি সুন্নি যোদ্ধা সংগ্রহ করেছিলেন। এখন ২০১৩ সাল, আল আমিরি ইরাকের পরিবহনমন্ত্রী। এই যোগসাজশের কারণে ইরাক থেকে সিরিয়ায় রপ্তানি হওয়া বিদ্রোহ শুধু সুন্নি-বিপ্লবের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইসরায়েলের মেইর আমিত ইন্টেলিজেন্স ও টেরোরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের হিসাবমতে, সিরিয়ায় সুন্নি বিদেশি যোদ্ধাদের চেয়ে শিয়া বিদেশি সন্ত্রাসীদের সংখ্যা ঢের বেশি। তারা ছিল আসাদের দোসর।

***

জাফর আসহাব ২০১২ সালে সিরিয়ায় নিহত হয়। সে ছিল আসাইবে আহলে হক নামের এক ইরাকি শিয়া মিলিশিয়া গ্রুপের সদস্য। ২০০৭ সালে ইরাকের কারবালায় আমেরিকান কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের জন্য এই গ্রুপকে দায়ী করা হয়। সিরিয়ায় তার মৃত্যুর পর মরদেহ বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। ইরাকের সিকিউরিটি ফোর্সের তত্ত্বাবধানে তাহরির স্কয়ারে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। কাতায়েব হিজবুল্লাহও সিরিয়ায় তাদের প্রচুর শিয়া মিলিশিয়া হারায়। মুকতাদা আল সদরের মাহদি আর্মি সিরিয়ায় শিয়া-আলাভি স্পেশাল ফোর্স গঠন করে। এতে ছিল পাঁচ শতাধিক ইরাকি, সিরিয়ান ও অন্যান্য দেশের সদস্য। নাম ছিল আবুল ফজল আব্বাস ব্রিগেড। স্পেশাল গ্রুপ বিশেষজ্ঞ ফিলিপ স্মিথ ২০১৩ সালের আগস্টে এক ডকুমেন্টে লেখেন, বদর বাহিনী নিজ ফেসবুক পেজে জানায়, সিরিয়ায় তাদের দেড় হাজারের মতো সদস্য রয়েছে। নিহত সদস্যদের জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী বেশির ভাগ সদস্যই আসাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, তবে তারা প্রতিরোধযুদ্ধে ছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল 'পবিত্র মাজারগুলোকে' রক্ষা করা। শিয়া-আলাভি গ্রুপের অনেককেই বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, যেমন দামেস্কের উপকণ্ঠে সাইয়্যেদা জয়নব মসজিদ। এসব ধর্মীয় স্থাপনার জিম্মাদারির ফলে তাদের মাঝে সাম্প্রদায়িক

ভাবাদর্শ প্রকট হয়। সুলেইমানির বিপ্লববিরোধী আন্দোলন এখন শিয়াদের পবিত্র যুদ্ধের আবহ লাভ করে।

ইরান কয়েক হাজার আফগান শরণার্থীকেও সিরিয়ায় পাঠিয়েছে। মাসে ৫০০ ডলার বেতন প্রদানের পাশাপাশি স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রদানের লোভ দেখানো হয়। কিছু সাবেক তালেবান যোদ্ধাকেও পাঠায় তারা। তাদেরকে বলা হয়েছে, 'মার্কিন মদদপুষ্ট' বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠানো হচ্ছে। তবে লেবানিজ হিজবুল্লাহ যেভাবে আসাদকে সহায়তা করেছে, আর কোনো গ্রুপ তত করেনি। তারা বলতে গেলে একাই সিরিয়া-লেবানন সাপ্লাই করিডরে অবস্থিত কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর আল কুসাইর থেকে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়েছে। হিজবুল্লাহ 'এনওডব্লু লেবানন নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করে, 'আল কুসাইর অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে হিজবুল্লাহ। সিরিয়ান আর্মি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা শুধু কোনো এলাকা পুরোপুরি "পরিষ্কার" হয়ে গেলে সেটার নিরাপত্তা দেখভাল করছে।'

'পরিষ্কার' মানে হচ্ছে জাতিগত নিধন। সুন্নিদের সমূলে বিনাশ। 'হোমসের বিভিন্ন এলাকায় জাতিগত নিধনের প্রমাণ পাওয়া গেছে'—সিরিয়ান অ্যাক্টিভিস্ট আবু রামি ২০১৩ সালের জুলাইতে গার্ডিয়ানকে বলছিলেন। 'এটি ইরানের বৃহত্তর শিয়া প্রকল্পের অংশ। হিজবুল্লাহ ও ইরান যৌথভাবে তা বাস্তবায়ন করছে। অবশ্য এটি আসাদের ব্যক্তিগত আলাভি-রাষ্ট্র পরিকল্পনারও অংশ বটে।' আসাদের স্বপ্ন ছিল সিরিয়ান উপকূল ঘেঁষে একটি আলাভি রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু যখন তিনি ক্রমাগত ভূখণ্ড হারাতে শুরু করেন, তখন চতুরতার আশ্রয় নেন। দামেস্কের পতন হলে তিনি তাঁর উপকূলীয় রাষ্ট্র বিনির্মাণ করবেন বলে প্রকাশ করেন। এর দ্বারা পশ্চিমে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেন যে সর্বদাই তিনি আলাভিদের রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সুন্নিদের নিধনযজ্ঞের মোকাবিলায়! এর মাধ্যমে সুন্নিদের অপরাধী আর শিয়াদের 'নিরীহ' ভিক্টিম সাজিয়ে ফেলেন।

বাশারের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার

২০১১ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া আসাদের সাক্ষাৎকারের মিষ্টি মিষ্টি কথার বিপরীতে তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গণ-অভ্যুত্থানের পর এটিই ছিল প্রথম সাক্ষাৎকার। এতে তিনি চূড়ান্ত লড়াইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 'সিরিয়া এখন এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র।' সানডে টেলিগ্রাফকে তিনি বলেছেন, 'সিরিয়া হলো টেকটোনিক প্লেটের ফাটল, এখানে খেলতে গেলে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে যাবে। আপনারা কি আরেকটি আফগানিস্তান দেখতে

ইচ্ছুক? কিংবা ডজন ডজন আফগানিস্তান? সিরিয়ায় কোনো ঝামেলা হলে গোটা অঞ্চল ছাই হয়ে যাবে।'

আবারও আগুনের উপমা। কিন্তু অগ্নিসংযোগটা কে করেছে তার কোনো উল্লেখ রহস্যময় সেই সাক্ষাৎকারে ছিল না। তবে তাঁর বাগাড়ম্বর বৃথা যায়নি। ন্যাটো ও ওয়াশিংটন সিরিয়ায় নো ফ্লাই জোন এবং সেফ এরিয়া প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি তারা আসাদের শত্রুদের ব্যাপারেও সতর্ক প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলে। তবে সেটা ততটুকু, যতটুকু কোনোভাবেই 'আসাদকে চটাবে' না। হিলারি ক্লিনটন সরকারি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরপরই ন্যাশনালিস্ট কিংবা সেক্যুলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিত্রতা না করার কারণে ওবামাকে অভিযুক্ত করেন এবং আইসিসের উত্থানের জন্য তাঁর এই কৌশলগত ব্যর্থতাকে দায়ী করেন।

কিন্তু ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন তিনি সেক্রেটারি অব স্টেট ছিলেন, সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা আল কায়েদাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। জারকাবি সিরিয়ায় বিরোধী দলগুলোকে উসকে দিচ্ছেন। এখন আমরা কি আল কায়েদাকে সহায়তা করব? হামাসও বিরোধী গ্রুপগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধেছে। আমরা কি এখন হামাসের সঙ্গে ঘোঁট পাকাব?'

বিদ্রোহী কারা, তাদের পরিকল্পনাই-বা কী, সেটা জানে না এমন ভণিতায় হোয়াইট হাউস কয়েক বছর কাটিয়ে দেয়। অবশেষে এই রহস্যের 'মর্মোদ্ধার' করতে সক্ষম হয়। 'ডাক্তার, কৃষক, ফার্মাসিস্ট এবং এমন নানা মতের, নানা পথের মানুষজনকে নিয়ে গঠিত বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে আমরা হালকা কিংবা মাঝারি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে পারতাম, আর এতেই তারা ভারী অস্ত্রসজ্জিত সিরিয়াকে শুধু নয়, বরং রাশিয়া ও ইরানের সহায়তাপ্রাপ্ত একটা সরকার, যার সঙ্গে আছে যুদ্ধবাজ হিজবুল্লাহ, তাকে পরাজিত করে ফেলবে, এটা অলীক স্বপ্ন বৈ কিছু নয়'—২০১৪ সালের আগস্টে নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ওবামা এমনটাই দাবি করেন। যদিও কদিন আগেই সিআইএ বিদ্রোহীদের একটি ছোট গ্রুপকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে।

প্রেসিডেন্টের মূল্যায়নে দুটি ফাঁক রয়ে গেছে। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মান যাচাইয়ে ভুল করেছেন। সিরিয়ান বিদ্রোহীদের একটি নির্ভরযোগ্য সোর্স 'দ্য ভায়োলেশন্স ডকুমেন্টেশন সেন্টার' বিদ্রোহীদের মৃত্যুহার নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। দেখা গেছে, মৃত বিদ্রোহীদের মাঝে ডাক্তারের সংখ্যা ১ শতাংশের কম। কৃষক, শিক্ষকদের হার ডাক্তারদের চেয়েও কম। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেছে সেনাসদস্যরা, প্রায় ৬২ শতাংশ। প্রেসিডেন্ট ওবামার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিরিয়াবিষয়ক সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা ও বর্তমান রাষ্ট্রদূত ফ্রেডরিক হফ প্রেসিডেন্টকে স্মরণ করিয়ে দেন যে সিরিয়ায় সেনা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক।

অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পূর্ব সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তুরস্কের আন্তাকিয়া থেকে পাঠানো আমাদের রিপোর্টে দেখা যায়, একটি শরণার্থী শিবিরেই কয়েক হাজার নিম্ন ও মাঝারি সারির পলাতক সিরিয়ান সেনাসদস্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সিরিয়ান বিদ্রোহীরা রুশ-ইরান সমর্থিত একটা উন্নততর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে না, এই আশঙ্কা অমূলক ছিল। এর ওপর ভিত্তি করে সিরিয়ায় তাঁর গৃহীত নীতিও ছিল ভুল। ওবামা মূলত বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছেন আইসিসকে দমন করার জন্য। অথচ এরাই ছিল সিরিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী গ্রুপ। মাত্র কয়েক বছর আগেই ইরাকের মাটিতে এরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছে, মার্কিনিদের এক দশক ধরে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে।

তা ছাড়া বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল সরকার উৎখাত, আইসিস দমন নয়। সেখানে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ফ্রি সিরিয়ান আর্মি যাদের লক্ষ্য ছিল আইসিসের বিরুদ্ধে লড়াই করা, খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। উল্টো তাদের প্রতিবিপ্লব জনগণের মাঝে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি করেছে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে একজন বিদ্রোহী নিউজ উইককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'আমেরিকানরা জিহাদিস্টদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মিথ্যা বলছে। ছলচাতুরী করছে। বর্তমানে সিরিয়ায় যেকোনো বিদ্রোহীকে জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর পাবেন—আমেরিকা আমাদের শত্রু।' এটা হয়তো অতিশয়োক্তি ছিল। কিন্তু ২০১৩-এর আগস্টে দামেস্কে বিদ্রোহী ও বেসামরিক লোকজনের ওপর আসাদের সারিন গ্যাস হামলার পর বাস্তবতা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওবামা তাঁর তথাকথিত 'রেড লাইন' অতিক্রম করার পরও কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তাঁর ফাকা, অন্তঃসারশূন্য অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেননি। ফলে রাসায়নিক হামলা বন্ধে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ওবামার কৃত চুক্তির কালি শুকানোর আগেই পশ্চিমা সমর্থিত বিদ্রোহীরা হয়তো ফিল্ড ত্যাগ করেছে, বিদ্রোহ করেছে অথবা মার্কিনিদের পাঠানো অস্ত্র ও রসদে বোঝাই তাদের ডিপোতে আক্রমণ চালানোর জন্য আইসিসকে নিজেরাই আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

রাজমুক্তি

বিদ্রোহীরা যখন ধীরে ধীরে আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে শুরু করেছে, তাদের মোহমুক্তি ঘটতে দেরি হয়নি। আসাদও কালবিলম্ব না করে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ নেন। বিদ্রোহ মূলত ইসলামি চরমপন্থীদের আন্দোলন—তা বোঝাতে বিদ্রোহ শুরুর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর 'সংস্কার' প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রাজমুক্তির ঘোষণা দেন। ৩১ মে ২০১১-তে এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

করা হয়। বাহ্যত গণরোষ শান্ত করার লক্ষ্যে। কিন্তু বাস্তবে এই ক্ষমা ছিল ভয়ংকর ফাঁদ। এতে বলা ছিল, সিরিয়ার সব রাজনৈতিক বন্দী ক্ষমার আওতায় আসবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এটি 'বিশেষ' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। অসংখ্য প্রতিবাদকারী, বিপ্লবীকে জেলে পোরা হয়। অন্যদিকে অগণিত সালাফি-জিহাদিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এদের অধিকাংশ অল্প কদিন আগেও ইরাকে ছিল। সিরিয়ান মুখাবারাতই তাদেরকে সেখানে পাঠিয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে ধরে নিয়ে জেলে পোরা হয়। সিরিয়ান সাবেক পার্লামেন্টারিয়ান মুহাম্মদ হাবাশের ভাষ্যমতে, সরকার নিশ্চিতভাবে জানত, যেসব ইসলামিস্টকে তিনি মুক্তি দিতে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কিছু হলেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। তিনজন ধরেছিলেন। জাহরান আলাউশ, হাসসান আব্বাউদ ও আহমাদ ইসা আশ শাইখ—সিরিয়ার সবচেয়ে সুসংগঠিত সালাফি বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা। আসাদের ফরমানবলে মুক্ত হওয়ার কদিন বাদেই তাঁরা একসাথে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন। সবাই এক কাতারে দাঁড়ানো, হাস্যোজ্জ্বল।

ভবিষ্যৎ আইসিস সদস্যরাও মুক্তি পেয়েছিল। তাদের মাঝে ছিলেন আওয়াদ আল মাখলাফ, তিনি বর্তমানে আইসিসের রাজধানী রাক্কার স্থানীয় আমির। আবুল আহির আল আবাসি, ২০০৭ সালে সাইদিনায়া কারাগারে বন্দী ছিলেন আল কায়েদার সদস্য হিসেবে। ২০১২ সালের আগস্টে তুর্কি সীমান্তে তাঁর ভাই ফিরাস নিহত হওয়ার পর আল আবাসি মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তাঁর ভাইয়ের শুরু করা একটি বিদ্রোহী গ্রুপ। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী ২০১৪ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে তিনি আইসিসের প্রাদেশিক আমির নির্বাচিত হন। আলেপ্পো অঞ্চলের হোমস প্রদেশের দায়িত্ব পান তিনি।

যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, হাবাশ ২০০৮ সালের দিকে সাইদিনায়ার উগ্রপন্থা-নিরোধ প্রোগ্রামের ইনচার্জ ছিলেন। সিরিয়ান ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যুরোতে তাঁকে কাজের প্রস্তাব দেওয়ার পর তিনি এতে যুক্ত হন। 'সালাফিজম চাইলে নিয়ন্ত্রণ করা যেত অথবা সংস্কার করা যেত'—তিনি আমাদেরকে বলছিলেন। 'সরকারই সালাফি ও সুফিদের সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আদর্শিক অনুপ্রেরণা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সত্য বলতে—যদি গাদ্দাফি তিন মাস সিরিয়ায় থাকতেন, তিনিও কট্টরপন্থী হয়ে যেতেন।' সিরিয়ার কারাগারগুলো ছিল ইসলামাইজেশনের আঁতুড়ঘর। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্রে বিদ্রোহীদের ইউনিভার্সিটি।

ফাওয়াজ তেল্লো লেখকদ্বয়কে একটি ঘটনা শুনিয়েছে। সে ছিল দীর্ঘ সময় ধরে সিরিয়ার একজন ভিন্ন মতাবলম্বী। নাইন-ইলেভেনে যখন গোটা বিশ্বের নজর

ভিন্ন দিকে ছিল, বাশার তাকে গ্রেপ্তার করেন। সে দামাস্কাস ডিক্লারেশনের অ্যাক্টিভিস্ট ছিল। সংস্কারপন্থী একটি রাজনৈতিক আন্দোলন এটি। আসাদের বড় ভাইয়ের সংস্কারবাদী প্রেসিডেন্সির সময় আন্দোলনটি বেশ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তবে কদিন বাদেই স্বল্পতম সময়ে তাদেরকে দমন করা হয়। দামেস্কের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত আদরা কারাগারে পাঠানো হয় তেল্লোকে। তার সাথি ছিল নাদিম বালুশ।

'নাদিম ছিল লাতাকিয়ার এক টগবগে যুবক।' তেল্লো বলে চলে, 'সে তুরস্কে ছিল। সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের পর তুর্কি ইন্টেলিজেন্স মুখাবারাতকে তার ব্যাপারে অবগত করে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বছরের বেশি সময় ধরে সে আদরায় ছিল।' তেল্লোর পাশের সেলে থাকত বালুশ। এক রাতে গরাদের ফাঁক গলিয়ে তাদের আলোচনা হয়। 'তার সঙ্গে আমি কিছুতেই খেই পাচ্ছিলাম না। সে খুব কট্টরপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করত। তার মতাদর্শ অন্যান্য সেলের ইসলামিস্টদের মাঝে ছড়াত। আল কায়েদার সদস্য ছিল না সে। কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেও না। সে ছিল কট্টর সালাফি, কিন্তু সহিংসতা কিংবা উগ্রতায় বিশ্বাসী ছিল না। কারাগারের আরও অনেকেই তার মতো ছিল। জেলে তাদের সময়টা ছিল কোনো জিহাদি কলেজে শিক্ষা-প্রোগ্রামের মতো।'

আদরা থেকে তেল্লোর মুক্তির পর নাদিম বালুশকে সাইদিনায়া জেলে স্থানান্তর করা হয়। ২০০৮ সালে সেই জেলে সংঘটিত দাঙ্গায় ছয়জন পালের গোদার মাঝে তার নামও ছিল। দাঙ্গার ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল ধোঁয়াশাপূর্ণ। তবে কমপক্ষে ২৫ জন নিহত ও ৯০ জন আহত হয়েছিল। 'দাঙ্গার পরপরই সে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে জেলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। বেশ কিছু বন্দীকে হত্যা করে। তাদের দাবি অনুযায়ী, তারা ছিল সরকারের চর। বালুশ ব্যক্তিগতভাবে এসব বন্দীর একজনকে হত্যা করে। সে সরকারের চর ছিল না। তবে তার অপরাধ ছিল, সে বালুশের মতাদর্শের সঙ্গে একমত ছিল না।'

সরকার সাইদিনায়ার পুনর্নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর ছয়জন পালের গোদাকে ফাঁসিতে ঝোলায়, শুধু নাদিম বালুশ ছাড়া! 'তার মৃত্যুদণ্ড হয়নি। উপরন্তু সে ২০১০ সালে ছাড়া পেয়ে যায়। এমনকি তার আগের সাজার মেয়াদও পূর্ণ হয়নি। সেটি ২০১৫ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। সে লাতাকিয়ায় ফিরে যায়। একটি দোকান খুলে বসে।' লাতাকিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানের শুরুর দিকে সে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। লাতাকিয়া ছিল সিরিয়ার উপকূলবর্তী প্রদেশ, আসাদের পরিবারের দাবি অনুযায়ী তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি এটি।

যা-ই হোক, তাকে আন্দোলন থেকে বহিষ্কার করা হয়। কারণ আলাভিদের এই পুণ্যভূমিতে সে আলাভিবিরোধী 'সাম্প্রদায়িক' স্লোগান দিয়েছে। 'তারা তাকে গ্রহণ করেনি। এক বছরেরও কম সময়ে, সম্ভবত নয় মাস পর লাতাকিয়ার কিছু

বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। তারা পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে। বেশ কিছু ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলে। বালুশ ছিল তাদের একজন। তাকে কেউ সঙ্গে নেয়নি। তাই সে একাই পাহাড়ে চলে যায় এবং নিজের ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলে। পরে সেটি জাবহাতুন নুসরায় একীভূত হয়।' জাবহাতুন নুসরা ছিল আল কায়েদার সিরিয়ান শাখা।

বালুশকে যদিও প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশি-বিদেশি ইন্টেলিজেন্সের বক্তব্য অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরে গড়ে ওঠা অসংখ্য বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে তার উঠবস ছিল। ফাইয়েজ দাওয়াইরি, জর্ডানের একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। জর্ডানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে সিরিয়া ক্রাইসিসের সময় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবুধাবিভিত্তিক পত্রিকা ন্যাশনালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যারা জাবহাতুন নুসরা প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের অনেকেই ২০০৮ সালে আসাদ সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং কারাবন্দী হয়েছিল। বিপ্লব শুরু হওয়ার পর সিরিয়ার সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী আসাদকে মন্ত্রণা দেয় তাদেরকে ছেড়ে দিন। তারা আমাদের খুব কাজে আসবে। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার অনেক নেতিবাচক দিক আছে, কিন্তু "ইতিবাচক" দিকই বেশি। কারণ তারা বিশ্বকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যে আমরা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত নিরীহ এক জাতি।'

এর চেয়েও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন সিরিয়ার সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে ১২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঘাগু এক অফিসার। একই পত্রিকাকে তিনি বলেছেন, ২০১১ সালে আসাদের সাধারণ ক্ষমা ছিল ইসলামিক বিপ্লবের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে। 'সরকার শুধু ইসলামিস্টদের জন্য জেলের দরজা খুলে দিয়েই কাজ সারেনি, তাদেরকে যেতে দিয়েছে। তাদের কাজে সরকার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, এমনকি সামরিক ব্রিগেড গঠনেও।' এই অফিসার ছিলেন আলাভি। কিন্তু ২০১১-এর গ্রীষ্মে তিনি উত্তর সিরিয়ায় তাঁর ইউনিট ত্যাগ করেন। 'এটা এমন নয় যে আমি শুধু গুজব শুনেছি আর সেটা বলে বেড়াচ্ছি। আমি খোদ সরকারি আদেশগুলো দেখেছি। চোখের সামনে এগুলো ঘটতে দেখেছি। আদেশগুলো এসেছিল দামেস্কের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর থেকে।' ইদলিব ও দিরায় যেন বিদ্রোহীদের অস্ত্রের অভাব না হয়, সরকার সেদিকেও 'লক্ষ' রেখেছে। তাদের প্রভূত অস্ত্রের জোগানের ব্যবস্থা করেছে। অফিসারের ভাষ্য!

নাওয়াজ ফারেস, ইরাকে নিযুক্ত সিরিয়ান রাষ্ট্রদূত। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি, আসাদ কীভাবে ইরাককে অস্থিতিশীল করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই 'মহৎ' প্রচেষ্টা ২০০৯ সালের শেষ অবধি চালু ছিল। ২০১২

সালের জুলাইতে ফারেস পক্ষত্যাগ করেন। তিনি মিডিয়াকে বলেন, দামেস্ক এখনো বিপ্লবীদের মাঝে জিহাদি 'আগুন' নিয়ে খেলছে। ফারেস বাগদাদ-দামেস্কের কর্মকাণ্ড সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেছেন। সাদ্দামের পতনের পর রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাগদাদে নিয়োগের আগে তিনি ছিলেন ইরাক-সিরিয়া সীমান্তের প্রাদেশিক গভর্নর এবং সিরিয়ার সিকিউরিটি চিফ।

সানডে টেলিগ্রাফকে তিনি বলেছেন, কীভাবে তিনি নিজেই সরকারি কর্মচারীদের মৌখিক আদেশ দিতেন—যদি কেউ ইরাকে যেতে চাও, সব খরচ সরকার বহন করবে। পাশাপাশি সিরিয়ার সরকারি হাজিরায় অনুপস্থিত দেখানো হবে না! তাঁর ভাষ্যমতে, তিনি এমন কিছু লিয়াজোঁকারীকে চেনেন, যারা আল কায়েদার সঙ্গে সিরিয়া সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করত। তার পক্ষত্যাগের সময় পর্যন্ত এসব চলমান ছিল—২০১২ সালের গ্রীষ্মকাল। আরও বিস্ময়কর হলো ফারেসের দাবি অনুযায়ী ২০১১ সালের শেষ দিক থেকে সিরিয়ায় সংঘটিত আল কায়েদার বড় মাপের সব আক্রমণ নিরাপত্তা বাহিনীর যোগসাজশে হয়েছে। ২০১২ সালের মে মাসে দামেস্কের প্রাণকেন্দ্রে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ভবনে চালানো ধ্বংসাত্মক আক্রমণটিও!

এ ধরনের অভিযোগ কি বানোয়াট? কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই আলাভি ইন্টেলিজেন্স অফিসার ন্যাশনাল পত্রিকাকে বলেছেন, তিনি এখনো আসাদবিরোধী কট্টরপন্থীদের চেয়ে আসাদের শাসনকেই উত্তম মনে করেন। সত্য যা-ই হোক, এতটুকু প্রমাণিত যে অতীতে দামেস্ক আর একিউআইর মাঝে নিষিদ্ধ প্রণয় ছিল, যা ২০১০ সাল নাগাদ অটুট ছিল। ২০১০-এর বাগদাদ আক্রমণেও আসাদের আঁতাত ছিল। দিরাতে আন্দোলন শুরু হয়েছে ২০১১-তে। এক বছরের এই স্বল্পতম সময়েই যদি আসাদ-বাগদাদ সংসার ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে বলতেই হবে এটি আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিরহাত্মক, বিয়োগান্ত প্রণয়।

আইএসআইর সিরিয়া গমন

শেষ মার্কিন পদাতিক সৈন্যটি ইরাক ত্যাগের কয়েক মাস আগেই আবু বকর আল বাগদাদি তাঁর সংগঠনের অল্প কিছু সদস্য সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। আইএসআইর সঙ্গে সংযুক্ত সাংবাদিক রানিয়া আবু জায়েদের ভাষ্য অনুযায়ী ২০১১ সালের আগস্টে রমজান মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে আটজন সদস্য সিরিয়ার হাসাকা প্রদেশে পা রাখে। তাদের মাঝে ছিল আবু মুহাম্মদ আল জোলানি।[১৫]

---

[১৫] সে এখনো (সেপ্টেম্বর, ২০২০) বেঁচে আছে। বর্তমানে হাইয়াতু তাহরিরিশ শামের নেতা। অবরুদ্ধ ইদলিবে সে-ই বিদ্রোহীদের প্রধান। (অনুবাদক)

একজন সিরিয়ান। আইসিসের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কয়েক বছর আগে দামেস্ক থেকে তাকে ইরাকে পাঠানো হয়েছিল সিরিয়া থেকে ইরাকে বিপ্লব রপ্তানি করার জন্য। এখন সেই বিপ্লবকে সে ইরাক থেকে সিরিয়ায় রপ্তানি করছে। অবশ্য ত্রিশের কোঠার এই মাঝবয়সীকে নিয়ে গুজব রয়েছে, সেও নাকি সাইদিনায়া কারাগারে বন্দী ছিল। সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি পেয়েছিল। অবশ্য এর কোনো শক্ত প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

মেজর জেনারেল দিওয়াইহিরি ন্যাশনালকে বলেন, আল জোলানি একসময় সরকারের কাস্টডিতে ছিল। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময় কিংবা বন্দিশিবিরের নাম উল্লেখ করেননি। আবু জায়েদের তথ্যমতে, আল জোলানি হাসাকায় এসে সর্বপ্রথম যোগাযোগ করে সাইদিনায়ার সাবেক এক বন্দীর সাথে। আইএসআইর ছোট দলটিকে সে নিজ আশ্রয়ে রাখে। দলে কয়েকজন সিরিয়ান, সৌদির একজন, জর্ডানের একজন করে ছিল। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে আল জোলানি ইরাকের ক্যাম্প বুকাতে বন্দী ছিল। সেখানে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে ব্যর্থ হয়। তাকে মসুল থেকে আগত কুর্দি হিসেবে চিহ্নিত করে।

আল জোলানি ২০১১ সালের শেষ নাগাদ দামেস্কে বেশ কিছু গাড়িবোমা হামলা চালায়। নিরাপত্তাবাহিনী ও সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে আক্রমণগুলো চালানো হয়েছিল। তবে ২০১২ সালের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত তারা এসব হামলার দায় স্বীকার করেনি। সে সময় জাবহাতুন নুসরা গঠিত হয়, তারপর আক্রমণের দায় স্বীকার করে। আল জোলানি ছিল একটি রহস্যাবৃত চরিত্র। আইএসআই ও একিউআইর সঙ্গে তার অতীত সম্পর্ক লুকানোর ব্যাপারে খুব যত্নশীল। এমনকি তার নিজ গ্রুপের লোকেরাও জানত না জাবহাতুন নুসরা কোত্থেকে এল, আর এসব দুঃসাহসিক আক্রমণ তারা কীভাবেই-বা চালাল।

জার্মান সাপ্তাহিক সাময়িকী দেল স্পিজেলের সংবাদদাতা ক্রিস্টোফ রয়টার সিরিয়াবিষয়ক রিপোর্টের জন্য সুখ্যাত। তিনি আমাদের বলেছেন, 'আন নুসরার প্রথম উত্থান ঘটে ২০১২ সালের জুলাই মাসে আলেপ্পোতে। তাদের একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ওহ, তোমরা তাহলে আন নুসরা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আচ্ছা! বেশ বেশ! তা একটু বলো দেখি তোমরা দামেস্কের নিরাপত্তা বাহিনীর ভবনটা কোন মন্ত্র পড়ে উড়িয়ে দিলে!

তা তো জানি নে, বাপু! আমরা আন নুসরা নাম নিয়েছি, কারণ এটা খুব গর্জিয়াস নাম। তা ছাড়া এই নামের দয়ায় আমরা গালফ থেকে কিছু মাইনেপাতিও পাই!

আল জোলানি প্রায় ছয় মাস সময় ব্যয় করেছেন তাঁর দল গোছাতে। একটি ঘরোয়া বিদ্রোহী দল হিসেবে তীব্র উত্থানের আগে তিনি গোপন জিহাদি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। তাঁর দল ছিল তুখোড় বেলোয়াড়। যখন এটি আত্মপ্রকাশ করে, আন নুসরা শুধু আসাদবিরোধী যুদ্ধে নেতৃস্থানীয় ও শক্তিশালী দল হিসেবেই পরিচিতি পায়নি, স্থানীয় গোত্রগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ায়ও পরিপক্বতার পরিচয় দেয়। ফলে তারা নন-ইসলামিস্ট দলগুলো থেকেও সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। উদাহরণ হিসেবে আইসিসের মতো আন নুসরা স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় খ্রিষ্টানদের চার্চ রক্ষা করেছে। ফলে বোঝাতে পেরেছে যে তারা বহিরাগত তাকফিরি নয়, বরং সিরিয়ারই সন্তান। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় গ্রুপের সমন্বয়।

গবেষকদের মত হচ্ছে, ২০১১ সালের মেতে বিন লাদেন হত্যাকাণ্ডের পর আল জোলানি আইমান আল জাওয়াহিরির কর্মপন্থা অনুসরণ করতে শুরু করেন। 'জাওয়াহিরি অন্যান্য ধর্মীয় গ্রুপকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। শিয়া, ইয়াজিদি, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের টার্গেট করা যাবে না, যতক্ষণ না তারা আগে মুসলিমদের টার্গেট করে,' লেইদ আলখৌরির ভাষ্য। 'জারকাবি, মাসারি ও বাগদাদির সময়ে ইরাকে আল কায়েদার ইমেজ ভয়াবহভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। জাওয়াহিরি মুজাহিদিনদের সাধারণ মুসলিমদের কাছাকাছি যেতে উৎসাহিত করতেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী এরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সিরিয়া, লেবানন ও আফ্রিকা সবখানে একই অবস্থা। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের তাওহিদ তথা একত্ববাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা।'

সামাজিক ঐক্যের বন্ধন হিসেবে তাকফিরিজম (যারা তাদের মতাদর্শ অনুসরণ করে না তাদেরকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করা ও তাদের হত্যা বৈধ মনে করা) ইরাকে ব্যর্থ হয়েছে। এর কৃতিত্ব মার্কিনিদের ও গোত্রনেতাদের। ফলে আন নুসরা ছিল জাওয়াহিরির জন্য তাঁর দলের হৃত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ। ইরাকের ক্ষতি সিরিয়ায় পুষিয়ে নেওয়ার পথ। আল জোলানি পরবর্তী সময়ে আল জাজিরাকে বলেছিলেন, আন নুসরা ছিল আল কায়েদার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সোপান। সিরিয়ার জনগণকে স্বেচ্ছাচারিতার কবল থেকে মুক্তি দিতেই এর আগমণ। 'কেউ লেভান্তের[১৬] গুরুত্ব উপেক্ষা করতে পারে না। এটি প্রাচীন ও বর্তমান সংঘর্ষের তীর্থ। সিরিয়া সংকট শুরু হওয়ার পর ইরাকের ইসলামিক স্টেটের একজন নেতা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করা যায়? আমরা

---

[১৬] ব্যাপক অর্থে লেভান্ত বলা হয় পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-তীরবর্তী এলাকাসমূহকে। চলিত অর্থে লেভান্ত মানে বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন।

বললাম, সেখানে কাজ শুরু করে দিই, চলেন। ওখানের সরকার ভয়াবহ নিপীড়ক। জনগণ এই দানবের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। আমরা অন্যান্য অঞ্চলে যে পথ ধরেছি তারা সেটা করেনি বা করতে পারেনি। সরকার পতনও তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আরব বসন্তের এই জনঅভ্যুত্থান বহু বাধা অপসারণ করে দিয়েছে। আমাদের পথ সুগম করে দিয়েছে এই কল্যাণকর ভূখণ্ডে প্রবেশের। আমরা সেখানে আন নুসরা গঠনের অনুমতি চাই। আল কায়েদা হাইকমান্ড বহু আগে থেকেই এ বিষয়ে ভাবছিল।'

সাধারণত কমান্ডার হিসেবে আল জোলানি গোটা দেশেই তাঁর দলের অপারেশনগুলো তত্ত্বাবধান করতেন। কখনো কখনো তিনি ছদ্ম প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন তাঁর সৈন্যদের সাহস ও মনোবল যাচাই করতে। ক্যাম্প বুকায় যেমন একিউআই মাঝেমধ্যে পাল্টা গোয়েন্দা নিয়োগ দিত শত্রুদের চোখে ধুলো দিতে এবং নিজেদের রিক্রুটদের যাচাই করতে। ২০১২ সালের শুরুর দিকে আল জাওয়াহিরি দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। প্রথমটিতে আল জোলানির উদ্যোগকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যদিও সরাসরি কখনো তাকে স্বীকৃতি দেননি। দ্বিতীয়টি ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। এতে এই মিসরি নেতা প্রত্যেক মুসলিম এবং তুরস্ক, ইরাক, জর্ডান, লেবাননের প্রতিটি মুক্ত ও মহৎ মানুষকে সিরিয়ান ভাইদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নিজের জীবন, সম্পদ, পরামর্শ ও তথ্য সবকিছু নিয়ে এগিয়ে আসার আবেদন করেন।

উম্মাহর অমূল্য সম্পদ যুবকদের জেলে পুরে নির্মম নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগে জাওয়াহিরি আসাদ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। 'চল্লিশ বছর ধরে সে ইসরায়েল সীমান্তে দারোয়ানগিরি করে আসছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে আমেরিকার সঙ্গে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। হামা, হোমস, জিসরুস সুগুর ও দিরায় ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যা চালিয়েছে। দশকের পর দশক। লাগাতার। চোর-ডাকুদের আখড়া তৈরি করে সিরিয়ার সম্পদ ও ঐশ্বর্য লুট করেছে।'

জাওয়াহিরি আরেকটি পবিত্র যুদ্ধকে নষ্ট হতে দিতে চাননি। তিনি তাঁর সেই মাকতাবুল খিদমাহ বা সার্ভিস ব্যুরোর সোনালি যুগে ফিরে যান। তাঁর প্রয়াত মুর্শিদের পথ অনুসরণ করতে বিশ্বজোড়া মুজাহিদিনদের আহ্বান জানান।

দশম অধ্যায়
সেলিব্রেটি জিহাদিস্ট : আইসিস মুজাহিদদের পরিচিতি

এই বইয়ের জন্য আমরা অসংখ্য আইসিস সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সিরিয়া-ইরাকের বিভিন্ন শাখায় তাঁরা কাজ করেছেন এবং করছেন। কেউ ছিলেন ধর্মীয় গুরু, কেউ যোদ্ধা, কেউ প্রাদেশিক আমির, নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং এমনতর অসংখ্য পদ ও পদবি। আমরা যা বুঝতে পেরেছি, আইসিস-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় থাকলে যে কেউ খুব সহজেই এই আন্দোলনের কোনো না কোনো শাখায় জড়িয়ে যাবে, চাই সে আদর্শিকভাবে সালাফি জিহাদিজমের বিরোধীই হোক না কেন। সংগঠনটি ছিল বহুমাত্রিক। নানা মত ও পথের মানুষের এক মহাসম্মিলনস্থল। এতে যেমন ছিল ধর্মহীন সুযোগসন্ধানী, ছিল যুদ্ধের মুনাফাখোর, বাস্তববাদী গোত্রনেতা থেকে শুরু করে পুরোদস্তুর তাকফিরি, সবই।

প্রচারণার প্রভাব

২০১৪ সালের অক্টোবর। আইসিস নিরাপত্তা বাহিনী মুসান্না আবদুস সাত্তারকে গ্রেপ্তার করেছে। উনিশ বছরের এক টগবগে যুবক। সে ছিল ফ্রি সিরিয়ান আর্মির খুব বিখ্যাত মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট ও মুখপাত্র। আইসিস পূর্ব সিরিয়ায় তার এলাকা দখল করার দুই মাসের মাথায় তাকে গ্রেপ্তার করে। নিকটস্থ একটি জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। জীবন ছিল হুমকির মুখে। তার পেশা আজ তার ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আইসিসবিরোধী কিংবা সৌদি মিডিয়ার হয়ে কাজ করার মানে হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। আবদুস সাত্তারকে বলা হয়েছিল, যদি তুই 'ওরিয়েন্ট' কিংবা 'আল আরাবিয়া'র হয়ে কাজ করিস তো টুকরো টুকরো করে ফেলব। তবে আইসিসের সঙ্গে কথা বলে আবদুস সাত্তার যা বুঝতে পেরেছে—আল জাজিরার হয়ে কাজ করাটা তুলনামূলক কম বিপজ্জনক।

আবদুস সাত্তার আমাদেরকে বলেছে, সে যাত্রায় সে পরিত্রাণ পেয়েছে হাস্যোজ্জ্বল, বয়োবৃদ্ধ, ভাবগম্ভীর এক জিহাদির আগমনে। আইসিসের তদন্ত কর্মকর্তার প্রশ্নবান থেকে তাকে নাজাত দেন তিনি। 'আবু হামজা খুবই গুরুগম্ভীর ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি,' আবদুস সাত্তার পরে আমাদেরকে বলছিল আবু হামজা আশ শামির ব্যাপারে। আলেপ্পোর পূর্বাঞ্চলীয় শহর মিনবিজের অধিবাসী,

আইসিসের একজন সিনিয়র ধর্মীয় নেতা। 'তাঁর চেহারাই আপনার আত্মা প্রশান্ত করে দেবে। তিনি ফ্রি সিরিয়ান আর্মির ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলেন, কেন আইসিস তাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তা ব্যাখ্যা করলেন। তারা সেক্যুলার বিধান গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা আমেরিকার পয়সায় চলা চর। আল্লাহ বলেছেন, "যে তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় সে তাদেরই একজন"।'

তিনি আদ দাওলার (আইসিসের প্রতিষ্ঠিত খেলাফত) ব্যাপারে কথা বলেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখনো কেন বাইয়াত[১] নাওনি? রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহিলিয়্যাতের মরণ মরল। সত্য বলতে, যখন আমি এটা শুনলাম, কলজেটা কেঁপে উঠল। জীবনে প্রথম আমি অনুভব করলাম হাদিসটি কত বাস্তব।

আবদুস সাত্তার তখনো আবু বকর আল বাগদাদির হাতে বাইয়াত নিতে প্রস্তুত ছিল না। আবু হামজা হাসিমুখে তাকে আরও সময় দিলেন। এক সপ্তাহ কিংবা এর কিছু পর আবদুস সাত্তার বাইয়াতের সিদ্ধান্ত নেয়। সে আনন্দচিত্তে আমাদেরকে তার আইসিসযাত্রার কথা বলছিল। আইসিসের জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে কাটানো আট ঘণ্টা সময়কে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ হিসেবে যত না ভাবে, তার চেয়ে বেশি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে ভাবে। আইসিসের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, তাদের ধর্ম প্রচারের কৌশল নিয়ে সে বলছিল। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে সে ছিল পুরোপুরি সম্মোহিত।

এই বইয়ের জন্য আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের মধ্যে অসংখ্য সদস্য আইসিস সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তারা যাদেরকে রিক্রুট করতে চাইত, তাদের অতীত ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তি, সব ভেঙেচুরে আবার নতুন করে গড়ে তুলত, নিজস্ব পন্থায়। আবদুস সাত্তারের বলা আইসিসের 'বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ' পশ্চিমাদের নিকট উদ্ভট ঠেকতে পারে, এমনকি অবাস্তব কল্পনাও মনে হতে পারে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, আইসিস কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা, ইসলামের ইতিহাস ও রাজনীতির মিশেলে দুর্দান্ত প্রভাবশালী এক মতাদর্শ গড়ে তুলেছে।

নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে সম্মোহনের কথা সে বলেছে, সেটা এককালের কমিউনিস্টদের অনুভূতির চেয়ে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়, পরবর্তী সময়ে যাদের মোহভঙ্গ হয়েছে এবং মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে। 'আমাদের সব নীতি

---

[১] বাইয়াত হচ্ছে হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ। ইসলামি খেলাফতে খলিফার অভিষেক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করেন, একেই বাইয়াত বলা হয়। বর্তমানে এর বহুবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। (অনুবাদক)

জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাদের একমাত্র নীতি হচ্ছে আমরা নীতিহীনতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি,' কথাগুলো বলেছিল আর্থার কোয়েজলার তার *ডার্কনেস অ্যাট দ্য নুন* বইতে। এটি তাকে বলেছিল রুবাশভ, পার্টি কমিশনারের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার পর। অবশ্য এর কয়েক মিনিট পরই রুবাশভকে গুলি করে মারা হয়। গুলিটি এসেছিল সেই স্বৈরতন্ত্রের মাজল থেকে, যার জন্য সে জীবনের ৪০টি বসন্ত উৎসর্গ করেছিল।

আবদুস সাত্তার বলছিল, 'আপনি যখন দাওলার ধর্মীয় নেতাদের কথা শুনবেন, আপনার ভেতর কেঁপে উঠবে। হায় হায়! গোটা মুসলিম সমাজই তো ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত! তারা ধর্মের নামে এমন এক মতবাদের অনুসরণ করছে, যার জন্ম মাত্র দুই দশক আগে। যারা মুসলিম হওয়ার দাবিদার তাদের ধর্মচর্চা ভেজালে ভরা। এর ৯০ শতাংশই বিদ'আত। আমাদের ইবাদতগুলো শিরকে ঠাসা, অথচ আমরা তা টেরও পাই না। যেমন রাশিচক্রের কথাই বলা যায়। মসজিদে যখন ইবাদত করি, সেগুলো থাকে রিয়ায় (লোকদেখানো ইবাদত) পরিপূর্ণ।' আইসিস আবদুস সাত্তারকে এমন কিছু দিয়েছে, যা আসাদ কিংবা ফ্রি সিরিয়ান আর্মি তাকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে—নির্ভেজাল ইসলাম।

'আপনি যদি আইসিসের কোনো ধর্মীয় নেতা কিংবা বিদেশি যোদ্ধার সঙ্গে মাত্র দুই ঘণ্টা কথা বলেন, বিশ্বাস করুন, আপনি প্রভাবিত হবেনই। আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না, তবে মানুষকে প্ররোচিত ও সম্মোহিত করার এক বিস্ময়কর প্রতিভা রয়েছে তাদের। কোনো এলাকা দখল করার পর সেখানে ধর্মীয় অনুশাসন চালু করা হয়। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, নামাজ আপনাকে পড়তেই হবে। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আমরা ছিলাম পুরোপুরি বেখবর—জিহাদ। তারা এই বিস্মৃত ইবাদত পুনরুজ্জীবিত করেছে। তাদের তৈরি করা যেকোনো ভিডিও দেখলে আপনার ভেতর জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত হবে। ধীরে ধীরে এতে আত্মসমাহিত হয়ে যাবেন।'

যারা আইসিস কর্তৃক হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তারাও এই দলটির অসামান্য সম্মোহনী শক্তির কথা স্বীকার করেছে। আবু বিলাল আল-লা'আলি ছিল তার নিজ শহর দার আজজুরে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির অর্থ জোগানদাতা। আইসিস শহর দখলে নেওয়ার পর সে তুরস্কে পালিয়ে যায়। তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তার নাম আইসিসের ওয়ান্টেড লিস্টে উঠে যায়। সে তাদেরকে অশিক্ষিত লুটেরার দল ছাড়া কিছুই ভাবে না, যারা ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সেও তাদের সম্মোহনী ক্ষমতার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছে। ছেলে-বুড়ো সবার ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা প্রযোজ্য। বিশেষত যাদের ধর্মীয় জ্ঞান কম।

'আইসিস অর্থ প্রদান, ন্যায়বিচারের প্রতিজ্ঞা ও চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে মানুষকে আগ্রহী করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে তা কাজ করেছে। আমাদের অঞ্চলে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম ও এমন কারও আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল যে "হারামিয়া" তথা জোচ্চুরদের বিরুদ্ধে লড়বে। তারা ইসলামিক স্টেটের আদর্শ সাদরে বরণ করেছে, তাদেরকে সৎ ভেবে। যারা দায়েশে (আইএসের আরবি নাম) যোগদান করেছে, তারা কদাচিৎ কোরআনের আয়াত জানত। তাদের কোনো ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না। তারা তাদের প্রচারণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল শুধু।'

শিক্ষানবিশ

হামজা মুহাম্মদ। ১৫ বছরের এক চমনমে কিশোর। দক্ষিণ সিরিয়ার কামিশলির অবস্থসম্পন্ন পরিবারের ছেলে। ২০১৪ সালের গ্রীষ্মে হুটহাট করে প্রায়ই উধাও হয়ে যেতে শুরু করে। কদিন পর তার বাবা-মা জানতে পারেন, সে আইসিসে ভিড়েছে। প্রাণান্ত চেষ্টা করেও তাকে আইসিসের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বিরত রাখা যায়নি। তার ভাই বলেছে, অবশেষে বাবা ইচ্ছা করে পা ভেঙে দেয়। একটু সুস্থ হতে না হতেই সে পুনরায় ঘর পালায়। এবার পরিবারের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তার ভাই উমরের ভাষ্যমতে, সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হতো না। মায়ের কান্নাকাটি কিংবা বাবার বকুনিতে মাঝেমধ্যে কথা বলত। যেসব ভাইরা দেশের বাইরে থাকত, সে শুধু তাদের সাথেই যোগাযোগ করত।

লেখকদের জন্য আয়োজিত এক স্কাইপ আলাপে উমর ব্যাকুল হয়ে তাকে ঘরে ফিরতে বলে। 'হামজা, তুমি এখনো তরুণ, এদের ছেড়ে দে ভাই, এরা বিভ্রান্ত দল। ইসলাম কখনোই কসাইবৃত্তি আর নৃসংশতার কথা বলে না রে!' জবাবে সে তার সমর্থনে কোরআনের আয়াত, হাদিস শুনিয়ে দেয়। কৌশলী ও ক্লাসিক্যাল আরবিতে এও বলে, তোমাদের চোখে আইসিসের যে ভাবমূর্তি, সেটা পক্ষপাতদুষ্ট ও ভুয়া। 'মিডিয়া যা গেলায় তাই গিলো না। আইসিসরা সাচ্চা মুসলিম। তারা ভালো বৈ মন্দ কিছু করছে না। আমি যা দেখি তুমিও যদি তা দেখতে, যা শুনি তা শুনতে তবে বুঝতে পারতে।'

উমর হামজাকে সিরিয়ার ধর্মীয় ও গোত্রীয় বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা গলাগলি করে বাস করেছে। উমর এটাও বলে যে তার নিজেরই অনেক দোস্ত আলাভি কিংবা ইয়াজিদি। এটা শুনে হামজা থ বনে যায়। 'কী বললে! তোমার ইয়াজিদি সাঙ্গপাঙ্গ আছে?' ভাই, তাদেরকে মেরে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হও।

কুর্দিরা আইসিসে যোগ দেবে—এটা কল্পনাতীত। কারণ আইসিসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মাঝে বাথিস্টে ঠাসা, সাদ্দামের আমলে যারা কুর্দিদের ওপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। সম্প্রতি আইসিস কুর্দি এলাকার দিকে নজর দিয়েছে। তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তের কোবানি শহর, কুর্দিস্থান আঞ্চলিক সরকারের রাজধানী ইরবিল অবরোধ করেছে। তবে ২০১৪ সালের আগস্টে মার্কিন বিমান হামলায় তাদের অগ্রযাত্রা রুখে যায়।

ইরাকি পেশমেরগা ও সিরিয়ান ওয়াইপিজিসহ অন্য কুর্দি দলগুলো ছিল যথাক্রমে সেক্যুলার ও মার্ক্সবাদী। সুতরাং আইসিসের হাতে ধরা পড়লে মৃত্যুই ছিল তাদের নিয়তি। সুন্নি দলগুলো কুর্দিদের দলে টানার চেষ্টা করেছে প্রচুর। বিশেষত, আদ দৌরির নকশবন্দী আর্মি, বাথদের নিয়ে গড়া বিভিন্ন দল প্রচুর কসরত করেছে এবং স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু আইসিস। হালাবজা শহরে সাদ্দামের নিষ্ঠুর গণহত্যা এবং সাদ্দামিস্টদের নিয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও আইসিস এখানে আশাতীত সফলতা পেয়েছে।

তাদের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আল আদনানি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রহীন বৃহত্তম এই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর বিবৃতিতে বলেন, 'কুর্দিদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ধর্মীয় লড়াই। জাতীয়তাবাদী লড়াই নয়—এসব থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই এ জন্য নয় যে তারা কুর্দি। আমাদের সংগ্রাম অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাদের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা ক্রুসেডার আর ইহুদিদের দোসরদের বিরুদ্ধে। অনেক কুর্দি-মুসলিম আইসিসের উচ্চপদে সমাসীন আছে। নিজ গোত্রের অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা অকুতোভয় যোদ্ধা।'

কুর্দিরাও আইসিসে আছে, তা প্রমাণ করতে এবং কুর্দিদের ভেতর এই বিশ্বাস সেঁধিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের অক্টোবরে আইসিসের শীর্ষস্থানীয় 'মুসলিম কুর্দি' আবু খাত্তাব আল কুর্দ-এর নেতৃত্বে কোবানিতে কুর্দি ওয়াইপিজিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়। তাঁর সঙ্গে ছিল হাসাকা, আলেপ্পো ও উত্তর রাক্কা থেকে আসা কুর্দিরা। কুর্দিরা কেন আইসিসে যোগ দিচ্ছে? দুবাইভিত্তিক দৈনিক আল বায়ানের রাজনৈতিক সম্পাদক, বিখ্যাত কুর্দি গবেষক হুসেইন জাম্মু এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হালাবজায় সাদ্দামের গণহত্যার পর বহু পরিবার পথে বসে যায়। আর কিছু পরিবার পুনরায় ঘরবাড়ি বানিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। রাসায়নিক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় যেসব দাতব্য কার্যক্রম শুরু হয়, ওগুলো ছিল মূলত সালাফি প্রভাবিত। গালফের বিভিন্ন দেশের তত্ত্বাবধান ও

অর্থায়নে পরিচালিত হতো এগুলো। কুয়েতের সোসাইটি অব দ্য রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আল কায়েদার অর্থায়নে অভিযুক্ত একটি সংস্থা।

কয়েক দশকের নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াতি কার্যক্রমের ফলে হালাবজা মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দি ইসলামি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্মর্তব্য, আল কায়েদার অঙ্গ সংস্থা আনসারুল ইসলামের মাধ্যমে ইরাকে আবু মুস'আব জারকাবির প্রথম আগমন কেন্দ্র ছিল উত্তর কুর্দিস্থানের পাহাড়ি অঞ্চল।

সেই তুলনায় সিরিয়ান কুর্দিরা এত ব্যাপকভাবে আইসিসে যোগ দেয়নি, যদিও অশ্রুত ছিল না একেবারে। তারা প্রধানত সেক্যুলার কিংবা খাজনাবি ধারার সুফিবাদে প্রভাবিত ছিল। আমরা আলেপ্পো ও হাসাকার দুজন কুর্দির সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তারা আইসিসের সর্ব-সুন্নি দর্শনে প্রভাবিত হয়ে এতে যোগ দিয়েছিল, সর্ব-আরব মতবাদের কারণে নয়। কুর্দি এক রিক্রুটারের সঙ্গে রেকর্ডকৃত একটি কথোপকথন আমাদেরকে শুনিয়েছে হাসাকার একজন কুর্দি আইসিস।

আইসিসে যোগদানের কিছু আগে ধারণ করেছিল। রিক্রুটার তাকে বলেছিল, জাবহাতুন নুসরা হচ্ছে একটি 'আরব' সংগঠন, কোনো 'ইসলামি' সংগঠন নয়। তার ভাষ্যমতে, আইসিস নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ছিল, তাদের একমাত্র ভিত্তি ছিল নিখাদ ইমান। ঠিক একই দর্শন কাজে লাগিয়ে আইসিস প্রচুর তুর্কমানকে দলে টেনেছিল। এরাও উৎপীড়ক আরব সরকারগুলোর হাতে নিগ্রহের শিকার হয়েছে। মসুল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আইসিসের উত্থানে এই তুর্কমান আইসিসরা প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নিহত, বাগদাদির ডেপুটি, আবু মুহাম্মদ আল তুর্কমানি ছিল এদেরই একজন।

সাইদিনায়ার যোদ্ধা দল

আইসিসের মাঝারি ও উচ্চপদ দখল করে রেখেছিল তাকফিরিদের বিশেষ একটি দল, যারা আকিদায় অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন ছিল, কিন্তু তাদের মতাদর্শ ছিল তুলনামূলক অধিক সম্প্রসারণশীল। সাইদিনায়ার সাবেক বন্দী আবুল আসির আল আবসি এর যথার্থ উদাহরণ। আসাদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় সে মুক্তি পেয়েছিল। মুক্তি পাওয়ার পরপরই সে আলেপ্পোর পল্লি অঞ্চলে উসুদুস সুন্নাহ নামের একটি দল গড়ে তোলে। ২০১৩ সালে নুসরার সঙ্গে তার ভাঙন তৈরি হয়। তারপর এই অঞ্চলে আইসিসের সমর্থন গড়ে তোলার প্রধান কারিগরে পরিণত হয়। আইসিস প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক মাস আগেই আল আবসি অন্যান্য জিহাদি ও ইসলামি দলগুলোর ব্যাপারে হার্ডলাইনে চলে যায়। অনেকেই বলে, এটি ছিল

সাইদিনায়ার বন্দিশালায় আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। যদিও একে আল আবসির প্রতিশোধস্পৃহার সাথেও সম্পৃক্ত করা যায়। কারণ সে বেশ কিছু গ্রুপকে তার ভাই ফিরাসের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে থাকে।

ওয়ায়েল ইসসাম সিরিয়ান বিপ্লব শুরু হওয়ার পর আল আবসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। তার ভাষ্যমতে, আবসি তার বন্দিশালার সাবেক সহচরদের বেশির ভাগকেই কাফের মনে করে। এর মাঝে তারাও রয়েছে, যারা এখন প্রতিপক্ষ ইসলামি ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়নগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। কেন? কারণ তারা মধ্যপ্রাচ্যের তাগুত (মিথ্যা উপাসক) মুসলিম শাসকদের এবং এ অঞ্চলের অধিকাংশ সাধারণ মুসলিমকে কাফের হিসেবে বিবেচনা করে না। উপরন্তু আবসির ভাষ্য, তাদের অনেকেই সাইদিনায়া বন্দিশালায় ২০০৮ সালের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর একে পুনরায় সিরিয়ান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়েছিল।

আল আবসি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা সাইদিনায়ার সালাফিদের মাঝেও কোণঠাসা ছিল। খুব কম সংখ্যক বন্দীই এই অতি-চরমপন্থী মতাদর্শে প্রভাবিত ছিল কিংবা সরকার পতনের লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এমনকি নিজেদের ওয়ার্ডের বাইরে ফোর্থ আর্মড ডিভিশন থেকে সৈন্য সংগ্রহের পরও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আইসিস ও অন্য ইসলামি দলগুলোর মধ্যকার সাম্প্রতিক উত্তেজনার বীজ লুকিয়ে আছে সেই কারাগারের গারদের ওপাশে। বিগত কয়েক বছর ধরেই যা পুষ্ট হচ্ছিল। আইসিসের নিরাপত্তা কর্মকর্তা আবু আদনান আমাদের বলেছেন, বর্তমানে সক্রিয় অধিকাংশ ইসলামি বিদ্রোহী দলই গঠিত হয়েছিল কারাগারের ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে। বিদ্রোহীদের একতাবদ্ধ করতে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'তারা শুধু একতাবদ্ধই হয়নি, বরং পূর্ব থেকেই একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে যে ভাঙন দেখেছেন, সেগুলো পূর্ব থেকেই চলে আসা আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে। সদস্যও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূচনা সেই থেকে চলমান।'

২০১২ সালের শেষ দিকে বাগদাদি সিরিয়া ভ্রমণ করেন। আল আবসি ছিল তাঁর মতবাদের ঘোরতর সমর্থক এবং সরব প্রবক্তাদের একজন। ইসলামি খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। ফলে সিরিয়ার বিভিন্ন প্রতিপক্ষ বিদ্রোহী দলের সদস্য, আন নুসরার সদস্য ও অন্যান্য জিহাদি সশস্ত্র গ্রুপের সমর্থন জোগাতে সে বাগদাদিকে প্রভূত সহায়তা করে।

প্রতিরোধব্যূহ নির্মাতা

আইসিস রিক্রুটদের মাঝে আরও একটি ক্যাটাগরি ছিল, যারা পূর্ব থেকেই ইসলামি কিংবা জিহাদি মতাদর্শ লালন করত কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড শুধু তাকফিরি

মতাদর্শেই সীমাবদ্ধ ছিল। আইসিসে যোগদানের চূড়ান্ত ধাক্কাটা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কারও কারও ক্ষেত্রে আইসিস ছিল তাদের অঞ্চলে একমাত্র ইসলামি দল, কারণ তাদের ভূমি আইসিসের দখলে ছিল। সুতরাং যোগ দিতে চাইলে এটিই একমাত্র সহজলভ্য দল। কেউ ছিল বিরোধী দলগুলোর বিপক্ষে আইসিসের সামরিক শক্তিতে অভিভূত। অনেকেই আবার অধিক সুসংগঠিত, নিয়মতান্ত্রিক ও সক্ষমতা দেখে পূর্বতন দল ছেড়ে এতে যোগ দিয়েছে।

আবদুস সাত্তারের মতো সুদূরপ্রসারী কিংবা সর্বান্তকরণ দলান্তর কম লোকেরই হয়েছে। এ জন্যই একে হাইব্রিড চরমপন্থী দল বলা হয়। ইরাক-সিরিয়ার ইসলামিক দলগুলোর নেতৃত্বের মতদ্বৈদতার কারণেও অনেকে আইসিসে ভিড়েছে। কিংবা ২০১৩ সালের শেষ ভাগে সিরিয়ায় শুরু হওয়া সাহওয়ার অকাল গর্ভপাতের ফলে। আইসিসে যোগদানের এই হিড়িক সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়েছিল সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে। সেই মাসে ডজনখানেক ইসলামি দল, যাদের ভেতর আন নুসরাও ছিল, পশ্চিমা মদদপুষ্ট সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন ছেড়ে সর্বাত্মক ইসলামি ঐক্য গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়। সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন ছিল সরকারবিরোধীদের রাজনৈতিক শাখা। অক্টোবরে সাতটি ইসলামিক দল মিলে ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করে এবং প্রদত্ত বিবৃতিতে ইসলামি শুরাভিত্তিক দেশ পরিচালনার অনুকূলে গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে। (শুরা হচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদ। অনুবাদক।)

এই সময়টুকুতে আইসিসের মতাদর্শে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সাধিত হয়। অনেক ইসলামিস্টই সমমনা প্রতিদ্বন্দ্বী সালাফি দলগুলোর বিরুদ্ধে (যার ভেতর আইসিসও ছিল) যুদ্ধ করতে মনস্থির করতে পারছিল না। বহু সাধারণ সিরিয়ানও একই দ্বিধায় ভুগছিল। তাদের বিশ্বাস হলো, বিপ্লবের মূল সুর আসাদ ও তাঁর ইরানি প্রক্সিদের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করা। এই ধারা থেকে বিচ্যুতি মানে বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। পাশাপাশি ইসলামিক ফ্রন্টের যুবকেরা বিশেষ ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত ছিল, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের সাড়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং উদ্‌গ্রীব। এসব কারণে ইসলামিক ফ্রন্টের অনেক কমান্ডার আইসিস কনভয়গুলোর নিরাপত্তা দিয়েছেন, অন্যরা নিদেনপক্ষে এদের প্রতি অস্ত্র তাক করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এই অনৈক্য ও সিদ্ধান্তহীনতা আইসিসকে শুধু লাভবানই করেছে।

লিউয়াউ দাউদ, ইসলামিক ফ্রন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী উপদল, সকরুশ শাম বা শামের বাজ নামে পরিচিত ছিল। ২০১৪ সালের জুলাইতে তাদের প্রায় এক হাজার সদস্য আইসিসে যোগ দেয়। ক্রমবর্ধমান হারে ইসলামিক ফ্রন্ট ও আন নুসরা থেকে যোদ্ধারা দলে দলে আইসিসে ভিড় করতে শুরু করে, কারণ তারা ইরাক ও সিরিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। সিরিয়ায় আইসিস কিছু সুবিধা

পেয়েছে। 'সিরিয়ান জিহাদ'র অনুপস্থিতি তাদেরকে সে সুযোগ করে দেয়। ২০১৪ সালের আগস্টে সিরিয়ান যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়িয়ে যায়। এখানকার জিহাদিরা এই যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিকে পথ দেখানোর মতো কোনো ধারা গড়ে তুলতে পারেনি। প্রতিষ্ঠিত ইসলামি দলগুলো, বিশেষত সিরিয়ান মুসলিম ব্রাদারহুড এ থেকে যোজন যোজন দূরত্ব বজায় রেখেছে। উল্টো তারা নিজেদের গণতন্ত্রপন্থী মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিল। অবশ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অন্য ইসলামি সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে তারা সমর্থন জুগিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে আন নুসরাও নিজেদের জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যাদের আন্তর্জাতিক কোনো অ্যাজেন্ডা নেই। এসব প্রতারণা আর ধাপ্পাবাজি আইসিসের পথ সুগম করেছে। বৈশ্বিক সালাফি জিহাদের একমাত্র ধারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এনে দিয়েছে। বিশ্বজয়ের উন্মাদনায় সুরা ঢেলেছে।

রাজনৈতিক প্রভাব

আইসিস-ভূখণ্ডের সীমানা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এতে যোগ দেওয়া মানুষের সংখ্যাও তত হ্রাস পেয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে এই সংখ্যা ছিল বিপুল। সাধারণ ক্যাডার ও সমর্থকদের অনেকেই আইসিসে মুগ্ধ ছিল এর রাজনৈতিক প্রকল্পের কারণে, ধর্মীয় কারণে নয়। এদের নিকট বিগত দশকের স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র মাধ্যম ছিল আইসিস। প্রথমে ইরাকে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়া, তারপর সিরিয়ায় দেশজুড়ে বর্বরতার, যা অনেকের নিকট গণহত্যাতুল্য, শিকার হয়ে অস্তিত্ব সংকটে ভোগা। তাদের চোখে এটি ছিল ইরান-পরিচালিত শিয়া প্রক্সি বনাম সুন্নিদের মধ্যকার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। শিয়া প্রভাব রুখতে কিংবা তাদের বর্বরতার প্রতিশোধে সীমাতিরিক্ত নৃশংসতা ছিল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই মনোভাব অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকদের মাঝেও বিস্তার লাভ করেছে।

তেমনই একজন হচ্ছেন সালাহ আল আওয়াদ। হাসাকার জারাবলুস এলাকার এই আইনজীবী ছিলেন পুরোদস্তুর সেক্যুলার এবং আইসিসের কাট্টা সমালোচক। কিন্তু একসময় দেখলেন এ অঞ্চলকে কুর্দি দখলদারির কবল থেকে রক্ষায় আইসিসই একমাত্র দুর্গ। তিনি আসাদবিরোধী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর দল ও মত পরিবর্তনের আগে তিনি আমাদের বলেছিলেন, 'আমরা ক্লান্ত, পুরোপুরি ক্লান্ত। তারা (আইসিস) প্রতিদিনই চার-পাঁচটা কল্লা কাটছে।' এই মতবিনিময়ের কয়েক মাস পর, যখন আইসিস কোবান দখলের জন্য অবরোধ করতে শুরু করেছিল, সালাহ জানান তিনি কল্লাকাটাদের দলে যোগ দিয়েছেন।

হাসাকার আরবদের একটি বিপুল অংশের মনোভাব তাঁর মতো। এই প্রদেশের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের বলেছেন, যদি আইসিস এখানে আক্রমণ চালায়, প্রাদেশিক রাজধানী দখলে নেয়, তবে হাজার হাজার মানুষ আইসিসে যোগ দেবে। কুর্দি দখলদারত্ব গেলে তাদের কী দশা হবে—সেই ভয়ে। ইরাক-সিরিয়ার মিশ্র অঞ্চলগুলোতে একই অবস্থা। যেমন বাগদাদের নিকটস্থ বাকুবায়। কিংবা সিরিয়ার হোমস ও হামায়। এসব অঞ্চলে মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় আবর্তিত হয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ওপর ভিত্তি করে।

আইসিসের এই শ্রেণির আরব সদস্যদের অনেকেই সেক্যুলার। কাউকে কাউকে অ্যাগনোস্টিকও (অজ্ঞেয়বাদী, স্রষ্টা আছে কি নেই তা নিয়ে সন্দিহান, আস্তিক-নাস্তিকের মাঝামাঝি অবস্থান) বলা যায়। অনেকেই বলেছে, তারা নামাজ পড়ে না, মসজিদেও যায় না। আইসিসের বর্বরতার বিরুদ্ধে তারা আমাদের নিকট তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে। তবে তারা মনে করে, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে 'সুন্নিবিরোধী' যেকোনো শক্তির বিরুদ্ধে, চাই তা সরকার হোক কিংবা ভাড়াটে মিলিশিয়া, আইসিসই একমাত্র ভরসা। নিজের কাজের বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যে সালিম আমাদের বলেছেন, যেকোনো শক্তিশালী ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে এ রকম রক্তপাত প্রয়োজনেরই অংশ। উমাইয়া, আব্বাসি এবং আধুনিক স্পেনে দ্বিতীয় উমাইয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাসও অভিন্ন কিছু নয়।

এই হতাশা ও নিপীড়িত হওয়ার অনুভূতি অনেক সুন্নির মনে গেঁথে গেছে এবং নিজেদের মজলুম ভাবছে। বিশেষত যারা হত্যা ও যুদ্ধের শিকার হয়েছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যেসব অঞ্চলে সুন্নিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও তারা অনিরাপদ সংখ্যালঘুদের মতোই আচরণ করছে। পক্ষান্তরে এসব অঞ্চলের শিয়ারা ছিল স্থিরচিত্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং সুসংগঠিত। সন্দেহ নেই, ইরানি পৃষ্ঠপোষকতা ও কাসেম সুলেইমানির কুদস ফোর্স কর্তৃক এদের 'মিলিশিয়াকরণ' এই কৃতিত্বের দাবিদার। আগে যেমনটা দেখেছি আমরা। শিয়া মিলিশিয়ারা এখন দেশ-ভূখণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ নয়, যেমন নয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্নিরা।

সুন্নিরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছে আসাদ, খোমেনি এবং অতিসাম্প্রতিক আল মালিকির জাঁতাকলে। সামনে কোনো প্রতিশ্রুতিশীল, নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দলও নেই। তাদের প্রধান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তিকেন্দ্র গালফ আরব রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই এখন কুকর্মে লিপ্ত, রাজনৈতিকভাবে নপুংসক, অবিশ্বস্ত কিংবা মুখে কুলুপ আঁটা। যেগুলো সুন্নিপ্রধান কিংবা সুন্নিশাসিত। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভিক্ষা ছাড়া তারা এখন কিছুই করতে পারছে না। কিন্তু আইসিস এই হীনম্মন্যতা ও দুর্বলতার অচলায়তন ভীষণ দুঃসাহসে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৪ সালে জারকাবি যেমন বদর বাহিনীর নির্যাতনের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, বাগদাদিও

এখন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স, আসাইব আহলিল হক, লেবানিজ হিজবুল্লাহ, ইরাকি কাতাইব হিজবুল্লাহ এমনকি সিরিয়া ও ইরাকে বদর বাহিনীর সুন্নি-নিধনের কথা বলতে পারছেন। এদেরকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারছেন যে খিলাফত ছাড়া সুন্নিদের কোনো আশা নেই।

বাস্তববাদী আইসিস

পুরোপুরি আইসিস-নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর বাস্তববাদী লোকজনও এই সংগঠনের সমর্থকে পরিণত হয়েছে সরকার পরিচালনা, স্যানিটেশন, খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে এদের দক্ষতার কারণে। নিজেদের শাসিত অঞ্চলে আইসিস স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা তৈরি করতে পেরেছে, যা অত্র অঞ্চলের জনগণের নিকট আসাদ, ইরাকি সরকার আর শিয়া মিলিশিয়াদের অধীনে স্বপ্নেরও অতীত। দশকব্যাপী যুদ্ধক্লান্ত মানুষের নিকট অপরাধ আর আইনহীন জংলি সমাজে বসবাসের তুলনায় আইসিস যত কঠোর আইনই করুক না কেন, তা বহুগুণ শ্রেয়। এরা সাধারণত ঝামেলা এড়ানোর জন্য আইসিস থেকে দূরে থাকত, কেউ কেউ যেসব অঞ্চলে আইসিস নিষ্ঠুরতা করে না বলে প্রসিদ্ধ, সেসব অঞ্চলে চলে যেত।

আবু জসিম একজন ধর্মীয় নেতা, যিনি ২০১৪ সালে তাঁর নিজ ভূমি আইসিসের দখলে চলে যাওয়ার পর এতে যোগ দেন। তিনি আমাদের বলেছেন, 'আইসিস কী করেছে না করেছে তা বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না। তবে যারা তাদের সঙ্গে ঝামেলা পাকায় না, তারা এদেরকে ঘাঁটায় না। আমি মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করি এবং আমি আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান আশা করি।'

সুযোগসন্ধানী

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইসিসে যোগ দিয়েছে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য। এরা মূলত সাধারণ সদস্য ও নিম্ন পর্যায়ের কমান্ডার হিসেবে কাজ করত। প্রতিদ্বন্দ্বী দল প্রতিরোধ করতে, প্রভাবশালী সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির পেয়াদা হতে কিংবা আইসিসের বিরুদ্ধে কৃত কোনো অপকর্মের কঠোর সাজা থেকে বাঁচতে তারা এতে যোগ দিত। উদাহরণত সাদ্দাম আল জামালের কথা বলা যায়। এফএসএর পূর্ব সিরিয়ার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিল সে। তার 'আল্লাহু আকবর ব্রিগেড' আন নুসরার নিকট পরাজিত হয় এবং তারা তার দুই ভাইকে হত্যা করে। সে আইসিসের বশ্যতা মেনে নেয়। যদিও সে মাদক চোরাকারবারি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু বাহ্যত এতে কোনো সমস্যা হয়নি।

আইসিস আন নুসরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আমের আল রাফদান আইসিসে যোগদান করে। কারণ নুসরার সঙ্গে তেলের লভ্যাংশ নিয়ে তার ঝামেলা চলছিল। পাশাপাশি দার আজজুরের যে গোত্র আন নুসরায় প্রভাবশালী ছিল, তাদের সঙ্গে তার নিজ গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। পরবর্তী সময়ে রাফদানকে আল জোলানির সংস্থা পাঁচ মিলিয়ন সমমূল্যের তুলা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

বিদেশি যোদ্ধা দল

ইরাক ও সিরিয়ার বাইরে আইসিসে যোগদানের প্রেরণা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। কারণ ছিল এ দুই দেশের ঘটনাবলির ভুল ব্যাখ্যা। চরমপন্থা বিশেষজ্ঞ শিরাজ মাহের বিষয়টি আলোচনা করেছে এবং দেখিয়েছে কীভাবে বিভিন্ন অ্যাপস, টুইটার ও ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়াগুলো জিহাদি প্রচারণায় বিপ্লব বয়ে এনেছে। পশ্চিমা আইসিস অ্যাক্টিভিস্টরা প্রায়ই অনলাইনে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করত, আন্তরিকতার চেয়ে তাদের মাঝে এর পরিমাণই ছিল বেশি। 'আচ্ছা ভাই! আইসিস কি রাক্কায় হেয়ার জেল আর নাতেলা বিক্রি করে?' 'আমি কি একটা আইপ্যাড আনতে পারব? যেন আব্বু-আম্মুকে জানাতে পারি আমি নিরাপদে খিলাফতে পৌঁছেছি!' 'আমাকে তো বলেছিল সেখানে গ্র্যান্ড থেফট অটো ভি খেলতে পারব!'

নিউ স্টেটসম্যানের এক প্রবন্ধে মাহেরের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, 'ইরাক যুদ্ধের সময় আল কায়েদার শুভাকাঙ্ক্ষীরা পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড সিক্রেট ফোরামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, যেন সরেজমিনে কী ঘটছে তা জানা যায়। এসব ফোরাম খুঁজে পাওয়া অত সহজ ছিল না, আর প্রবেশ করা তো ছিল আরও দুঃসাধ্য। পাশাপাশি আলোচনাগুলো বেশির ভাগই ছিল আরবিতে, অধিকাংশ ব্রিটিশের নিকট অজ্ঞাত ভাষা।' কিন্তু সম্প্রতি যেসব ব্রিটিশ মুসলিম সিরিয়া-ইরাক যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেই স্বজাতির জন্য একেকজন রিক্রুটার কিংবা অনলাইন যোদ্ধায় পরিণত হচ্ছে।

মেহেদি হাসানের কথাই বলি। পোর্টসমাউথের ২০ বছর বয়সী টগবগে তরুণ। আইসিসে যোগ দিতে ঘর ছেড়েছে, কোবানি দখলের লড়াইয়ে ২০১৪ সালের নভেম্বরে সে মারা যায়। সে এবং তার পোর্টসমাউথের কিছু বন্ধু আইসিসের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল তাদের দুর্দান্ত, দুঃসাহসিক বিজয়ের গালগপ্পো শুনে। সঙ্গে ছিল তাকফিরিদের শাসনে স্বপ্নীল জীবনের রঙিন চিত্র। বাচ্চাগুলো 'পম্পেইর ছোকরা' হিসেবে পরিচিত ছিল। কারণ তারা পম্পেইর সঙ্গে জিহাদে যোগ দেওয়া। একজন এখনো যুদ্ধে আছে। তিনজন মারা গেছে। আরেকজন যুক্তরাজ্যের কারাগারে কাতরাচ্ছে।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে মাহেরের প্রতিষ্ঠান আইসিএসআরের হিসাব অনুযায়ী, সিরিয়ায় যুদ্ধরত বিদেশি সৈন্যের সংখ্যা ১১ হাজারের অধিক। ৭৪টি দেশ থেকে তারা আগত। তাদের বেশির ভাগই আইসিস কিংবা অন্যান্য জিহাদি দলগুলোতে যোগ দিয়েছে, অল্প কিছু গিয়েছে মূলধারার এফএসএতে। সেই গবেষণায় দেখা যায়, বিদেশি যোদ্ধাদের ১৮ শতাংশই পশ্চিম ইউরোপের, ফ্রান্স রয়েছে তালিকার শীর্ষে, তারপর ব্রিটেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার পর সে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে সিআইএর হিসাব অনুযায়ী বিদেশি যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। দুই হাজার ছিল পশ্চিমা। বিদেশি যোদ্ধাদের বড় ঢলটা সব সময়ই মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে আসত। সৌদি আরব, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া ছিল সুন্নি মিলিশিয়াদের সবচেয়ে বড় জোগানদাতা।

ব্রিটিশ মিশনারি যোদ্ধাদের অনেকেই যোগ দিয়েছিল জনদুর্ভোগ দেখে। সিরিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর নারী ও শিশুদের দুরবস্থা দেখে তাদেরকে সুরক্ষায় জিহাদে অংশ নেওয়া অনেকের দৃষ্টিতেই ছিল ধর্মীয় দায়িত্ব, মাহেরের ভাষ্য। ২০১২ সালের মাঝামাঝি থেকে সিরিয়ার অভ্যন্তরেও অনুরূপ স্রোত বইতে শুরু করে। যোদ্ধারা দলে দলে চরমপন্থী দলগুলোতে যোগ দিতে শুরু করে, যখন আসাদপন্থী মিলিশিয়া কর্তৃক পাইকারি দরে সাধারণ মানুষ হত্যার সংবাদ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আসাদবিরোধীদের ওপর এসব গণহত্যার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিল প্রচুর। সচেতনভাবেই তারা ইসলামি জিহাদিদের দলে ভিড়েছে এবং এর কারণ হিসেবে হাওলা, বায়দা ও অনুরূপ গণহত্যাগুলো পেশ করে থাকে। ২০১২ সালের শেষ দিকে ঘটেছিল এসব।

তবে স্থানীয় সিরিয়ানদের মাঝে স্বদেশি চরমপন্থী দলগুলোতে যোগদানের ঝোঁক ছিল বেশি, বিদেশি যোদ্ধাবহুল আইসিসের চেয়ে। অবশ্য আইসিস অন্যদিক দিয়ে লাভবান হয়। সরকারপন্থী ও ইরানি মিলিশিয়াদের বীভৎস নির্যাতন ও গণহত্যার ফলে আইসিসের শিরশ্ছেদ মানুষের নিকট সহনীয় হয়ে উঠেছিল ওদের কুকর্মের প্রতিকার হিসেবে।

সরকারি বাহিনীর সবচেয়ে কুখ্যাত গণহত্যাগুলো সংঘটিত হয়েছে সাধারণত সেসব এলাকায়, যেখানে শিয়া, সুন্নি, আলাভি, ইসমাইলি (শিয়া উপদল) একত্রে বসবাস করত, পল্লিগুলো ছিল লাগোয়া। সবচেয়ে উত্তম পন্থা ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা উসকে দেওয়া। এসব গণহত্যায় তারা সাধারণত একটি প্যাটার্ন অনুসরণ করত। সিরিয়ান আরব আর্মি কাঙ্ক্ষিত গ্রামে রাতভর ভারী গোলাবর্ষণ করত। পরদিন সকালে আশপাশের গ্রাম থেকে মিলিশিয়ারা দলে দলে এসে সেখানে তাণ্ডব চালাত। তারা হালকা অস্ত্র ও চাকু ব্যবহার করত। হত্যার উন্মাদনায়

মেতে উঠত। নারী-পুরুষ-শিশু সব ঢালাও জবাই করত। তবে এটি হতো অত্যন্ত সুচারুরূপে, অতি সতর্কতার সঙ্গে বেছে বেছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে।

নির্যাতনের ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, শাবিহা গণবাহিনী, যা ছিল ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের লাঠিয়াল, সুন্নিদের প্রতীক নিয়ে ব্যঙ্গ করছে। নির্যাতিতদের আসাদের নামে ধ্বনি দিতে ও অন্যান্য অবমাননাকর বিবৃতি দিতে বাধ্য করছে।

মাহের বিদেশি যোদ্ধাদের আরও একটি ক্যাটাগরি উল্লেখ করেছে—শাহাদাতপিয়াসু। একমাত্র শাহাদাতই ছিল তাদের তামান্না। আত্মঘাতী হামলায় প্রাণোৎসর্গ করে জিহাদের সোনালি কাবিনে নিজেদের নাম লেখানোই ছিল তাদের আকাঙ্ক্ষা। গালফ রাষ্ট্রগুলো থেকে আসা বিদেশি যোদ্ধাদের অনেকেরই একমাত্র চাহিদা ছিল আত্মঘাতী হামলার গৌরব অর্জন। তাদের চ্যাট ফোরাম, ওয়েবসাইটে এটি ছিল একটি অপরিবর্তনীয় আলোচ্য বিষয়। একিউআই যাত্রা শুরু করার পর থেকে এমনই চলে আসছে।

স্বপ্রণোদিত এসব আত্মবলিদানকে কেন্দ্র করে সৌদি নাগরিকদের অনেকেই বিতর্ক তুলেছে—আইসিস নেতারা বৈষম্য করছে। তারা তাদের স্বদেশবাসীকে (অর্থাৎ আরবদের) মৃত্যুকূপে পাঠাচ্ছে। অপরদিকে সংগঠনের শীর্ষ পদ সব ইরাকিদের দখলে রাখছে। মাহেরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিদেশি যোদ্ধা টানার আরেকটি উপলক্ষ হচ্ছে নিখাদ অ্যাডভেঞ্চার! গাঁজাখোরেরা সাধারণত বাস্তব জীবনে ধার্মিক হয় না। মাদকসেবী, মাদকাসক্ত ও অপরাধ জগতের মাফিয়ারাও এমনই হয়, যেমনটা ছিলেন খোদ জারকাবি মসজিদমুখী হওয়ার আগে। সিরিয়ায় যুদ্ধে যাওয়াটাও তাদের জন্য ছিল আরেকটি বিনোদন মাত্র।

মসুল পতনের প্রভাব

অনেক সাক্ষাৎকারদাতা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা আইসিসকে সমর্থন করার আগে ইরাক-সিরিয়া যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ততটা খেয়াল করতেন না। কিন্তু মসুল পতনের পর পট পরিবর্তন হয়ে যায়। একজন মিসরি জিহাদি আমাদের বলেছে, ইরাক-সিরিয়ায় কোন দল ভালো, কোন দল মন্দ—এ বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু আইসিস নিনাওয়া ধসিয়ে দেওয়ার পর সে এ নিয়ে গবেষণা শুরু করে। তার ভাষ্যমতে, আইসিসের খেলাফত প্রতিষ্ঠা রাসুল সা.-এর কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মিশিগান ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপোলজিস্ট স্কট অ্যাট্রেনও অনুরূপ কাহিনি শুনিয়েছেন। 'স্পেনের এক ইমামের সঙ্গে আমার কথোপকথন মনে পড়ে। সে বলেছিল, আমরা সর্বদাই সহিংসতার বিরোধিতা করে এসেছি। কিন্তু আবু বকর আল বাগদাদি আমাদের বিখ্যাত করে ছেড়ে দিল। খিলাফাহ কখনো সহিংস হওয়ার প্রয়োজন নেই, এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো হতে পারে!'

সরেজমিনে আইসিসের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক আরবই তাদের স্ব-আরোপিত মহিমায় প্রলুব্ধ হয়েছে। আইসিস নিজেকে খোদাপ্রদত্ত সুন্নি প্রতিরোধ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, যা ইসলামের সোনালি যুগের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রীতিনীতিতে পরিচালিত। এবং এই ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখতে তারা অতি সূক্ষ্ম প্রোপাগান্ডা ও ভুল তথ্যের এক জটিল গোলকধাঁধা গড়ে তুলেছে।

একাদশ অধ্যায়

টুইটার টু দাবিক : মুজাহিদিন সংগ্রহের পথ

'আমাদের ব্যাপারে শুনো না, আমাদের থেকে শুনো!'

আইসিসের সঙ্গে আমাদের কথোপকথনে যে বিষয়টা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে— সংগঠনটি কোনো বিদেশি মিডিয়ায় নিন্দুকদের আঁকা কোনো চিত্র প্রসিদ্ধ হতে দেয়নি। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে। 'আমাদের ব্যাপারে নয়, আমাদের থেকে শুনো,' বাক্যটি তাদের সাক্ষাৎকারে বারবার এসেছে।

ইরাকের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মুওয়াফফাক আর রুবাই আইসিসের উত্থানে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে আল জাজিরাকে বলেন, মোটের ওপর টুইটার আর ফেসবুকের মাধ্যমেই প্রায় ৩০ হাজার ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। ইউনিফর্ম ত্যাগ করেছে। অবশেষে মসুল ছেড়ে ভেগেছে জিহাদিরা এর দখল নেওয়ার জন্য। যদিও তাঁর কথা কিছুটা অতিরঞ্জিত।

অতিরঞ্জিত হলেও তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেছেন। মসুল পতনের দুই সপ্তাহ আগে আইসিস তখনো পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত ভিডিওটি প্রকাশ করে। 'সালিলুস সাওয়ারিম' তথা তরবারির ঝনকানি শিরোনামে। ঘণ্টাব্যাপী এ ভিডিওতে প্রোপাগান্ডা-প্রচারণায় তাদের অতুলনীয় দক্ষতার প্রকাশ ঘটেছে। ভিডিওটি তাদের নিয়োগ-পদ্ধতি এবং এমন সব বিষয়বস্তুতে ঠাসা, পশ্চিমা রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদদের ধারণা অনুযায়ী যেগুলো মানুষকে আইসিসবিমুখ করবে।

দেখা যাচ্ছে, একজন প্রচারক চাকু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইসলামিক স্টেট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিচ্ছে। কাফের ও ফিলিস্তিনের ইহুদিদের সতর্ক করে দিচ্ছে। মুজাহিদিনদের আগমনী ঘোষণা করছে। তারপর কিছু পাসপোর্ট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। কিছু দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, কিছু আইসিস সদস্য কথিত 'রাফিদা হান্টার' স্টাইলে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের অস্ত্র তাক করা একদল শিয়া সৈনিকের দিকে, আইসিসের ভাষায় এসব শিয়া ইরাকের 'সাফাভি' আর্মিতে যোগ

দিতে যাচ্ছে।[১৮] ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়িতে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ পোশাক পরিহিত কিছু যুবকের রক্তাক্ত দেহ, যে-ই নড়ছে সে-ই গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে।

আরেকটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, পলায়নপর একজন মানুষকে গুলি করছে। সে এখনো জীবিত কিন্তু মারত্মক আহত, তাদেরকে বলছে, 'আমি একজন ড্রাইভার।' স্ক্রিনে তার আরেকটি ছবি দেখানো হচ্ছে, যাতে সে ইরাকি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে মেঝেতে শুয়ে আছে। তারপর তাকে হত্যা করা হয়। আনবারের এক মসজিদে দেখা যাচ্ছে, আইসিস নিরস্ত্র জনসাধারণ থেকে আবেদনপত্রের মতো কিছু একটা গ্রহণ করছে। ধারাবর্ণনাকারী বলছে, যদি আপনি আনবার অ্যাওয়াকেনিং কাউন্সিলের সাবেক সদস্য হয়ে থাকেন, কিংবা ইরাক সরকারের সঙ্গে আঁতাতকারী সুন্নি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকেন, তবে আপনার তওবা করতে হবে এবং আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। তবে তারা অনুকম্পা প্রদর্শন করবে এবং অতীতের সব অপকর্ম ভুলে যাবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে অবশ্যই তা করতে হবে আইসিসের হাতে ধরা পড়ার আগে।

একইভাবে সমস্ত সুন্নি সৈন্য, পুলিশ ও মুখাবারাত সদস্যকে দলত্যাগ ও অস্ত্রত্যাগে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 'আপনি অস্ত্র নিয়ে সেসব রাফিদার দলে যোগ দিচ্ছেন, যারা আপনার সন্তানকেই হত্যা করছে।' মুখোশ পরিহিত এক আইসিস সদস্যকে দেখা যাচ্ছে মসজিদভর্তি মুসল্লিদের বলছে, 'আমরা আপনাদের সন্তান, আপনাদের ভাই। আমরাই পারি আপনার জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা দিতে।' ভিডিওতে তাদের সর্বত্র বিচরণ ও শত্রুর আস্তানায় হানা দেওয়ার দুঃসাহসিক, রহস্যময় কলাকৌশলও দেখানো হয়। আইসিস সদস্যরা ইরাকি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে এক অ্যাওয়াকেনিং কমান্ডারের বাড়িতে হানা দিচ্ছে, এরা হচ্ছে 'সাহওয়া হান্টার'। ধরা পড়ার পর কমান্ডার বলছে, সে ইরাকি আর্মিকে এসব আক্রমণকারী লোকদের পরিচয় খুঁজে বের করতে বলবে, কারণ তার 'ধারণা' এরা ছদ্মবেশী আইসিস।

একদম শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, দুটি বালক, এক সাহওয়া কমান্ডারের ছেলে, ধূলিমলিন দেহে একটি বিশাল গর্ত খুঁড়ছে। বলছে তাদের বাবা তাদেরকে ইরাক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তারপর তাদের বাবার গর্ত খোঁড়ার পালা আসে। সে হাঁপাচ্ছিল। মুজাহিদিনরা তাকে বিদ্রূপ করে বলছিল,

---

[১৮] রাফিদা হান্টার আইসিসের একটি ভিডিও গেম। শিয়াদের হত্যা করা গেমের মূল অংশ। সাফাভি সাম্রাজ্য ইরানের একটি শিয়া সালতানাত, পাহলভিদের পূর্বে তারা ইরান শাসন করেছে। কিন্তু ইরাকের সাফাভি সাম্রাজ্য বলে বোঝানো হচ্ছে- ইরানের তত্ত্বাবধানে বর্তমান ইরাক একটি শিয়া সালতানাতে পরিণত হচ্ছে। (অনুবাদক)

'সরকারকে সহযোগিতা করার সময় তো ক্লান্ত হওনি, যখন চেকপয়েন্টে কাজ করতে।' তারপর সে ক্যামেরামুখী হয়ে অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত সবাইকে তওবা করার উপদেশ দিচ্ছে। 'এখন আমি আমার নিজের কবর খুঁড়ছি।'

সামারার একজন কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তাকে নিজ রুমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায়। তাকে টেনে বেডরুমে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ইরাকি সেনাবাহিনীর পোশাকে একজন আইসিস সদস্য তার ওয়ার্ডরোব থেকে নিরাপত্তা ইউনিফর্মগুলো ছুড়ে ফেলছিল। একটি কাপড় দিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর তার শিরশ্ছেদ করা হয়।

যদিও লেনি রেনফেস্থালের মতো নয়, তবে আইসিস সালিল আল সাওয়ারিমের মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত দর্শকদের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদের বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে। ভিডিওটি ঠিক তখন প্রকাশিত হয়েছে, যখন পূর্ব সিরিয়ার কিছু বিদ্রোহী গ্রুপ আইসিসের বিরুদ্ধে লড়ছিল, এদের মাঝে সাহওয়াতরাও ছিল। এসব দলের এ ধরনের কোনো সক্ষমতা ছিল না। তারা নিজেদের বার্তা না নিজেদের সদস্যদের নিকট পৌঁছাতে পেরেছে, না জনসাধারণের নিকট। নিজেদের শৌর্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য কোনোটাই প্রচার করতে পারেনি। ইরাকিদের দৃষ্টিতে আপনি যদি শিয়া হয়ে থাকেন, তবে তো আইসিস এলে আপনার আর রক্ষে নেই। কিন্তু যদি সুন্নি হয়ে থাকেন, তবে কেন সেনাসদস্য, পুলিশ কিংবা নির্বাচিত কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করার চিন্তা করেন? যেখানে সামান্য একটু আনুগত্য ভবিষ্যতে আপনার মাথা যথাস্থানে থাকার নিশ্চয়তা দেয়। আইসিস নিজেকে অদম্য দুর্জয় দাবি করে, বহু ইরাকিই সেটা বিশ্বাস করে।

টুইটারে খিলাফাহ

সালিলুস সাওয়ারিম বেশ কয়েকবার ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছিল এবং প্রতিবারই ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। তারপর archive.org ও justpaste.it সহ বিভিন্ন ফাইল শেয়ারিং সাইটে আপলোড করা হয়। এবং আইসিস সদস্য ও ফ্যানদের মাধ্যমে এগুলো ইউটিউব-টুইটারে ব্যাপক প্রচার করা হয়। এসব ভিডিও প্রচুর ভিও পাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমালোচকও তৈরি করে। 'প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত আমরা তা নই, যেমন তারা আমাদেরকে ভাবে'—আলেপ্পোতে আইসিসের এক মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট আমাদেরকে বলেছিলেন। 'আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আছে, আমাদের ডাক্তার আছে, আছে অসাধারণ দক্ষ মিডিয়া উইং। আমরা কোনো "তানজিম" (সংগঠন/সংস্থা) নই, আমরা একটি রাষ্ট্র।'

এটা ছিল আইসিসের সফলতার এক পিঠ। মুদ্রার অপর পিঠও রয়েছে। মৌলবাদী ও ধর্মীয় চেতনার যে স্ফূরণ তাদের বার্তায় থাকত, তা অত্যুচ্চ প্রত্যাশা তৈরি করেছিল, যার অনিবার্য ফল ছিল আশাভঙ্গ ও মোহমুক্তি। শিরাজ মাহের এই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তুলনামূলক কম ধর্মীয় আবহ তাদের মন ভেঙে দিয়েছে। 'বহু বিদেশি যোদ্ধা সিরিয়ায় আসার কয়েক দিন কিংবা কয়েক সপ্তাহ বাদেই অকর্মণ্যতা আর বিরক্তির অভিযোগ করতে শুরু করত। ভিডিওতে তাদের অ্যাডভেঞ্চার অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হতো।'

আইসিস যেসব সাইট ইউজ করে তার মধ্যে তুলনামূলক কম নজরদারি করা হয় এমন একটি প্লাটফর্ম হচ্ছে জেলো। একটি এনক্রিপ্টেড অ্যান্ড্রয়েড ও কম্পিউটার অ্যাপস। এতে গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে অডিও বার্তা আদান-প্রদান করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীরাও প্রায়ই এটি ব্যবহার করে সরকারের নজরদারি এড়াতে।

আইসিস জেলোকে নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করে—আবু বকর আল বাগদাদির বাইয়াত গ্রহণে। এর কৃতিত্ব আইসিসপন্থী সংগঠন আনসারুদ দাওলাতুল ইসলামিয়ার। এই অ্যাপের বদৌলতে মোবাইল ফোন ওয়াকিটকিতে পরিণত হয়। আইসিস সম্পর্কে জানতে কিংবা এতে যোগ দিতে আগ্রহী যে কেউ এতে আইসিস-আলেমদের বক্তৃতা শুনতে পারে। অ্যাপসটির ব্যবহার অত্যন্ত সহজ হওয়ার ফলে তরুণ আইসিসদের নিকট তুমুল জনপ্রিয়। হামা প্রদেশের সাহলুল গাব এলাকার অধিবাসী আহমেদ আহমেদের এলাকার দুই যুবক আইসিসে যোগ দিয়েছে জেলোতে বক্তৃতা শুনে।

মুহাম্মদ, মাত্র ১৪ বছর বয়সী এক তুর্কি কিশোর। তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে কাজ করত। সহসাই একদিন বাবুল হাওলা সীমান্তে উধাও হয়ে যায়, অক্টোবর ২০১৪। মুহাম্মদের পিতা আহমেদের সহায়তা চান ছেলেকে খুঁজে পেতে। আহমেদ ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ফলোয়ারদের নিকট তথ্য চেয়ে, মুহাম্মদের ব্যাপারে কেউ কিছু জানে কি না। আহমেদ বলেন, এক ঘণ্টা পর ইরাক থেকে মুহাম্মদ তার পিতাকে কল করে বলে আমি এখন আমার 'ভাইদের' সঙ্গে আছি। সংবাদ শুনে মুহাম্মদের পিতা ভয়াবহ ধাক্কা খান। পরে তিনি আহমেদকে বলেছিলেন, সে নিয়মিত আইসিসের ভাষণ শুনত জেলোতে। 'তার পিতা অনেকবার তাকে সতর্ক করেছেন যে তারা মিথ্যাবাদী। সে বলত আমি শুধু তারা কী বলে সেটা জানতে চাচ্ছি। বেশির ভাগ যুবকই এতে যোগ দিয়েছে তাদের প্রচারণামূলক এসব বক্তৃতা শুনে।'

অফলাইনেও তাদের প্রচারণা থেমে ছিল না। তরুণদের ব্রেনওয়াশ করার 'পর্যাপ্ত' ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালের মে মাসে তারা মানবিজ থেকে

১৩-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১৫৩ জন স্কুলশিক্ষার্থীকে অপহরণ করে। আলেপ্পোতে পরীক্ষা শেষে তারা নিজ শহর কাবোনে ফিরছিল। প্রায় চার মাস পর সেপ্টেম্বরে আইসিস তাদের মুক্ত করে দেয়। এই কদিন তাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে শরিয়া কোর্স করানো হয়েছিল। অপহৃত স্কুল-বালকদের কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে পরিচিত দুই সাংবাদিক বলেছেন, এই বালকদের বেশ কজন স্বেচ্ছায় আইসিসের সদস্য পদ গ্রহণ করে সেখানে রয়ে গেছে, তাদেরকে বাবা-মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরও।

থেকে যাওয়া এই শিশুদের একজনের আত্মীয় আমাদেরকে বলেছেন কীভাবে সে তার মায়ের আকুতি প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি স্থানীয় আইসিস নেতা বাড়ি ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও! ছেলেটির মা নেতাকে বলেছিলেন, সে-ই, আহমেদ হামেক, তাঁর একমাত্র সন্তান, স্বামীও মারা গিয়েছে। সুতরাং ইসলামি নির্দেশনা অনুযায়ী সে ছেলেটিকে তার মায়ের সঙ্গে যাওয়ার এবং মায়ের আনুগত্যের আদেশ দিতে বাধ্য। কিন্তু ছেলে জেদ ধরেছে। এই আন্দোলন ছেড়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই তার নেই।

কেয়ামত

অধিকাংশ আলোচনায় আইসিস নিজেদের বৈধতা ও সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইসলামের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ধারণাগুলো ব্যবহার করেছে। নবীজি (সা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে এক চূড়ান্ত লড়াই হবে দাবিক নামক স্থানে—আলেপ্পোর একটি গ্রামীণ অঞ্চল। ধারণাটি এতই বহুলচর্চিত ও ব্যাপক যে তারা নিজেদের ম্যাগাজিনের নাম রেখেছে দাবিক। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আইসিস-জিহাদিদের এক মার্চে আবু মুস'আব জারকাবি হাদিসটি বর্ণনা করছেন, এখানে ভিডিও স্লো মোশন, হাতে কালো পতাকা—'ইরাকে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে। এর উত্তাপ ধীরে ধীরে বেড়ে চলবে, ইনশা আল্লাহ। যত দিন না দাবিকে তা ক্রুসেডারদের ভস্ম করে দেয়।' দাবিকের প্রতিটি সংখ্যা সাধারণত এমন কোনো উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা হতো, যা ভেতরের নিউজগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পূর্বসূরি বাথ পার্টির মতো আইসিসও প্রতিপক্ষের মতামতকে নিজেদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অতি নিপুণভাবে ব্যবহার করত। উদাহরণত, ২০১৪ সালের আগস্টে গঠিত কোয়ালিশনের কথা বলা যায়, যা গঠিত হয়েছিল সিরিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। আইসিস একে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে, কারণ এটি হচ্ছে নিদর্শন—প্রতিশ্রুত সময় সন্নিকটে! বিশেষত এটি ঘটেছে খিলাফাহর ঘোষণা আসার পরপরই। আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন!

মুহাম্মদ (সা.)-এর এক বিখ্যাত হাদিসে আছে, তাঁর পর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁর আদর্শ অনুযায়ী। তারপর জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল ও বিশৃঙ্খলা শুরু হবে। অবশেষে পুনরায় খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামিক স্কলার ও মুজাহিদিন উভয় দলই এই হাদিসটি ব্যবহার করে এটা বোঝাত যে আরব বিশ্বে বর্তমান বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা কেটে গিয়ে একসময় খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে। আইসিস বিশ্বদরবারে নিজেদের উপস্থাপন করার জন্য ইসলামি প্রতীকগুলো ব্যবহার করে, যেন তাদের বৃত্তের বাইরের মুসলিমরাও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। আবু বকর আল বাগদাদির ব্যাপারে বলা হয়, তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর নাতি হুসাইন রা.-এর বংশধর। অনেক স্কলারের মতেই কুরাইশি হওয়া মুসলিম শাসক হওয়ার পূর্বশর্ত।

এই বংশতালিকা আইসিসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত সেসব মুজাহিদিনের জন্য, যারা এতে খুব অনুপ্রাণিত হয়। তা ছাড়া আসন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মুসলিম যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেও এটি অপরিহার্য। পাশাপাশি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলিম ব্রাদারহুডের ধীরে চলো নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই আইসিসকে বিকল্প হিসেবে দেখছিল। সবচেয়ে কঠিন অংশ—খিলাফাহর ঘোষণা—ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন শুধু এর স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির পালা। যে কেউ এই লড়াইয়ে শামিল হতে পারে, এমনকি ইরাক-সিরিয়ায় না গিয়েও।

যে ভূমিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেটিও অর্থবহ। 'শাম' বলতে দামেস্ক ও বৃহত্তর সিরিয়া দুটোকেই বোঝায়। বৃহত্তর সিরিয়ায় রয়েছে উত্তর লেভান্তের অধিকাংশ এলাকা, তুরস্কের আন্তাকিয়াও এর অংশ। শামকে মুহাম্মদ (সা.) বরকতপূর্ণ ও পুনরুত্থানের ভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইরাক-সিরিয়া প্রথম মুসলিম খিলাফাহর আঁতুড়ঘর। বহু নবী-রাসুলের জন্মস্থান। অসংখ্য সাহাবির অন্তিম শয়নস্থান হওয়ার সৌভাগ্যে বরিত। এবং এটিই মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত শেষ সময়ের রণক্ষেত্র। এত সব প্রতীকী তাৎপর্য আইসিসের মতাদর্শ প্রচারে বারুদের মতো কাজ করেছে। রক্ষণশীল মুসলিমদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। আইসিসের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জানে না এমন মুসলিমদের মনোযোগ কেড়েছে ব্যাপক।

জমকালো জিহাদ

পূর্বে যেমনটা বলেছি, 'দাবিকের' রচনাগুলো মূলত কেয়ামত-সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে আইসিসের মূল মিশন ও আচরণ ব্যাখ্যা করত। এ ক্ষেত্রে যৌনদাসীর কথা বলা যায়, যা তারা কেয়ামতের পূর্বশর্ত হিসেবে উপস্থাপন করত। কারণ এক হাদিসে আছে, পৃথিবী ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেয়। যদি

দাসীই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে এই হাদিসের বাস্তবায়ন অসম্ভব। এ জন্য দাবিকের উপসংহার হচ্ছে, 'এখন এটি সুস্পষ্ট যে (আইসিসের মুখপাত্র) আল আদনানি যখন ক্রুসেডারদের বলে এই লড়াই-ই তোদের আখেরি লড়াই, তার আত্মবিশ্বাসের উৎস অজ্ঞাত নয়। তোরা এবারও লাঞ্ছিত ও পরাজিত হবি, যেভাবে অতীতে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছিস। তবে পার্থক্য হচ্ছে, এবার আমরা তোদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব, বিনিময়ে তোরা কিছুই করতে পারবি না। আমরা তোদের রোম ধসিয়ে দেব, তোদের ক্রুশ গুঁড়িয়ে দেব, নারীদের দাসী বানিয়ে নিয়ে আসব, ইনশা আল্লাহ। এটি আমাদের অঙ্গীকার।'

তারা যেসব প্রথা পুনরুজ্জীবিত করেছে, তার মধ্যে অনেকগুলোই ইসলামি ভবিষ্যদ্বাণীর অংশ। যেমন মাজার উড়িয়ে দেওয়া, সমকামীদের ছাদের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা। আইসিসের একজন সাবেক গভর্নর হুসসাম নাজি আল্লামি, পরবর্তী সময়ে ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২০১৪ সালে, মসুলে মাজার ধ্বংস করার আদেশ জারি করেছিলেন। তাঁর ভাষ্যমতে, হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই এমনটা করেছিলেন। কিন্তু ইরাকি সংবাদমাধ্যম আল সাবাহকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন, মূলত সমালোচনার মুখে ওই আদেশ জারি করেছিলেন, বিশেষত আল কায়েদার পক্ষ থেকে। কারণ এটি না করলে আইসিসের বৈধতা হুমকির মুখে পড়ত, বলত এটি রাসুল (সা.)-এর পূর্ববর্ণিত খিলাফাহ নয়, খোলাফায়ে রাশেদার আদলে গঠিত নয়।

যত বিকৃতি আর নিষ্ঠুরতাই করুক না কেন, আইসিসের রেডিমেড বৈধতা ছিল। এর তমসাচ্ছন্ন লক্ষ্যের 'বাজারদর' হেলাফেলা করার মতো নয়। সম্প্রতি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলেছে 'থিঙ্ক অ্যাগেইন টার্ন অ্যাওয়ে' নামে। এতে আইসিসের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতার ছবি ও সংবাদের লিঙ্ক পোস্ট করা হয়। আইসিসপন্থী আইডিগুলোর সাথেও এটি যুক্ত, তাদেরকে নিয়ে ট্রল করার জন্য।

অন্য একটি আইডি থেকে রচয়িতার নামোল্লেখ ব্যতীত একটি জিহাদি সংগীত পোস্ট করা হয়, 'শাহাদাত ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই কাঙ্ক্ষিত নয়, আমাদের কবর হবে গিরিকন্দরে, কাফন হবে আকাশঝরা শিশির।' স্টেট ডিপার্টমেন্টের আইডি থেকে এর জবাব দেওয়া হয়, 'কোনো শিশুকে পরিবার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদের গিরিকন্দরের শিশিরাচ্ছাদনে কবর দেওয়ার চাইতে ঢের ভালো তাকে এক জোড়া জুতো কিনে দাও।'

প্যারিসে শার্লি হেবদোর সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের তিন দিন আগে আইসিস কিংবা তাদের কোনো সমর্থকদের ইরাকে সেন্ট্রাল কমান্ডের টুইটার ও

ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক করেছিল। সামরিক নথিপত্র ও বিভিন্ন হুমকি আপলোড করেছে। পাশাপাশি টুইট করেছে, 'মার্কিন সৈন্যরা! আমরা আসছি, প্রস্তুত হ!' হোয়াইট হাউস এই ঘটনাকে সাধারণ সাইবার আক্রমণ হিসেবে নিয়েছিল। তারা যেসব নথি আপলোড করেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে নিরীহটা ছিল 'রিটায়ারড আর্মি জেনারেল অফিসার রোস্টার', এতে মার্কিন জেনারেলদের নাম, অবসরের তারিখ ও ই-মেইল আইডি ছিল! একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যসমৃদ্ধ নথি জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়াকে ডক্সিং বলা হয়।

স্কট অ্যাট্রেন সেসব গবেষকের একজন, যাঁরা মনে করেন আইসিসের আবেদনে সাড়া দেওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল যাদের, তাদের রক্ষায় মার্কিন সরকার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি। 'সরকারের বিশ্বাস ছিল তারা মডারেট ইসলাম প্রচার করছে। ফলে মানুষ উগ্রপন্থায় প্রভাবিত হবে না। আমি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে বলেছিলাম, তোমাদের কি বাচ্চাকাচ্চা নেই? বাচ্চাদের নিকট আবার মডারেট-কট্টর কী?'

দ্বাদশ অধ্যায়
ডিভোর্স : আল কায়েদা ও আইসিসের বিচ্ছেদ

২০১৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে আইসিস-ম্যাগাজিন দাবিকের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কভার স্টোরিতে ছিল, 'ভেতর থেকে দেখা আল কায়েদা।' তখন আল কায়েদার মূল কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান অঞ্চল। আবু জারির আশ শামি নামের একজন লিখেছিলেন প্রবন্ধটি। আবু মুস'আব জারকাবির সাবেক সহচর। এর ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে ছিল হতাশা আর বেদনার সুর। এককালের সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটির অধঃপতন দেখে লেখকের রাগের চেয়ে করুণাই হয়েছে বেশি। ২০১০ সালে ইরানের জেল থেকে মুক্তির পর তিনি ওয়াজিরিস্তান ভ্রমণ করেন। তাঁর আশা ছিল, সেখানে ইসলামি আমিরাতের শৌর্যের ছায়া দেখতে পাবেন। 'আমি ভেবেছিলাম সেখানে সিদ্ধান্ত আসে মুজাহিদিনদের থেকে। ভেবেছিলাম সেখানে তারা শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করে। কিন্তু আফসোস! সেখানে গোত্রীয় আইনের ঢামাঢোলই বেশি।'

শিশুরা এখনো সেক্যুলার সরকারের স্কুলে যায়। রাস্তাঘাট দেখে বোঝা যায়, সেখানে ইসলামাবাদের নিয়ন্ত্রণই বেশি। নারীরা পুরুষের সঙ্গে অবাধে চলাফেরা করে। হঠাৎ সামরিক অভিযান শুরু হলে মুজাহিদিন ভাইদের চলাফেরাই মুশকিল হয়ে যায়। এককথায় আল কায়েদার রাজত্ব এখন রূপকথা। সহসা ঝলকে উঠে মিলিয়ে যাওয়া বিজলির মতো। উপরন্তু আশ শামি আরও ব্যাখ্যা করেন যে পাকিস্তানের মুজাহিদিনদের প্রতারণা, বিশেষত আইমান আল জাওয়াহিরি ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের ওয়াজিরিস্তানের রঙ্গভূমি ছেড়ে চলে যাওয়া, সঙ্গে করে মুজাহিদিনদের গোপন ও অভ্যন্তরীণ বার্তা নিয়ে যাওয়ার ফলে আইসিসের ঐক্যে চিড় ধরেছে। ফলে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের ভেতরে গৃহযুদ্ধ। জাবহাতুন নুসরা সহসা আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

সিরিয়া যুদ্ধে আন নুসরার আবির্ভাব

২০১২ সালের আগস্টে মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের ধারণা অনুযায়ী সিরিয়ায় আল কায়েদার দুই শয়ের মতো যোদ্ধা ছিল। বিদ্রোহী যোদ্ধাদের তুলনায় খুবই নগণ্য একটি সংখ্যা। কিন্তু এপির রিপোর্ট অনুযায়ী, 'তাদের ইউনিট শহর থেকে শহরে

ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে আছে ইরাকের ঘাগু বিদ্রোহীরা, যারা বোমা তৈরিতে ওস্তাদ। ফলে আল কায়েদা দুই ডজনেরও অধিক আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়েছে।' পাশাপাশি জাওয়াহিরির উপদেশও কাজে লেগেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের শীর্ষস্থানীয় কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তা ড্যানিয়েল বেঞ্জামিনের ভাষ্য অনুযায়ী, 'বিদেশি যোদ্ধাদের বৃহৎ একটি দল সিরিয়ায় কিংবা সিরিয়ার পথে আছে। তিনি আরও দাবি করেন, পশ্চিমা সমর্থিত বিদ্রোহীরা আমাদের নিশ্চিত করেছে, তারা সতর্কাবস্থায় আছে। তারা আল কায়েদা কিংবা অন্য কোনো চরমপন্থী দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে চায় না।'

অবশ্য সেই সতর্কতার দৌড় বোঝা গেছে যখন এফএসএর ব্রিগেড আর ব্যাটালিয়নগুলো ক্রমাগত জিহাদি দলগুলোর তুলনায় তাদের অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতার অভিযোগ করতে শুরু করে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দলগুলোকে প্রাণঘাতী নয় এমন সব সহায়তা প্রদান শুরু করে। যেমন ওয়াকিটকি, নাইট ভিশন গগলস, ইন্সট্যান্ট ফুড ইত্যাদি। এফএসএ মূলত নির্ভর করত সরকারপক্ষ ত্যাগের সময় সৈন্যদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা অস্ত্র, সরকারি স্থাপনা আক্রমণের ফলে অধিকৃত অস্ত্রভান্ডার ও কালোবাজার থেকে কেনা অস্ত্রশস্ত্রের ওপর। কিন্তু ব্ল্যাক মার্কেটে অত্যধিক চাহিদার কারণে দাম ছিল আকাশছোঁয়া। সাধারণ কালাশিনকভ, রকেটচালিত গ্রেনেড লঞ্চার আর গোলাবারুদের দামই ছিল অনেক।

পাশাপাশি বিদ্রোহীদের অস্ত্রের অন্যতম উৎস ছিল সৌদি আরব ও কাতারের দেওয়া অস্ত্র। এই দুই গালফ স্টেট বিপরীতমুখী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামিস্ট বিদ্রোহীদের সহায়তা করত। পশ্চিমাদের জন্য এই পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর ছিল না। সিরিয়া যুদ্ধের একটি অনাবিষ্কৃত দিক হচ্ছে জাতীয়তাবাদী কিংবা সেক্যুলার যোদ্ধাদের চরম পন্থায় ঝুঁকে যাওয়া, নিদেনপক্ষে বাহ্যত। এটি ঘটেছিল অস্ত্রের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে। ২০১২ সালের জুনে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট এবং প্যাচার (Pacther) পোলস অব প্রিন্সটনের যৌথ উদ্যোগে সরকারবিরোধীদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বিদ্রোহীরা সবাই আসাদ-উত্তর সিরিয়া চায়, একদম স্পষ্ট। তবে তাদের ৪০ শতাংশ দামেস্কে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চায়, যারা নির্বাচনের আয়োজন করবে। ৩৬ শতাংশ বলেছে, তারা চায় একটি পুরোমাত্রার সাংবিধানিক পরিষদ, বিপ্লবোত্তর তিউনিসিয়ার মতো, যার দায়িত্ব হবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

এই মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে যায়, অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও। আন্তাকিয়া, ২০১১ সালের গ্রীষ্মে শহরটি একটি শরণার্থী ক্যাম্প, নিরাময় কেন্দ্র এবং বিদ্রোহীদের দূরবর্তী ব্যারাকে পরিণত হয়। আমরা একজন মূলধারার এফএসএ সদস্যের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। সে শার্পনেলের আঘাতের চিকিৎসা

নিচ্ছিল। মদ্যপ ছিল, মারিজুয়ানা সেবন করত। আসাদ-উত্তর সিরিয়ায় সে গণতান্ত্রিক সরকার দেখতে চায়, তা অকুণ্ঠচিত্তে বলছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত আপাদমস্তক এক ইসলামিক মিলিশিয়া, দেখতে অনেকটা চেচেন কিংবদন্তি যোদ্ধা ইমাম শামিল বাসাইয়াভের মতো। কারণ তার ব্রিগেডের অর্থায়ন করত মুসলিম ব্রাদারহুড। তাই বাহ্যিকভাবে হলেও ধার্মিকতা প্রদর্শন করতে হতো, নিজ যোদ্ধাদের খরচ জোগাতে।

আরেকজন বিদ্রোহী নেতা অভিযোগ করেছে, কীভাবে সে তার সবকিছু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে, হামায় পারিবারিক খনি ব্যবসা থেকে শুরু করে স্ত্রীর গয়নাগাঁটি পর্যন্ত, তার প্রতিষ্ঠিত কয়েক শ যোদ্ধার ছোট দলটি বাঁচিয়ে রাখতে। অথচ সিরিয়াজুড়ে জিহাদি নেতারা টাকার বস্তা নিয়ে সেফ হাউসে বসে থাকত। কমরেডদের মাঝে অকাতরে অর্থ বিলি করত গোলাবারুদ-অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য। আট বছর পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র আর পূর্ব সিরিয়া ও পশ্চিম ইরাকে মুজাহিদিন আনা-নেওয়ার চোরাপথের স্রোত বিপরীত দিকে বইছিল।

২০১২ সালের ১১ ডিসেম্বর আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট আল কায়েদার সিরিয়ান শাখা আন নুসরার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অভিযোগ ছিল, তারা 'আল কায়েদা ইন ইরাকের মতবাদ ও কলাকৌশল ধার করেছে, সিরিয়ায় অস্থিতিশীলতার সুযোগে নিজেদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের ধান্দা করছে, যা সিরিয়ার জনগণ ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।' এই নিষেধাজ্ঞা কোনো কাজে তো আসেইনি, উল্টো বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে আন নুসরার পতাকাতলে একতাবদ্ধ করেছে। আদর্শিক কারণে নয়, বরং যুদ্ধকালীন সংকটের কারণে।

ড. রিদওয়ান জাইদা, ওয়াশিংটনে বসবাসকারী সিরিয়ান ভিন্নমতাবলম্বী, সাবেক সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলেসর সদস্য, যা ছিল সরকারবিরোধীদের প্রথম প্ল্যাটফর্ম। তাঁর মতে, আমেরিকার সিদ্ধান্ত ছিল পুরোপুরি ভুল। কারণ তা আসাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেছে। শুরু থেকেই তিনি চাচ্ছিলেন তাঁকে উৎখাতের এই আন্দোলনকে সন্ত্রাসী আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করতে। সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীরাও মার্কিন সিদ্ধান্তকে এভাবেই দেখেছে।

ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ান বিদ্রোহীরা নো ফ্লাই জোন প্রতিষ্ঠা কিংবা এফএসএর জন্য মার্কিন অস্ত্র সহায়তা চেয়ে চেয়ে যখন ক্লান্ত, তাদের ভাগ্যে জুটেছে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা! তাও এমন একটি দলের বিরুদ্ধে, যারা বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শক্তি। শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াইয়ে ক্লান্তিহীন। ফলে ২০১২ সালের ডিসেম্বরের এক শুক্রবার সিরিয়াজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। বিক্ষোভের স্লোগান ছিল 'আমরা সবাই জাবহাতুন নুসরা'!

আইসিস-নুসরা গাঁটছড়া

আইসিস-আন নুসরার ঐক্যের সংবাদ ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দারা সর্বপ্রথম যাঁর থেকে জানতে পারে, তিনি আর কেউ নন, খোদ আবু বকর আল বাগদাদি! ২০১৩ সালের ৮ এপ্রিল প্রকাশিত এক অডিও বার্তায় এই ঘোষণা সম্প্রচারিত হয়। নুসরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় এক বছরেরও আগে। এই সময়ে এটি নিজেকে যুদ্ধের অগ্রসেনানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। মাত্র এক মাস আগে আহরার আশ শাম ও জাবহাতুন নুসরার নেতৃত্বে কিছু বিদ্রোহী গ্রুপ মিলে তাদের প্রথম ও একমাত্র প্রাদেশিক রাজধানী সিরিয়ান সৈন্যদের থেকে দখল করে নেয়—পূর্বাঞ্চলীয় রাক্কা শহর। এর ডাকনাম ছিল 'হোটেল অব দ্য রেভল্যুশন তথা বিপ্লবের পান্থনিবাস'। কারণ সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের এই শহরের জনসংখ্যা তিন গুণ বেড়েছে।

কাকতালীয়ভাবে রাক্কার পতন মধ্যপ্রাচ্যের যুগান্তকারী আরেকটি ঘটনার বর্ষপূর্তির সঙ্গে মিলে যায়। আজ থেকে ১০ বছর আগে আমেরিকা অপারেশন এনড্যুরিং ফ্রিডমের নামে ইরাকে আগ্রাসন চালায়। দুই ঘটনার সামঞ্জস্য ছিল অবাক করার মতো। প্যারাডাইস স্কয়ারে স্থাপিত সাদ্দাম হোসেনের বিশালকায় মূর্তিটি ভেঙে ফেলতে মার্কিন মেরিন সেনারা স্থানীয় জনসাধারণকে সহায়তা করেছিল, পরপরই স্মৃতিস্তম্ভটি মার্কিন পতাকায় মুড়িয়ে দেওয়া হয়, যা তুমুল বিতর্ক তৈরি করেছিল। তেমনি ইসলামিস্টরাও রাক্কায় হাফিজ আল আসাদের সুবিশাল স্ট্যাচুটি ভেঙে ফেলে। এর স্থলে কালিমায়ে শাহাদাহ খচিত কালো পতাকা টানিয়ে দেয়—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। পতাকাদণ্ড গেঁথে দেয় বাথশাসিত মেট্রোপলিটন সিটির প্রাণকেন্দ্রে।

কদিন বাদেই রাক্কার ভবনে ভবনে শোভা পেতে শুরু করে চুরির সাজা হাত কাটার গ্রাফিতি। আন নুসরার আঁকা। নারীদেরকে তাদের যথাযথ বিনয়ী পোশাক পরার দিকনির্দেশনা দিয়ে পুস্তিকা বিলি করা হয়। সরকারের পতনে অনেক অধিবাসী খুশি হলেও তাদের নতুন প্রভু এবং সঙ্গে করে নিয়ে আসা বিভেদের রাজনীতিকে খুব একটা স্বাগত জানাতে পারেনি। নিউইয়র্কারে রানিয়া আবু জাইদ সর্বস্তরের রাক্কান জনগণ ও আন নুসরা সদস্যদের মাঝে চলমান তুমুল এক মতদ্বৈততার কথা জানায়। তারা একটি পুস্তিকা বিলি করছিল, যাতে 'ফ্রি সিরিয়ান' পতাকা সরিয়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। পতাকাটি গৃহীত হয়েছিল বিপ্লবের প্রথম দিকের মাসগুলোতে। ইসলামি দলসহ অন্যান্য বিরোধী দল মিলে ত্রিরঙা এই পতাকা গ্রহণ করেছিল।

আবু নুর নামের ২০ বছর বয়সী একজন আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে শাহাদাহ সংবলিত পতাকা সিরিয়ায় মার্কিনিদের ভুল হস্তক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। 'আমরা

মার্কিন ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারি বিশালকায় এই পতাকার কারণে।' আবু মায়েদা, একজন প্রবীণ নাগরিক, যিনি ইরাক থেকে গুলি চোরাচালানে বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদেরকে তারা চরমপন্থী ভাবতে পারে।' আন নুসরাকে তিনি বলেছেন, তাদের পতাকা বিপ্লবের মৌলিক নীতিমালার লঙ্ঘন। 'আমরা কোনো ইসলামিক এমারাত নই, আমরা সিরিয়ান। সিরিয়ার অংশ। তোমাদের কালো পতাকা একটি ধর্মীয় ব্যানার, কোনো রাষ্ট্রের পতাকা নয়।'

আইএসআই রাক্কা দখল করেছিল গোপনে, প্রায় রাতারাতি। সিরিয়াজুড়ে আইএস-নুসরার একীভূতকরণের ফলে। ২০১৩ সালের ৮ এপ্রিল আল বাগদাদি তাঁর ঘোষণায় বলেন, 'যখন সিরিয়ার পরিস্থিতি এতই নাজুক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রক্তের বন্যা বইতে শুরু করেছে, সম্ভ্রম বিনষ্ট হতে শুরু করেছে, সিরিয়ার মানুষ সহায়তার আকুতি জানিয়েছে, তখন কেউ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। সবাই যখন তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে, আমরা এগিয়ে এসেছি। আমরা ভুলে যেতে পারিনি। আমরা আমাদের সেনানী আল জোলানিকে পাঠিয়েছি। সঙ্গে পাঠিয়েছি আমাদের সন্তানদের। ইরাক থেকে তাদেরকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছি আমাদের সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমরা তাদের জন্য পরিকল্পনা গুছিয়ে দিয়েছি, নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছি, প্রতি মাসে আমাদের ট্রেজারির অর্ধেক সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করছি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ দেশি-বিদেশি যোদ্ধা দিয়েছি। আমরা নিরাপত্তার কারণে এসব প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু এখন আমাদের ব্যাপারে মিডিয়ার বিকৃতি, মিথ্যাচার ও গোঁজামিলের কারণে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি।'

বাগদাদি ইতিমধ্যে কী ঘটেছে শুধু সেটা ঘোষণা দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও বলেছেন। আইএসআই ও আন নুসরা একীভূত হয়ে এক সংগঠনে পরিণত হবে, আন্ত-আঞ্চলিক জিহাদি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে, নাম হবে ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড শাম বা আইসিস (ISIS), বিকল্প নামেও পরিচিতি পায় এটি- ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট বা আইএসআইএল (ISIL)।

আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, আল জোলানির প্রত্যুত্তর এসেছে দুই দিন পর। তাঁর ইরাকি গুরুকে তিনি সম্বোধন করেছেন 'সম্মানিত শায়েখ' বলে, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি একীভূতকরণ সমর্থন করেননি, পূর্বেই কিছুটা অনুমান করা গিয়েছিল। আইএসআই নিজেদের যৎসামান্য বাজেট থেকেও সিরিয়ান শাখায় ব্যয়ের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, সেই সঙ্গে বাগদাদি কর্তৃক তাঁকে আন নুসরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রেরণের সত্যতা নিশ্চিত করেন। আল জোলানি তাঁর আনুগত্যের জোয়াল কোথায় বাঁধা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ

রাখেননি—আইমান আল জাওয়াহিরি, দ্য শাইখ অব জিহাদ। জোলানি জনসম্মুখে জাওয়াহিরির প্রতি তাঁর ও আন নুসরার বাইয়াত নবায়ন করেন।

এর পরপরই আন নুসরার মিডিয়া প্রচারণা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়, সঙ্গে আইসিসের আগড়ম-বাগড়ম বৃদ্ধি পায়। নুসরার অফিশিয়াল মিডিয়া আল মানারুল বাইদা (শ্বেতমিনার) হালনাগাদ তথ্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পক্ষান্তরে আইসিসের অসংখ্য ভিডিও প্রকাশিত হয়। ফলে আল জোলানির ওপর বাগদাদি বিজয়ী হয়েছেন, এমন জল্পনা-কল্পনা ডালপালা মেলতে শুরু করে। ২০১৩ সালের মে-জুনের মাঝামাঝিতে আইমান আল জাওয়াহিরি হস্তক্ষেপ করেন, যেভাবে দুই দস্যি ছেলের মারামারি বন্ধে ক্লান্ত পিতা হস্তক্ষেপ করে থাকেন।

আল জাজিরায় প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে তিনি ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্তের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। তিনি বাগদাদিকে ভুল সাব্যস্ত করেন, কারণ তিনি তাঁদের অনুমতি কিংবা নিদেনপক্ষে তাঁদেরকে অবগত করা ব্যতীতই আইসিস প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। তার ওপর আল জোলানিকেও দোষী সাব্যস্ত করেন। কারণ তিনিও তাঁদের অনুমতি কিংবা অবগতকরণ ছাড়াই আল কায়েদার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তির স্বীকারোক্তি ও আইসিস গঠনের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের দিকনির্দেশনা চাননি তিনি।

তিনি বিষয়টি সমাধান করে দেন। আইসিস ও আন নুসরা দুই দলকেই যার যার সীমানায় থাকার আদেশ দেন। আইসিস ইরাক নিয়ন্ত্রণ করবে, সিরিয়ার দায়িত্বে থাকবে আন নুসরা। কোনো সন্দেহ নেই যে জাওয়াহিরির সিদ্ধান্ত দুই দলকে নতুন উদ্যমে তাদের বিতর্ক শুরু করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনিও তাঁর বাজি লাগান। নতুন করে শুরু হওয়া ঝগড়া-বিবাদ থামাতে তিনি আবু খালিদ আস-সুরিকে দায়িত্ব দেন। কদিন বাদেই আন নুসরা ও আইসিস পাল্টাপাল্টি আক্রমণ শুরু করে, তখন আস সুরিকে তিনি একটি শরিয়া কোর্ট স্থাপন করে এ বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষমতা দেন।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আস সুরি এক আত্মঘাতী হামলায় নিহত হন। স্বাভাবিকভাবেই আঙুল ওঠে আইসিসের দিকে। তিনি ছিলেন আল কায়েদার একজন ঘাগু এজেন্ট। ২০১১ সালে আসাদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তিপ্রাপ্তদের একজন। তিনি হরকাতু আহরারিশ শাম আল ইসলামিয়ার (দ্য ইসলামিক মুভমেন্ট অব দ্য ফ্রি মেন অব দ্য লেভান্ত/আহরার আশ-শাম) একজন প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান সিরিয়ায় সবচেয়ে ক্ষমতাধর বিদ্রোহী দলগুলোর একটি। মৃত্যুর আগে তিনি ছিলেন আন নুসরা ও আহরার আশ শামের মধ্যকার দীর্ঘমেয়াদি ঐক্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

জাওয়াহিরির অভিভাবকসুলভ কর্তৃত্ব তাঁর দুই ফিল্ড কমান্ডারের দ্বন্দ্বে হুমকির মুখে পড়তে পারে—এই সন্দেহ সত্য প্রতীয়মান হয়। আবু বকর বাগদাদি জাওয়াহিরির রায় অমান্য করেন। অবাধ্যতার পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল জাওয়াহিরি ইরাক-সিরিয়া ভাগাভাগির মাধ্যমে মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাদের তৈরি কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় সীমানা মেনে নিচ্ছেন। বিশেষত, সাইকস-পিকট চুক্তি। শাইখ অব জিহাদের ওপর এটি সাধারণ কোনো অভিযোগ ছিল না।

স্যার মার্ক সাইকসের মস্তিষ্কপ্রসূত গোপন এই চুক্তি বিশ শতকে লন্ডন ও প্যারিসের মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্ট ভাগাভাগি হচ্ছিল এর মাধ্যমে। 'আমি আক্কা থেকে কিরকুক পর্যন্ত একটা সীমান্তরেখা টানব,' সাইকস ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে বলছিল। তবে মূল সাইকস-পিকট চুক্তি কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন মূল চুক্তিতে মসুল ছিল প্যারিসের ভাগে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সেটি গিয়েছে ইরাকের ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে। চুক্তিটি যদিও প্রায় ১০০ বছর আগে উসমানিয়া সালতানাতের সীমানায় টানা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তা ভালোভাবেই মেনে নিয়েছে। বাথিস্ট, কমিউনিস্ট, প্যান আরব ন্যাশনালিস্ট কিংবা ইসলামিস্ট—সবাই।

চুক্তিটি ছিল মূলত, এখনো আছে, মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্যের দ্বিচারিতা ও কপটতার নমুনা। কিন্তু ২০১৪ সালের জুনে আইসিস মসুল দখল করার পর ইরাক-সিরিয়া সীমান্তরেখার ঢিবি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা বাহ্যিক ও প্রতীকী উভয়ভাবে সাইকস-পিকট চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এবং এটি ছিল জাওয়াহিরির সমাধানের সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। বাগদাদি কর্তৃক তাঁর মিসরীয় গুরুর বিরুদ্ধাচরণ জেনারেলের বিরুদ্ধে লেফট্যানেন্টের বিদ্রোহের চেয়ে অনেক গুরুতর। আইসিস আমির তাঁর গুরুকে সম্বোধন করেছেন 'ছিল' এবং 'বিক্রীত' বলে। আল কায়েদা-আইসিস কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়ে আইসিস-নুসরা বিচ্ছেদ আঞ্চলিক, বৈশ্বিক নয়, জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আন নুসরার অধিকাংশ বিদেশি যোদ্ধা আইসিসের ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য হয়েছে, বেশির ভাগই আল জোলানির নেতৃত্বাধীন লেজুড় সংস্থা ছেড়ে আইসিসে যোগ দিয়েছে। কারণ নুসরা ছিল ব্যাপকভাবে সিরিয়ান প্রভাবিত।

ইরাকের অভ্যন্তরেও আইসিসের গতি-প্রকৃতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বাগদাদি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁর পূর্বসূরিদের চাল চেলেছেন। জারকাবি যা সূচনা করেছিলেন, আল মাসরি ও প্রথম আল-বাগদাদি কর্তৃক সম্প্রসারিত হয়ে এখন আবু বকর আল বাগদাদি কর্তৃকও অনুসৃত হচ্ছে :

আইসিসের 'ইরাকায়ন'। সংগঠনের উচ্চপদগুলো ব্যাপকভাবে সাবেক সাদ্দামিস্টদের দখলে চলে যায়। সঙ্গে যোগ হয় আন নুসরা থেকে আসা নিম্ন ও মধ্যম সারির ক্যাডাররা। ফলে বাগদাদি নিজেকে আক্ষরিক অর্থেই একটি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রধান হিসেবে আবিষ্কার করেন, যার ব্যাপ্তি লেভান্ত আর মেসোপটেমিয়াজুড়ে। এভাবেই আল কায়েদাকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বাগদাদির হাত ধরে ইরাকে আইসিসের পূর্বরূপের প্রেতাত্মা পুরোমাত্রায় ভর করে।

রাক্কার স্কুলশিক্ষক

কীভাবে রাক্কায় আসাদ-বিরোধিতা ধীরে ধীরে হালে পানি পেয়েছে, তার স্মৃতিচারণা করছিলেন সউদ নওফেল। দিনটি ছিল ১৫ মার্চ, ২০১২। সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত প্রথম শহিদ আলি বাবিনস্কির মৃত্যুর পরপরই। মেয়েটির বয়স তখন ১৭। 'আমরা তাকে দাফন করেছি। তারপর তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ করছিলাম। তারা আমাদের ওপর নির্বিচারে গুলি ছুড়ে ১৬ জনকে চোখের সামনে মেরে ফেলে।' আইসিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথাও মনে আছে তাঁর। 'আমি বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করি, কারণ তারা ফাদার পাওলোকে অপহরণ করেছিল।'

ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত খ্রিষ্টান যাজক। কয়েক দশক ধরে দামেস্কের উত্তরে একটি যাজকপল্লির প্রধান। শুরু থেকেই বিপ্লবে সমর্থন দিয়ে আসছেন। রাক্কায় আইসিস-বিরোধী এক বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যান, সেই থেকে আর কোনো হদিস মেলেনি। 'পাওলো ছিলেন আমার মেহমান,' ৪০ বছর বয়সী, হিজাবধারী, ছোটখাটো গড়নের সাবেক স্কুলশিক্ষক নওফেল লেখকদের একজনকে বলছিলেন, ২০১৩-এর নভেম্বরে। 'তিনি সাধারণত প্রতি রমজানে আমার এখানে আসতেন। তিনি আইসিসের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়েছিলেন। হত্যা, গোপনীয়তা—ঠিক সেসব দুষ্কর্ম, যা সরকার করত—তিনি সেসব বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আইসিসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কখনো ফিরে আসেননি।' মডারেট আন্দোলনকারীদের নিকট নওফেল রীতিমতো হিরো বনে যান এবং ইন্টারনেটে ছোটখাটো সেলিব্রিটি হয়ে যান চার মিনিটের একটি ভিডিওর সুবাদে। এতে তিনি কঠোর শাসন ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে আইসিসকে রীতিমতো তুলাধোনা করেন। ভিডিওর শিরোনাম ছিল 'দ্য ওমেন ইন প্যান্টস' বা প্যান্ট পরিহিতা নারী, নারীদের জন্য আইসিসের ড্রেসকোডের প্রতিবাদে এমন নাম। নওফেল বলেছেন, তিনি বিগত দুই মাস শুধু তাঁর প্রদেশের নতুন ভাববাদীদের প্রতিবাদ করেই কাটিয়েছেন। কারণ তিনি ও তাঁর সহচররা আইসিসকে ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী হিসেবেই শুধু নয়, বরং যে স্বৈরাচারের

বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম, যার কবল থেকে মুক্তির মোহে তাঁদের বলিদান, তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখেন। 'জনগণের সঙ্গে তাদের আচরণ ভয়ানক। তারা পুরোপুরি আসাদ সরকারের মতো। জনগণকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখছে।'

বিপ্লবের সূচনাকালে মুখাবারাতের অনুরূপ আইসিসও জনগণকে রাক্কায় 'নাশকতা' সৃষ্টিকারী সব ধরনের ছবি ও রেকর্ড ধারণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। 'তারা রাস্তায় মানুষকে চাবকাবে, কেউ "অবৈধ" ছবি তুলতে গেলে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমি দেড় মাস যাবৎ তাদের প্রধান কেন্দ্রের সামনে প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু ভয়ে কেউই আমার কোনো ছবি তোলেনি।' নওফেলের বিশ্বাস—দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও যুদ্ধকালীন দুর্দশার কারণে এই প্রদেশে জিহাদি মুভমেন্ট সফল হয়েছে। তারা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অত্যন্ত কার্যকর এক পদ্ধতিতে রাক্কার বাচ্চাদের ব্রেনওয়াশ করা হতো। 'যেসব পরিবার দরিদ্র কিংবা অজ্ঞতার কারণে তাদের বাচ্চারা কী করছে না করছে সেসব নিয়ে মাথা ঘামাত না, তাদের ১০ বছরের বাচ্চাদের নিয়ে যেত, সঙ্গে আইসিসের পক্ষ থেকে পরিবারের খাদ্য ও অর্থের নিরাপত্তা দেওয়া হতো। এসব বাচ্চাকে শায়খ শায়খ ডেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলত, তাদের হাতে অস্ত্র ও ক্ষমতা দিয়ে শিশুসৈন্য হিসেবে গড়ে তোলা হতো। কিন্তু এরা ১০ বছরের শিশু, ধর্ম নিয়ে কখনো দু'ছত্রও পড়েনি, অথচ এখন তারা শায়খ বনে গেছে! আমি চিন্তিত যে এভাবে তারা আক্ষরিক অর্থেই মুসলিম ও ইসলাম আদতে কী, সে ধারণাটা ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

নওফেল স্থানীয় আইসিস হেডকোয়ার্টারের সামনে এক নিয়মিত চিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে অভিশাপ দেওয়া হতো, থুতু মারা হতো, টানাহেচড়া করা হতো, এমনকি গাড়িধাক্কাও দেওয়া হয়েছিল। 'আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম, সাদা-লম্বা দাড়িওয়ালা একজন আইসিস সেখানে তার গাড়ি পার্কিং করতে চেয়েছিল। এরিয়া ছিল অনেক বড়, তবু সে আমাকে বলছে সরে যেতে। তাকে আমি বললাম, নো। তো সে আমাকে শাপশাপান্ত শুরু করল, ভর্ৎসনা করল, কিন্তু আমি নড়িনি। অবশেষে সে তার গাড়ি দিয়ে দুবার আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, যদিও অতটা জোরে ছিল না। কারণ সে চাচ্ছিল প্রতীকী আঘাত।

'প্রতিদিন তারা আমার মাথায় কালাশিনকভ ঠেকিয়ে হুমকি দিত- ফুটো করে দেব কিন্তু! আমি বলতাম, কর! সমস্যা নেই। তবে দ্বিতীয় বুলেটটা যেন বাশার আল আসাদের মাথায় হয়। তারা খুব বিব্রত হতো।' তাঁর স্পর্ধা হয়তো তাদেরকে ক্রুদ্ধ করত কিন্তু তিনি বেঁচে গেছেন, কারণ একে তো তিনি ছিলেন ছোটখাটো মধ্যবয়সী একজন নারী। দ্বিতীয়ত একাকী আন্দোলন।' তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি একাধিকবার আইসিসের সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। শেষবার ছিল রাক্কার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আইসিস রাক্কার দুটি খ্রিষ্টান চার্চে আক্রমণ চালায়, জ্বালিয়ে দেয়। চার্চের বেদি থেকে ক্রুশ নামিয়ে সেখানে তাদের কালো জিহাদি পতাকা টানিয়ে দেয়। ২৫ সেপ্টেম্বর তারা একই কাজ করে সাইয়িদাতুল বিশারা ক্যাথলিক চার্চে। এ ঘটনার পর ডজন দুয়েক লোক প্রতিবাদ করার জন্য সেখানে জড়ো হয়। 'আমি তাদেরকে বললাম, এখানে কী করছ? হেডকোয়ার্টারে যাও!' নওফেল বলেছেন, তারপর তিনি হেডকোয়ার্টার অভিমুখে মার্চ করেন। কিছু আন্দোলনকারী তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেখেন তিনি একা! বাকি সব ভয়ে পালিয়েছে। পরদিন আরও একটি চার্চে আক্রমণ চালায়। লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে শুনে নওফেল সেখানে যান।

এবার তিনি একটি ব্যানার নিয়ে যান, যাতে লেখা ছিল 'ফরগিভ মি' বা আমাকে ক্ষমা করুন। লিখেছিলেন মূলত তাঁর পরিবারকে উদ্দেশ করে। কারণ সেদিন তিনি নিশ্চিত ছিলেন হয়তো তাঁকে অপহরণ করা হবে, নয়তো মেরে ফেলবে। 'প্রথমে তারা আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। আমার নিকট তারা একটি বোমা ছুড়ে মারে। ১০ মিনিটের মতো সেখানে ছিলাম। ১৬ বছরের এক বাচ্চা আইসিস এসে আমাকে বলে, তুমি তো মুরতাদ। তারপর তার সঙ্গীদের বলে তাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছ এখনো? সে আমাকে মেরেই ফেলতে চাচ্ছিল কিন্তু হয়তো কেউ তাকে আমার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়নি। পাঁচ মিনিট পর অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে একটি গাড়ি এল। লাফ দিয়ে একজন নেমে এসে আমার বাহু ধরে টানতে লাগল, আমার কাঁধে আঘাত করছিল। আরেকজন আমাকে থুতু দিচ্ছিল, অভিশাপ দিচ্ছিল। ভাবছিলাম এবার বুঝি শেষ। আশপাশের সিরিয়ানদের ডাকতে শুরু করলাম। আমি চিৎকার করছিলাম, "তোমরা এবার সুখী তো, সিরিয়ানরা? তারা আমার সঙ্গে কী করছে দেখো, তোমাদের নারীদের দেখো কীভাবে ধর্ষিত হচ্ছে, কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আর তোমরা বসে বসে তামাশা দেখছ"।'

নওফেল বলেছেন, এর পর থেকে তিনি শুধু প্রতিবাদ করার জন্যই বাইরে বের হতেন, যতক্ষণ না রাস্তায় কেউ তাঁকে চিনতে পারত ততক্ষণ থাকতেন। কোনো আইসিস সদস্য দেখামাত্রই তিনি স্থান ত্যাগ করতেন। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেন না, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতেন। নিজ শহরেই পলাতক। অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পরিবর্তনের আশা নেই তাঁর। 'যদি জনগণ ভয় পায়, রাক্কা কখনো আইসিসের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আসাদের মতো মানুষকে আতঙ্কিত করে রাখবে, এটা স্বাধীন হবে না।'

নওফেল পরে তুরস্কে চলে যান।

নওফেলের মতো হাজার হাজার মানুষ রাক্কা ও রাক্কার বাইরে আইসিসের প্রতিবাদ করেছে। আবু জারির আশ শামালি আল কায়েদার ওয়াজিরিস্তান অভিযানের কঠিন সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, গোটা অঞ্চল ছিল পশতুন গোত্রগুলোর দাস, মুজাহিদিনদের সেখানে কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এই সমালোচনার ফলে আইসিস শুরু থেকেই সাহওয়াতদের ব্যাপারে সতর্ক ছিল। ইরাকে হোক কিংবা সিরিয়ায়। তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যেন কোনো সাহওয়া গড়ে না ওঠে। কিন্তু তা বুমেরাং হয়েছে। উল্টো সাহওয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

সেদিন ছিল ২০১৩ সালের ১১ জুলাই। লাতাকিয়ার চেকপয়েন্টে কামাল হামামি নামের এফএসএর সুপ্রিম মিলিটারি কাউন্সিলের এক সদস্যকে আইসিসের বন্দুকধারীরা গুলি করে মেরে ফেলে। এই হত্যাকাণ্ডের পর উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। 'আমরা আমাদের মেঝে পরিষ্কার করব এখন, সেখানে কোনো আইসিস থাকবে না'- এফএসএর এক কমান্ডার রয়টার্সকে বলেছে। কিন্তু এই উত্তেজনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। হামামির হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য শরিয়া ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করা হয়। একইভাবে আইসিস যখন ভুলক্রমে মুহাম্মদ ফারেসের শিরশ্ছেদ করে, তারা ভেবেছিল সে ইরাকি শিয়া মিলিশিয়া, কারণ ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে সে নাকি শিয়া মন্ত্র আওড়াচ্ছিল! পরে হুঁশ হলো যে সে ছিল আহরার আশ শামের কমান্ডার! তড়িঘড়ি করে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। বোঝাপড়া করতে চেয়েছে যেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানো যায়।

আইসিস, কোনো ইসলামি দল, মূলধারার কোনো গ্রুপ, কেউই একটি গৃহযুদ্ধের ভেতর আরেকটি গৃহযুদ্ধ শুরু করতে আগ্রহী ছিল না। এ জন্যই এফএসএ যদিও আইসিসের কঠোর শাসনকে সিরিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি মনে করত, কিন্তু তারা এও বুঝত যে অত্যাসন্ন সাহওয়া শুধু একজনকেই লাভবান করবে—বাশার আল আসাদ। তখন তিনি যদি এফএসএর নরমাংস ভক্ষণে আইসিসকে সহায়তা নাও করেন, তবু বসে বসে বিরোধীদের নিজেদের কামড়াকামড়ি দেখবেন। কিন্তু আইসিসের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছিল, তারা চপেটাঘাত খাওয়ার জন্য অন্যদের উসকে দিতে বদ্ধপরিকর। তারা বিরোধী গ্রুপের সিনিয়র নেতাদের কিডন্যাপ করত, নিজেদের এলাকার জনসাধারণকে সশস্ত্র করতে শুরু করে, রাস্তায় রাস্তায় একক চেকপয়েন্ট বসায়, যেগুলো মূলত বিরোধী দলগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্যই বসানো হতো।

যেমন ২০১৩ সালের ১ আগস্ট আইসিস আহফাদুর রাসুলের (রাসুলের বংশধর) ক্যাম্পে গাড়িবোমা হামলা চালায়, এতে ৩০ জন নিহত হয়। তারপর আইসিস এই ব্রিগেডকে রাক্কা থেকে উৎখাত করে দেয়। সে বছর ডিসেম্বরের শেষ

দিকে ইদলিবের মারাত আন নুমান শহরে এক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলগুলোর ঐক্যের দাবিতে ছিল এই বিক্ষোভ। আরেকটি দাবি ছিল এফএসএ কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহমেদ সাউদের মুক্তির দাবিতে, কদিন আগেই মাত্র আইসিস তাঁকে এক চেকপয়েন্ট থেকে অপহরণ করেছিল।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সাউদ ছিলেন সিরিয়ান আর্মির দলত্যাগী সদস্য। একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে ইদলিবের তাফতানাজ এয়ারবেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আইসিসের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এফএসএর পক্ষত্যাগী দল ফুরসানুল হক থেকে আইসিসের চুরি করা কিছু সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধারের ব্যাপারে কথা বলা, এর মাঝে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটগান মিসাইলও ছিল। সাউদ ইদলিব মিলিটারি কাউন্সিলেরও প্রতিনিধি ছিলেন, এটি ইদলিব প্রদেশের সব বিদ্রোহী দলের যৌথ অ্যাসেম্বলি। এই অ্যাসেম্বলির পক্ষ থেকে জনসম্মুখে আইসিসের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল, তারা যেন তাদের হাতে অপহৃত সব সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেয়। এই অপহরণের বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে সউদ নিজেই অপহৃত হয়ে যান।

সউদের মুক্তির দাবিতে করা র‍্যালি অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইসিস তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেয়। তিনিই ছিলেন প্রথম কোনো এফএসএ কমান্ডার, যিনি তাদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন। ২৯ ডিসেম্বর আইসিস কাফরানবিলের কয়েকটি বিরোধী সংবাদমাধ্যমের ওপর চড়াও হয়। এটি ছিল ইদলিবের উত্তর-পশ্চিমের একটি শহর, যা দুই বছরের সরকারি বোম্বিং আর জিহাদিদের বিস্তারের পরও বিস্ময়করভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রেখেছিল, যা ছিল সিরিয়ান বিপ্লবের মূল সুর।

আক্রান্ত ভবনগুলোর মাঝে কাফরানবিল মিডিয়া সেন্টারও ছিল। ৪১ বছর বয়সী রায়েদ ফারেসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তিনি ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর আঁকা পোস্টার আর তাঁর লেখা ইংরেজি স্লোগানের বদৌলতেই আরব রেভল্যুশন পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিতি পায়। স্লোগানগুলোর প্রায় সবই লেখা ছিল কথ্য ও রসাত্মক ইংরেজিতে। ফলে বিশ্বজুড়ে এগুলো মানুষের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। কিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড নামে তাঁর এক পোস্টারে টাইটানিক মুভির দৃশ্য ব্যবহার করা হয়। তাতে পুতিনকে দেখা যায় লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর ভূমিকায়, আর ক্যাট উইন্সলেটের চরিত্রে ছিলেন বাশার আল আসাদ! পরবর্তী সময়ে ফারেস আইসিসের দমন-পীড়নকে আসাদের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেন এবং এই দুটিকেই সিরিয়ান জনগণের জন্য যমজ শত্রু হিসেবে অভিহিত করেন।

ফারেসের মিডিয়া সেন্টারে আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি একটি রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছিলেন, যাতে সিরিয়ান নারীরা তাদের সাম্প্রতিক সময়ে হওয়া ডিভোর্স নিয়ে কথা বলছিল। যথেষ্ট হয়েছে! তাকফিরিরা সেন্টারে আক্রমণ করে ছয়জন কর্মচারীকে অপহরণ করে, অবশ্য দুই ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সেন্টারের কম্পিউটার ও সম্প্রচার যন্ত্রপাতি কিছু নিয়ে যায়, বাকিগুলো ভাঙচুর করে ফেলে যায়। 'কাফরানবিল যে জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এটি নিয়মিত ও লাগাতার আন্দোলনে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছিল, তা যে রূপেই হোক না কেন। অহিংস আন্দোলন, সশস্ত্র বিদ্রোহ, মানবিক সহায়তা ও সিভিল সোসাইটির কাজকর্ম, সব ক্ষেত্রেই আমরা সমর্থন দিচ্ছিলাম,' ফারেস আমাদেরকে বলছিলেন। 'সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে তারা আমাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে। আইসিসের বিরুদ্ধে কোনো পোস্টার আঁকলে তারা আক্রমণ করবে। আইসিস-বিরোধী প্রথম প্রচার ছিল সে বছরের জুনে। তারপর তো তারা আমাদেরকে আক্রমণই করল। উভয়ে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দুটোই অত্যাচারী স্বৈরশাসক।' (ইউনাইটেড স্টেট ভ্রমণকালে ফারেসের এই সাক্ষাৎকার ধারণ করা হয়। এর পরপরই আইসিস ইদলিবে তাঁকে হত্যার জন্য গুপ্ত হামলা চালায়। বেশ কয়েকবার তাঁর ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। অবশ্য প্রতিবারই তিনি সেরে ওঠেন।)

২০১৪ সালের নববর্ষের দিন আইসিস সিরিয়ায় তাদের সব বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে যায়। হুসেইন আল সুলাইমানি, আবু রাইয়ান নামে পরিচিত, খুব সম্মানিত একজন ডাক্তারকে তারা হত্যা করে, তিনি আহরার আশ শামের কমান্ডার ছিলেন।

সাউদের মতো আবু রাইয়ানও আইসিসের সঙ্গে আলোচনার জন্য এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাদের হাতে অপহৃত হন। তাঁকে ২০ দিন বন্দী করে রাখা হয় এবং গুলি করে মারার আগে তাঁর ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়। তাঁর বিকৃত লাশের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। ফলে এত দিন আহরার আশ শামের যেসব সদস্য আইসিসের সঙ্গে সহাবস্থানে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারাও ক্ষুব্ধ হয়। আহরার আশ শাম এই বর্বরতাকে আসাদের মুখাবারাতের নৃশংসতার চেয়েও ঘৃণ্য বলে আখ্যায়িত করেন এবং সতর্ক করে দেন—যদি আইসিস এখনো পূর্ববৎ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি লাগাতার অগ্রাহ্য করতে থাকে, অন্যান্য দলের প্রতি তাদের অবিচার অব্যাহত রাখে, তবে এই বিপ্লব ও জিহাদ অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের বদ্ধ জলায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে, যার সর্বপ্রথম বলি হবে সিরিয়ার বিপ্লব।

জানুয়ারির ২ তারিখ আইসিস এফএসএর আরেকটি আস্তানায় হামলা চালায়, আলেপ্পোর আতারেব এলাকায়। এই হামলার ফলে অন্য ইসলামিক দলগুলোও এফএসএর সঙ্গে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। দ্য ইসলামিক ফ্রন্ট,

যারা মাত্র কয়েক মাস আগে ইদলিবের ইতমা গ্রাম থেকে এফএসএর অস্ত্র ও রসদভর্তি গুদাম দখল করেছিল, আইসিস-আক্রান্তদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। তারা একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে, 'আমরা আইসিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাৎক্ষণিকভাবে আল আতারেব শহর ত্যাগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। মিথ্যা অভিযোগে কোনো যোদ্ধাকে হত্যা বন্ধ করতে এবং অন্যায়ভাবে দখল করা সব অস্ত্র ও ঘাঁটি তার মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর আদেশানুপাতে তাদের ও অন্যদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে স্বাধীন ধর্মীয় আদালত স্থাপনে অবশ্যই রাজি হতে হবে। আইসিসকে আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোরা এখন যাদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত, মূলত তারাই আলেপ্পো ও আশপাশের মফস্বলগুলো মুক্ত করেছে।'

এ সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহমেদ সউদ নতুন বিদ্রোহী দল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন—দ্য সিরিয়ান রেভল্যুশনারিজ ফ্রন্ট। ইদলিব মিলিটারি কাউন্সিলের অধীন প্রায় ২০টি দল নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূলধারার এই নতুন দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—আইসিসকে মোকাবিলা করতে। সউদ আমাদেরকে বলেছিলেন। উত্তর সিরিয়ায় মুকুলিত এই সাহওয়ায় সর্বশেষ যোগদান করে দ্য আর্মি অব দ্য মুজাহিদিন। আলেপ্পোভিত্তিক আটটি বিদ্রোহী দলের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম ছিল এটি। 'আমরা, দ্য আর্মি অব দ্য মুজাহিদিন, আমাদের নিজেদেরকে, নিজেদের সম্মান, সম্পদ, ভূমি রক্ষায় ও আইসিস প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ। তারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে যতক্ষণ না তারা সংগঠন ভেঙে দেয়।'

আর্মি অব মুজাহিদিন আইসিসের সামনে দুটি কঠিন বিকল্প পেশ করে : হয়তো তারা মূলধারার বিদ্রোহে যোগ দেবে নয়তো তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে সিরিয়া ত্যাগ করবে। স্থানীয় সংঘর্ষ হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা এখন আইসিসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এর নেতৃত্বে ছিল দ্য ইসলামিক ফ্রন্ট, দ্য সিরিয়ান রেভল্যুশনারিজ ফ্রন্ট, দ্য আর্মি অব দ্য মুজাহিদিন। ফলে আইসিস উত্তর সিরিয়াজুড়ে তাদের অধিকাংশ তালুক থেকে উৎখাত হয়। কাকতালীয়ভাবে এই লড়াই ইদলিব ও আলেপ্পোতে আইসিসবিরোধী গণবিক্ষোভের সঙ্গে মিলে যায়। তারা আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচার গুলিবর্ষণের মাধ্যমে তা দমাতে চেয়েছিল।

এফএসএ পূর্বেই যেমনটা অনুমান করেছিল—আসাদ এই আত্মঘাতী লড়াইয়ে নিরপেক্ষ থাকেনি। আইসিসের পক্ষে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। মাঠপর্যায়ে লড়াই শুরু হওয়ার পরপরই সিরিয়ান এয়ারফোর্স সেসব অঞ্চলে বোম্বিং শুরু করে, যেখান থেকে সম্প্রতি আইসিস উৎখাত হয়েছে, এফএসএ ও ইসলামিক ফ্রন্টের ঘাঁটি লক্ষ্য করে। যদিও এরা জনসাধারণের ওপর আক্রমণ করেনি। ফলে আইসিস

সরকারের দালাল—এই বিশ্বাস অ্যাক্টিভিস্টদের মাঝে আরও বদ্ধমূল হয়ে যায়। জানুয়ারির ৪ তারিখে, এফএসএ কর্তৃক আইসিসের প্রতি অস্ত্র সমর্পণ ও সিরিয়া ত্যাগের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম প্রকাশের পরপরই প্রায় ২০০ জিহাদিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আইসিস সাধারণ মানুষকে হত্যা শুরু করে, বিদ্রোহীদের হত্যা করে, বিরোধীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গাড়িবোমা ও বোম্বিং শুরু করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে আইসিস তিন দফার একটি দাবিনামা পেশ করে। শহর-নগরের রাস্তার সব ব্যারিকেড তুলে নিতে হবে, আইসিসের কোনো যোদ্ধাকে বন্দী, অপমান কিংবা ক্ষতি করা যাবে না এবং আইসিসের সমস্ত বন্দী ও অন্যান্য দলের সব বিদেশি যুদ্ধবন্দীকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিতে হবে। যদি এই দাবির কোনো একটিও না মানা হয়, তবে আইসিস সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের যোদ্ধাদের সরিয়ে নেওয়ার সাধারণ আদেশ জারি করবে, যার নিহিতার্থ হচ্ছে এসব অঞ্চল পুনরায় আসাদের হস্তগত হবে। ৫ জানুয়ারি দ্য ইসলামিক ফ্রন্ট ঘোষণা করে, তাদের সাবেক মিত্রের সঙ্গে যোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য। এবং যেহেতু তারা নিজেদের ইশতেহারে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইচ্ছুক সব বিদেশি যোদ্ধাকে স্বাগত জানিয়েছে, তাই তারা এমন কোনো দলকে স্বীকৃতি দিতে পারে না, যারা নিজেদের 'স্টেট' বলে অভিহিত করে।

বিদ্রোহীরা আতারেব পুনর্দখল করে নেয়, সেখান থেকে কালো পতাকা সরিয়ে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির ত্রিরঙা পতাকা টানিয়ে দেয়। রাক্কায় শাম নিউজ এজেন্সির একজন অ্যাক্টিভিস্টের দাবি অনুযায়ী বিদ্রোহীরা ইদলিবের আশপাশের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা ও আলেপ্পোর ৬৫ শতাংশ এলাকা মুক্ত করে। আরেকজন ঘোষণা দেয়, 'বাগদাদির স্টেটের কবর রচিত হয়েছে', যদিও এটি খুব বেশি আশাবাদী শোনাচ্ছে।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষ নাগাদ রাক্কায় আইসিসের আঞ্চলিক সদর দপ্তরে আন নুসরা আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়, সঙ্গে ছিল আহরার আশ শাম। আইসিসের হাতে থাকা প্রায় ৫০ জন সিরিয়ান বন্দীকে ডিএমবি থেকে মুক্ত করা হয়। এটি ছিল তাদের অস্থায়ী বন্দিশিবির। তাদের হাতে থাকা অসংখ্য বিদেশি বন্দীর মধ্য থেকে একজনকে মুক্ত করা হয়—তুর্কি ফটোগ্রাফার বেনইয়ামিন আইগুন। মাসখানেক আগে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। আইসিসের ধ্বংস করা দুটি চার্চও আন নুসরা মুক্ত করে এবং ঘোষণা করে, এগুলো পুনরায় খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তাদের ব্যবহারের জন্য।

আহরার-নুসরা জোটের সঙ্গে আইসিসের এক ভঙ্গুর শান্তিচুক্তির ফলে আলেপ্পোর উপকণ্ঠে পরিস্থিতি আপাতত কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। কৌশলগতভাবে

গুরুত্বপূর্ণ তুর্কি সীমান্তবর্তী শহর থেকে আইসিস সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়, ইতমাহ ও আদ দানাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক সপ্তাহের এই 'ফিতনা'র জন্য আল জোলানি আইসিসকে দায়ী করেন, যা উত্তর সিরিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। অস্ত্রবিরতি নিয়ে মতদ্বৈততা নিরসনের জন্য একটি স্বাধীন লিগ্যাল কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি আরও বলেন, সব দলের হাতে থাকা বন্দী বিনিময় হবে এবং রাস্তাঘাট সব দলের জন্য খোলা থাকবে।

স্বল্প সময়ের এই সাহওয়ায়—যেখানে সিরিয়ান আল কায়েদা ছিল সাহওয়াতদের পক্ষে—আইসিস একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ স্লোগান তুলে 'বাকিয়্যা ওয়া তাতামদ্দাদ', টিকে থাকা ও বিস্তার লাভ। তাদের বিপক্ষে থাকা সব জনতাকে পরাজিত করার ও আরব উপদ্বীপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার অঙ্গীকার করে। তারা ইরাকের সীমান্তবর্তী শহর মায়াদিন ও দার আজজুরে আহরার আশ শামের ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালায়। তাদের মুখপাত্র আল আদনানি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, পাশাপাশি সিরিয়ান জনসাধারণের ওপর আত্মঘাতী আক্রমণ ও গাড়িবোমা হামলার হুমকি দেয়।

যা-ই হোক, 'ফিতনা'র সময়ে আইসিস এবং অন্য ইসলামি দলগুলোর বৈরিতা ও শত্রুতা পরিস্ফুট হয়ে যায়। আলেপ্পোর তৎকালীন আইসিস নেতা আবু ওমার আশ শিশানি ও আবু খালিদ আস সুরির মাঝে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুরি ছিল আহরার আশ শাম ও আন নুসরার নেতা, জাওয়াহিরির সিরিয়ান প্রতিনিধি। আপাতত তখনকার মতো জিহাদিদের মাঝে উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

আন নুসরা-আইসিস বিচ্ছেদ

আন নুসরা-আইসিসের সম্পর্কে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা ছিল অনতিক্রম্য। ২০১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আইসিসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করে। এক বিবৃতিতে তারা ঘোষণা করে, 'আইসিস এখন থেকে কায়েদাতুল জিহাদের (আল কায়েদার অফিশিয়াল নাম) শাখা নয়। সাংগঠনিকভাবে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কোনো কাজের দায়ভার আল কায়েদা বহন করবে না।' ২০১১ সালের রমজানে আল জোলানির সঙ্গে ইরাক সীমান্ত পাড়ি দেওয়া একজন জিহাদি হচ্ছেন আবু মারিয়া আল কাহতানি, তাঁর মূল নাম মায়সারা আল জুবুরি, টুইটারে আন নুসরার একজন নেতৃত্বস্থানীয় ও সক্রিয় প্রচারক। বিশেষত, আইসিসের সঙ্গে চলমান বৈরিতার ব্যাপারে। আল কাহতানি আইসিসের একজন শীর্ষ কমান্ডার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার পর পক্ষত্যাগ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে লেইদ আলখৌরি আমাদের বলেছেন, 'দার আজজুরে আন নুসরায় যোগ দেওয়ার আগে সে ট্রাফিক পুলিশ

হিসেবে কর্মরত ছিল বলে শোনা যায়। ইরাক ও সিরিয়ার জিহাদকে ধ্বংসের জন্য সে আইসিসকে দায়ী করে থাকে। সে তাদেরকে মুরতাদ হিসেবে অভিহিত করে।'

ঘর-সংসারের পুরো সময়টাই আজকের এই ডিভোর্সের ভিত তৈরি হয়েছে। সেই ১৯৯৯ তে কান্দাহারে বিন লাদেন আর জারকাবির প্রথম সাক্ষাতেই তাঁদের বৈরিতা প্রতিভাত ছিল। একিউআইর ১১ বছরের ঝাঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পথযাত্রায়ও এসব মতভিন্নতা পদে পদে পরিস্ফুট হয়েছে। এখন উভয় সংগঠনের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় কোয়ালিশন বাহিনীর বিমান হামলার ফলে যদিও তাদের মাঝে কৌশলগত কিছু সমঝোতা তৈরি হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পুনর্মিলনের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। দাবিকের চলতি সংখ্যায় তারা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, জিহাদের ময়দানে আল কায়েদা এখন অতীত! বিন লাদেনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আইসিস।

আলখৌরির মতে, দুইয়ের মাঝে পার্থক্য খুব গভীর ও ব্যাপক। 'আইসিস অতি-ডান ও অতি-রক্ষণশীল পথ বেছে নিয়েছে। তারা এমন লোকদেরও হত্যা বৈধ মনে করে, যাদের ছাড়া আপনি তাদের আগ্রাসন রোধ করতে পারবেন না। জোলানি তাদের একজন। শোনা যায়, বাগদাদি আল জোলানিকে হত্যায়ও বদ্ধপরিকর। কোনো মুসলিম অজ্ঞাতে কোনো অপরাধ করলেও আইসিস তাদেরকে মুরতাদ মনে করে। তো আপনি যদি ধর্মের অবজ্ঞা করেন, তারা আপনার শিরশ্ছেদ করবে। এটি ধর্মের অবজ্ঞা তা আপনি না জানলেও!'

আরেকটি গুরুতর মতভিন্নতা হলো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনেকটা 'ডিম আগে না মুরগি আগে'র মতো। আইসিসের আকিদা হচ্ছে আগে ভূমি দখল করতে হবে, প্রশাসন তৈরি করতে হবে। মানুষকে প্রথমে মুক্ত করতে হবে, তারপর আইন প্রয়োগ। আল কায়েদার আকিদা বিপরীত—জিহাদের মাধ্যমে তাগুত সরকার উৎখাত করার আগেই শরিয়া বাস্তবায়ন করা দায়িত্ব। আইসিসের দাবি অনুযায়ী, আবু মুস'আব জারকাবির পাঁচ ধাপে খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রকল্প ছিল। বাগদাদি যখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিন ধাপ অতিক্রান্ত হয়েছে : হিজরত বা বিদেশি যোদ্ধাদের জিহাদের ভূমিতে আগমন, জামা'আত তথা সামরিক বাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্তি, নুসরাহ অর্থাৎ মূর্তিপূজকদের (জারকাবি ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ছাড়া মোটামুটি সবাই) ওপর বিজয় অর্জন।

পাল্টা অভিযোগ

এই বিচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো জোলানি-অনুগতদের পক্ষ থেকে বাগদাদির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যে তাঁরা সরকারের চর, সরকারের জন্য কাজ করছেন তাঁরা। আন নুসরার অনেক সমর্থকই ২০১৩-২০১৪ সালে সিরিয়ান এয়ারফোর্স আইসিসের ওপর বোমা বর্ষণ থেকে বিরত থাকার ঘটনা

উল্লেখ করেছে। রাক্কায় আইসিসের উত্থানকে অনেক বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এই ঘটনা। কার্টার সেন্টার তাদের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখতে পেয়েছে, '২০১৪ সালের জুলাই-আগস্টের আগে সিরিয়ান সরকার আইসিসের সঙ্গে ঝামেলা পাকানো থেকে বিরত ছিল, অবশ্য হুমকি-ধমকি দিয়েছে অনেক। কিন্তু যখন অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপের ওপর আইসিসের আক্রমণ শুরু হলো, সরকারের বিমান হামলার ৯০ শতাংশেরও বেশি ছিল আইসিস-বিরোধীদের অবস্থান লক্ষ্য করে।'

দামেস্কের নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ২০১৩-২০১৪ সালের অধিকাংশ সময় তারা ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ও অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাদেরকে লক্ষ্য করেই বিমান হামলাগুলো পরিচালিত হতো। আইসিস নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পায়নি। কারণ ছিল খুবই সহজবোধ্য—বৃহৎ পরিসরে প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্য কালো পোশাকধারীদের সুযোগ দিয়েছে প্রাদেশিক রাজধানী দখলে নেওয়ার, ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার এবং শিরশ্ছেদ করার। সরকারের একজন উপদেষ্টা নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, আইসিসের স্থাপনা এড়িয়ে চলার ফলে সরকারের জন্য সব বিদ্রোহী দলকে সন্ত্রাসী-চরমপন্থী হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ এসেছে।

পাশাপাশি সরকার সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ঘোঁট পাকানোর জন্য তাদের ভেতর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। শুরুর দিকে আইসিসের একজন পক্ষত্যাগী ২০১২-এর ফেব্রুয়ারিতে সিএনএনকে বলেছে, সে ফ্রন্টলাইনে তাদের আমিরকে বলতে শুনেছে—আমরা সরকারি স্থাপনা এড়িয়ে যাব, হবু আত্মঘাতী হামলাকারীদের বলছিল। এবং বাস্তবেও তাদেরকে অন্য বিদ্রোহীদের ওপর সুইসাইড মিশনে পাঠানো হয়েছে। 'সরকারের এমন অনেক স্থাপনা ছিল, যেগুলো আমাদের কোনো যোদ্ধা না হারিয়েই আমরা কবজা করতে পারতাম,' দলত্যাগী আবু আম্মারা বলছিল। 'কিন্তু উল্টো আমরা পশ্চাদপসরণের আদেশ পেয়েছি!'

এর একটা কারণ হতে পারে সরকারের ওপর আইসিসের অর্থনৈতিক নির্ভরতা, যা তারা সরকারের নিকট তেল বেচে আয় করত। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে, আল কায়েদা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের মাত্র এক মাস আগে, একটি পশ্চিমা গোয়েন্দা সূত্র ডেইলি টেলিগ্রাফকে বলেছে, 'সরকার আন নুসরাকে তাদের অধিকৃত দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে তেল-গ্যাসের পাইপলাইন সুরক্ষার জন্য মাসোহারা দেয়। বিনিময়ে তারা সরকারনিয়ন্ত্রিত এলাকায় তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করে। এখন আইসিস নিয়ন্ত্রিত এলাকায়ও তেল-গ্যাসের ক্ষেত্রে একই প্রমাণ পাচ্ছি আমরা।'

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিরিয়াবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা ফ্রেডরিক হফ লিখেছেন, 'বাশার আর বাগদাদি পরস্পরের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে কী ভাবছে তা আমরা

জানি না। তবে সিরিয়ায় তাদের প্রধান রাজনৈতিক কৌশল পরিষ্কার—আসাদবিরোধী সিরিয়ান জাতীয়তাবাদীদের বিনাশ!' আলখৌরি বলেছেন, আসাদ-আইসিস যোগসাজশ কিংবা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আল কায়েদা মহলে খুবই ব্যাপক। 'পাঁচ-ছয় সপ্তাহ আগে একটি নথি আমার হস্তগত হয়। যে এটি প্রকাশ করেছে, তার বক্তব্য হচ্ছে এটি সিরিয়ান এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স থেকে এসেছে। এই নথির তথ্যমতে সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের প্রায় ২৫০ জন চর আইসিসের বিভিন্ন পদে আছে। আমি মোটেও অবাক হইনি। উল্টো আমি এটি প্রমাণ করতে ইচ্ছুক। সন্দেহের আবরণ সরিয়ে দিলে আরও সুস্পষ্ট হবে। বিগত কয়েক মাসে তারা সরকারের বহু সৈন্যকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু তারা একটি গুলিও ছোড়েনি। বরং আক্ষরিক অর্থেই তারা শত শত সরকারি সৈন্যকে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, আন নুসরা কিংবা অন্য ইসলামিক ব্রিগেডের মুক্তাঞ্চলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আইসিস কেন এমন করছে? আন নুসরার ভাষ্যমতে, তাদের নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে। অন্যরা সরকারি দলকে প্রতিরোধ কিংবা তাড়িয়ে দেবে, তারপর আমরা গিয়ে শাসন করব। ঠেলাটা তাদের ওপর দিয়ে যাক, কলাটা আমরা খাব।'

বাগদাদি লিকস নামে বিখ্যাত একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু তথ্য ফাঁস করা হয়। তার দাবি অনুযায়ী এগুলো আইসিস ইন্টেলিজেন্সের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও বাগদাদির অতীত সম্পর্কে। অ্যাকাউন্টটি কে চালায় তা নিশ্চিত নয়, তবে প্রবল ধারণা হয়তো আল কায়েদা কিংবা আইসিসের কোনো দলত্যাগী সদস্য সেটা চালায়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাবেক গুরুর অন্ধকার দিকগুলো উন্মোচিত করে হেনস্থা করা। তার অঙ্কিত চিত্র অনুযায়ী ২০০৬-২০১০ পর্যন্ত বাগদাদিকে দেখা যাচ্ছে আইসিসের মাঝারি পর্যায়ের একজন সদস্য হিসেবে। কিন্তু তাঁর বাড়ি যোদ্ধা ও কমান্ডারদের গোপন যোগাযোগের আখড়া হয়ে ওঠার পরপরই তিনি তরতরিয়ে উপরে উঠতে থাকেন।

আলখৌরির ভাষ্যমতে, যদি এটা সত্য হয়ে থাকে তবে 'তার কাজ ছিল ঘটকালি করা। গোপন সলাপরামর্শের অনেক কিছু সে জানত। কবে আক্রমণ হবে, কে দায় স্বীকার করবে, আইসিসের শুরা কাউন্সিলের গঠন, কে বেশি প্রভাবশালী কে দুর্বল—সব। এসব জানার ফলে সে ইরাকের অভ্যন্তরে কর্মরত সিরিয়ান চরদেরও চিনত। এভাবেই আন নুসরা তাকে কলঙ্কিত করে থাকে। "বাগদাদি জাওয়াহিরিকে বিভীষণ বলে আখ্যায়িত করে থাকে, সাইকস-পিকটের ত্রাতা বলে ডাকে? হাহ! ভূতের মুখে রাম নাম!"'

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শেখ বনাম শায়খ

'স্থলযুদ্ধে আর্থসামাজিক কাঠামোই ভাগ্যনিয়ন্তা' ২০০৩ সালে সাদ্দাম হোসেনের গ্রেপ্তারে সহায়তাকারী মার্কিন কর্নেল জিম হিকি বলছিলেন। 'ইরাক একটি গোত্রশাসিত সমাজ। গোত্রের সদস্যরা সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইরাক যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছে তাদের এই সমাজব্যবস্থা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা যখন এখানে এসেছিল, এই সমাজকাঠামোই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। আমরা যখন এসেছি তখনো।'

আইসিসের কৌশলগত প্রাণকেন্দ্র জাজিরার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। বিগত দুই বছর ধরে এমনই ঘটে আসছে। এ জন্যই সিরিয়ার অবস্থা এত ভজঘট পাকিয়ে গিয়েছে। আবু গাশিয়ার সেফহাউস ছিল সেখানে। তার অসংখ্য চর ও সীমান্তবর্তী আমির বা গোত্রনেতাদের জটিল সমীকরণে এগিয়ে চলছিল একিউআই।

কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার ক্ষমতাসীন বাথ পার্টি গোত্রনেতাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখত, দুই সরকার আলাদা মাপকাঠিতে তাদের মূল্যায়ন করত। যুদ্ধপূর্ব ইরাকের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো স্থানীয় রীতিনীতি, লোকজ সংস্কৃতি আর সাদ্দাম হোসেনকে মিলেমিশে একাকার করে দেখাত। এ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নি কোনো বিভাজন করত না। তাদের অবিচ্ছিন্ন আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ নানান প্রণোদনা দেওয়া হতো। কোনো কোনো গোত্রের দায়িত্ব ছিল তেল চোরাচালান, কারও ছিল কালোবাজারের ইজারাদারি।

একিউআই এসে শূন্য দশকের মাঝামাঝিতে প্রতিষ্ঠিত এই শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিল। তা ছিল নিজের পায়ে কুড়াল মারার নামান্তর। এর ফলে ইরাকে সাহওয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। নিজেদের পরাজয় ডেকে এনেছিল তারা।

পক্ষান্তরে আসাদ এই 'শেখদের' (গোত্রনেতা) ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। কৌশলগতভাবে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, ছিলেন অদক্ষও। 'সৌভাগ্যবশত' তিনি শেখদের দলে টানার অনেক সুযোগ নিজ 'অদক্ষতাবলে' নষ্ট করেছেন, যার ফল তিনি হাতেনাতেই পেয়েছেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও সংঘাত শুরু হয়েছে। উদাহরণত উত্তর সিরিয়ার কুর্দি-অধ্যুষিত এলাকায়, যখন

'আরবীকরণ' শুরু করেছে, উচিত ছিল উচ্ছৃঙ্খল কুর্দি জাতীয়তাবাদ নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁর আরবাইজেশনের প্রতিক্রিয়ায় কুর্দি জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। মোট কথা, সাদ্দাম যেভাবে শেখদের শক্তি অনুধাবন করতে পেরেছেন, আসাদ কখনোই রক্তসূত্রে গ্রন্থিত, মরুচারী এসব যূথবদ্ধ মানুষের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি।

ষাটের দশকের উত্থানকাল থেকে সিরিয়ান বাথ পার্টি গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় দুটি সম্ভাব্য হুমকি দেখতে পেয়েছে। এক, পূর্ব সিরিয়ার উপজাতি ও উত্তর-পূর্ব ইরাকের উপজাতিদের মধ্যকার গোত্রীয় সম্পর্ককে ইরাকি বাথ পার্টির জন্য সম্ভাব্য সুযোগ হিসেবে দেখেছে।[১৯] দ্বিতীয়ত, ক্ষমতারোহণের প্রথম বছরগুলোতে সিরিয়ান বাথ পার্টি 'পশ্চাৎপদ' এসব গোত্রকে পার্টির 'প্রগতিশীল' আদর্শের বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। গোত্রগুলোর সঙ্গে দামেস্কের বিমাতাসুলভ আচরণ বিপ্লব শুরু হওয়ার পর গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। দিরার কথাই বলা যায়। সেখানে সংঘটিত প্রথম দিককার বিক্ষোভগুলো হয়েছিল গোত্রীয় যোগসাজশে, গোত্রীয়-ছাপও ছিল পরিস্ফুট। বিক্ষোভকারীরা 'ফাজাত হাউরান'র আহ্বান জানিয়েছিল। হাউরান হচ্ছে উপত্যকার নাম, যেখানে দিরা অবস্থিত। ফাজাত হাউরান মানে হচ্ছে হাউরান উপত্যকার মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সিরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী যখন আন্দোলন দমনের জন্য সেখানে দমন-পীড়ন শুরু করে, দিরার বাসিন্দারা তাদের উপসাগরীয় 'কাজিন'দের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

২০১২ সালের শুরুতে বিপ্লব যখন বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়, তখন গোত্রীয় নেটওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের তহবিল সংগ্রহকারীরা গোত্রের প্রবাসী সদস্যদের নিকট সহায়তা চায়, অস্ত্রের জোগানে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষত সৌদি, কুয়েত ও বাহরাইন প্রবাসীরা। হোমসের উকাইদাত গোত্রের কথাও উল্লেখ করা যায়। তারা পূর্ব সিরিয়ায় বসবাসকারী উকাইদাতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাৎক্ষণিক তহবিল সংগ্রহে তাদের সামর্থ্য বেশি ছিল। কারণ তারা বেশির ভাগই বিভিন্ন গালফ রাষ্ট্রে বসবাস করত। কিছু সর্ব-সিরিয়ান বিদ্রোহী গ্রুপও গড়ে উঠেছিল, বাহ্যত গোত্রীয় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে।

---

[১৯] ইরাক-সিরিয়া দুই দেশেই বাথ পার্টি ক্ষমতায় থাকলেও তাদের আদর্শে ছিল ভিন্নতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। একটি ছিল সুন্নি, আরেকটি শিয়া প্রভাবিত। ফলে ইরাকি উপজাতিদের সাথে সিরিয়ান উপজাতিদের রক্তের সম্পর্ক সিরিয়ার জন্য সব সময় ভীতি তৈরি করে রেখেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, সাদ্দাম এদের ব্যবহার করে সিরিয়ায় গোলযোগ তৈরির চেষ্টা করবেন। -অনুবাদক।

আহফাদুর রাসুল এমনই একটি দল। এদের নেতা ছিল হোমসের মাহের আল নুয়াইমি এবং দার আজজুরের সাদ্দাম আল জামাল, দুজন ছিল একই গোত্রের। 'হোমসের আল ওয়ারুল কদিম ও দারুল কাবিরা গোত্র, হামা ও দামেস্কের উপকণ্ঠের বেশ কিছু গোত্র আমাদের সঙ্গে আছে,' বলছিল এফএসএর এক তহবিল সংগ্রহকারী। 'গোত্রীয় পরিচয়ে আমরা একে অপরকে চিনি।'

বিপ্লবের সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্রটা শিগগিরই জিহাদিদের দখলে চলে যায়। আল কায়েদা ও আইসিসের অনেক সফলতার পেছনে সিরিয়ার গোত্রভিত্তিক অঞ্চলগুলোর কৃতিত্ব রয়েছে। আল কায়েদার সফলতার পেছনে রয়েছে অধিক জনবহুল ও ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো। দার আজজুর, হাসাকা, রাক্কা ও দিরায় গোত্রপ্রথা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এসব অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ গোত্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ। আলেপ্পোর গ্রামীণ জেলাগুলোতেও প্রায় দুই মিলিয়ন গোত্রবদ্ধ মানুষ রয়েছে। গোত্রগুলো সিরিয়ার সম্পূর্ণ জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ আর তাদের হাতে রয়েছে ৬০ শতাংশ ভূমি। মোটকথা, মফস্বলগুলোর অধিকাংশই ছিল গোত্রগুলোর দখলে। ফলে সেখানে বিদ্রোহীরা অনায়াসেই অনুপ্রবেশ করতে ও আখড়া গাড়তে পেরেছে। ইরাকেও একই ঘটনা ঘটেছে। জারকাবিস্টরা এসব এলাকায় জড়ো হতো, বিরোধীদের ওপর যখন বড়সড় কোনো আক্রমণের পরিকল্পনা করত কিংবা শহরাঞ্চল থেকে বিতাড়িত হতো।

রাফদানের প্রতিশোধ

২০১২ সালের দিকে সিরিয়ার গোত্রতন্ত্রের সবচেয়ে সফল ব্যবহার করেছে জাবহাতুন নুসরা, আইসিসও পিছিয়ে ছিল না। ছোট্ট শহর দার আজজুরে সর্বপ্রথম আন নুসরার যে ইউনিটটি গঠিত হয়, তার নাম ছিল আল গারিবাহ, শহরের প্রায় সব নাগরিকই ছিল এক পরিবারের সদস্য! আবার যেহেতু দার আজজুর ইরাক-সিরিয়াকে সংযুক্ত করেছে, তাই ২০০৩-২০০৪ সালে ইরাক বিদ্রোহে আবু গারিবাহর অনেকেই যোগ দিয়েছিল (যদিও তখন দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি), জারকাবির মতাদর্শে রঙিন হয়ে ফিরে এসেছে।

২০১২ সালের জানুয়ারিতে আসাদ দার আজজুরে নুসরার আল গারিবাহ ইউনিটটির খোঁজ পান। একে পুরোপুরি মিশিয়ে দেন। ডজন ডজন সদস্যকে হত্যা করেন। তারপর নুসরা পার্শ্ববতী/সুহাইল শহরে স্থানান্তরিত হয়। বহুকাল ধরে এই শহর ছিল ইরাক-সিরিয়ার অস্ত্র চোরাচালানের কেন্দ্রস্থল। এর নামকরণ করা হয়েছিল প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে। এখানে বসবাসকারী প্রায় প্রতিটি পরিবার সালাফিজমের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। হাজর পরিবারের কথা বলা যায়। সত্তর ও আশির দশকে মুসলিম ব্রাদারহুডের অংশ হিসেবে তারা হামার লড়াইয়ে

অংশগ্রহণ করেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত 'ফাইটিং ভ্যানগার্ড'-এর সদস্য ছিল। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর হাজর গোত্রের বহু সদস্য সেখানকার সুন্নি-বিদ্রোহে অংশ নেয়। সিরিয়ার বিপ্লবে যখন আন নুসরার আবির্ভাব হয়, ডজন ডজন 'হাজরি' তাতে যোগ দেয়। ২০১২ সালের গ্রীষ্মকালে শহরটি পুরোপুরি নুসরার দখলে ছিল। এমনকি এটি 'সুহাইলিস্তান' নামে পরিচিতি পায়। 'জাবহাতুন নুসরার নামে নেতিবাচক কিছু বলা মানে সুহাইলিদের অপমান করা,' বলছিল আমির আদ দানদাল, দার আজজুরের প্রভাবশালী এক গোত্রনেতা, ফ্রি সিরিয়ান আর্মির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। পরবর্তী সময়ে আইসিস-নুসরার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের অন্যতম একটি কারণ এই গোত্রীয় দ্বন্দ্ব। ২০১৩ সালের এপ্রিলে নুসরা ও জাইশুল মুতা মিলে (সুহাইলির আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপ) আবু আসাফ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আবু আসাফ হচ্ছে দার আজজুরের তৃতীয় বৃহত্তম গোত্র আলবু সারায়া গোত্রের শাখা। নুসরার সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে পরবর্তী সময়ে আবু আসাফ আইসিসকে সমর্থন দিয়েছিল, নুসরা-আইসিস লড়াইয়ে।

তেমনই আরেকজন হচ্ছে আমের আর-রাফদান, আন নুসরার একজন সিনিয়র সদস্য, কিন্তু দলত্যাগ করে আইসিসে যোগ দিয়েছিল। আইসিসে যোগদানের ক্ষেত্রে আদর্শ যতটা না প্রভাব রেখেছে, তার চেয়ে বেশি ছিল পৈতৃক আনুগত্যের প্রভাব। আর-রাফদান ছিল জাদিদ উকাইদাতের আল বিকাইয়ির গোত্রের শাখা, সুহাইলিদের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে তাদের খিটিমিটি চলছিল। আল রাফদান নুসরা ছেড়ে আইসিসে যোগদানের ফলে আইসিস কোনাকো গ্যাসক্ষেত্রের দখল পায়। এটি দার আজজুরের মায়াদিন শহরে একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের আধার। বাগদাদির পকেট ফুলেফেঁপে ওঠে। পাশাপাশি বিকাইয়ির ও সুহাইলিদের মাঝে দীর্ঘদিনের ভৌগোলিক দ্বন্দ্বও তীব্রতা পায়।

'লড়াইয়ের প্রভাব পড়েছিল গোত্রগুলোর ওপর, জিহাদি রাজনীতির ওপর নয়। এর সমাধানও হয়েছে গোত্রীয় হস্তক্ষেপে,' আবু দানদাল বলছিল। 'উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছিল, কারণ বুকাইয়ির ও সুহাইলি, দুই দলই বুঝতে পেরেছিল যে সংঘর্ষের ফলে ভবিষ্যতে সমস্যা শুধু বৃদ্ধিই পাবে, আরও বড় সমস্যা তৈরি করবে। আইসিস কিংবা নুসরার মধ্যস্থতা ছাড়াই এই সংঘর্ষ সমাপ্ত হয়েছিল।' অবশ্য শান্তিচুক্তি ছিল খুব ক্ষণস্থায়ী। সুহাইলিরা রাফদান ও আইসিসকে জাদিদ উকাইদাত থেকে বহিষ্কার করেছিল। পরে ২০১৪-এর জুলাইতে আইসিস সুহাইলিদের পরাভূত করে। এই ঘটনা দার আজজুরবাসীর মুখে মুখে ফিরত।

অসংখ্য শহর-নগর তাদের হস্তগত হয়েছিল। ফাইয়াজ আত তায়ি, সাবেক আন নুসরা সদস্য, ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আইসিসে যোগ দিয়েছিল। সে আমাদের বলেছে, 'শুরু থেকেই আমরা জানতাম আসল সমস্যা হচ্ছে সুহাইলিরা।

তাদেরকে পদানত করতে পারলে অন্যরা আপনাতেই আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।' বিজয়ী রাফদান এবার তার প্রতিশোধের জ্বালা মেটাতে শুরু করে। সুহাইলিদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তিন মাসের জন্য অনেককে বহিষ্কার করে। শহর পতনের ফলে পূর্ব সিরিয়ায় নুসরার অগ্রযাত্রার ইতি ঘটে। প্রায় পুরো দার আজজুর আইসিসের দখলে চলে যায়।

দার আজজুরের দখল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ ইতিপূর্বে শুধু জাদিদ উকাইদাতে আইসিসের উপস্থিতি ছিল। তাও ছিল এত ভঙ্গুর ও নড়বড়ে যে সেখানকার বাসিন্দারা সাময়িকভাবে তাদের বহিষ্কার করেছিল।

টাকার খেলা

দার আজজুরে আন নুসরার দুর্দশার আরেকটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সৃষ্ট টানাপোড়েন। আল দাহের গোত্র ছিল নুসরার অনুগত। আন নুসরা সুহাইলির মরু অঞ্চলে অবস্থিত আল ওমার তেলক্ষেত্রের তেল চোরাচালান করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। সেখানকার আরেকটি গোত্র—আলবু ইজজেদ্দিন সে টাকার ভাগ চেয়েছিল আদ দাহেরের নিকট। কিন্তু নুসরা সব টাকা একাই দাবি করে, ফলে আলবু ইজজেদ্দিন আইসিসের সঙ্গে যোগ দেয়। আইসিসের বিরুদ্ধে সাহওয়া সাধারণত সেসব অঞ্চলে দানা বেঁধেছিল, যেখানে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সমর্থক ছিল কম কিংবা একেবারেই ছিল না।

তারা রাতারাতি রাক্কা প্রদেশ দখলে নিতে পেরেছিল—কারণ এখানকার বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই ছিল বহিরাগত। ফলে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে দ্রুত আইসিস এটি দখল করতে পেরেছিল। ২০১৩ সালে এসব বিদেশি যোদ্ধা গুটিকতক সরকারি বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রদেশের দখল নিয়েছিল, কোনো স্থানীয় বিদ্রোহী ইউনিট গড়ে ওঠেনি। ফলে রাক্কায় আইসিস শুধু আন নুসরা আর আহরার আশ শামের প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল, কিন্তু উভয় দলই আইসিস-আল কায়েদা বিচ্ছেদের পর সৈন্যদের দলত্যাগের কারণে তীব্র যোদ্ধা-খরায় ভুগছিল।

পক্ষান্তরে ইদলিব, আলেপ্পো, দামেস্কের উপকণ্ঠ ও দার আজজুরের বিদ্রোহীদের সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। আইসিসের উত্থানের আগে তারা কমবেশি বছরখানেক নিজেদের অঞ্চল শাসন করেছিল। ফলে খুব সহজেই তারা 'দখলদার' আইসিসকে হটাতে পেরেছিল। ইরাকেও তাদের ক্ষমতা ছিল স্থানীয়-বহিরাগত দ্বিভাজনদুষ্ট। মসুলের অধিবাসীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল আইসিস সদস্যদের জ্বালায়, যাদের বেশির ভাগই এসেছিল পার্শ্ববর্তী তাল আফার শহর থেকে। সীমান্তবর্তী এই শহরে একিউআই ২০০৫ সালে মার্কিনিদের প্রতিরোধ করেছিল। শহরময় শিশু-আত্মঘাতী হামলাকারী ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মসুলিরা তাল আফারিদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত, কারণ তারা ছিল দরিদ্র, অশিক্ষিত ও গোঁয়ার 'তুর্কমান'।

আইসিস-নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য এলাকায়ও অনুরূপ অভিযোগ শোনা যেত। যেসব অভিযানে ভিন্ন শহরের অধিবাসী ব্যবহার করত, পূর্ব থেকে বিদ্যমান আর্থসামাজিক সংকট ও উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেত।

ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি

ইতিহাসে আইসিসই একমাত্র জিহাদি দল, যারা একই গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে পেরেছে। এর নিষ্ঠুর প্রদর্শনী ঘটেছে ২০১৪ সালের আগস্টে, যখন আইসিসের নির্দেশে দার আজজুরের শাইতাত গোত্র স্বগোত্রীয় শত শত মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভ্রাতৃঘাতী এই খুনোখুনির পুনরাবৃত্তি হয়েছে ইরাকের হিত শহরে, একই বছরের অক্টোবরে। আলবু নিমর গোত্রের সদস্যরা ডজন ডজন স্বগোত্রীয়ের রক্তে হাত রাঙিয়েছে। এই বিভাজন শাসনপদ্ধতির ফলে নিশ্চিত হয়েছে, কোনো গোত্রই আইসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না, করলে অনিবার্যভাবেই তা ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে পর্যবসিত হবে।

সীমান্তবর্তী আল কাইয়িম শহর, যেখানে সাহওয়ার উত্তাপ সর্বপ্রথম অনুভূত হয়েছিল, দুই গোত্রের পূর্ব থেকে চলে আসা রেষারেষি একিউআইর মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। কারবালা গোত্র জারকাবির দলে যোগদান করেছিল, বিদ্রোহীদের ওপর মার্কিন বিমান হামলায় তাদের অনেক সদস্য হতাহত হয়েছিল। তাদের প্রতিপক্ষ আল মিহলাওয়িয়ন গোত্র যোগ দিয়েছিল সাহওয়ার অ্যাওয়াকেনিং কাউন্সিলে।

এই গোত্রীয় বিভাজনে ঘুষ বেশ ভালো কাজে দিয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিলে নুসরার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আইসিস গোপনে প্রতিটি গোত্রের তরুণ নেতাদের দলে টানার ফন্দি আঁটে। তেলের টাকার ভাগ, চোরাচালানের ডিলারশিপ আর প্রশাসনে পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় তাদেরকে, যেগুলো তখন বুড়োদের দখলে ছিল। আসাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে তরুণ নেতাদের বিশ্বস্ততা ও জনপ্রিয়তা বেশি ছিল। পক্ষান্তরে প্রবীণ নেতারা হয়তো আসাদের পক্ষে কিংবা নিরপেক্ষ ছিল।

আলবু কামালের এক সদস্য ব্যাখ্যা করেছে কীভাবে আইসিস এই সুযোগ লুফে নিয়েছিল। তাদের এরিয়ায় পা রাখার কয়েক মাস আগেই আইসিস কত নিপুণভাবে প্রভাবশালী এক পরিবারে দুই প্রজন্মের বিভেদের রাজনীতি উসকে দিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছে সে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দামেস্কে আমাদের বলেছিল সেই কথা। তারা তরুণদের তেলের টাকার একটা ভালো অংশ প্রদান

করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল বর্তমান নেতৃত্বকে উৎখাত করলে জনসমর্থন জোগাড় করতে পারবে। জনগণকে তার পাশে জড়ো করতে পারবে। অন্য গোত্রগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো নেতা ছিল না। নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল আমাদের হাতে। ফলে তারা সম্ভাব্য তরুণ নেতাকে হাত করতে টাকা দিত, নিরাপত্তা দিত, সব বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করত। এতেও কাজ না হলে ভিন্নপথ তো খোলাই—তাকে 'সরিয়ে' দিত।

এসব 'পূর্ব-পরিকল্পনার' ফলে আইসিস ২০১৪ সালের গ্রীষ্মে দার আজজুরের বহু অভেদ্য নগরও জয় করতে পেরেছিল। আল মুহাসসান, শাইতাত ও আলবু কামালের নাম উল্লেখযোগ্য। আল মুহাসসানের অবরোধ স্থানীয় বিদ্রোহীদের নিকট অদ্ভুত ঠেকেছিল, কারণ শহরটি আইসিস-বিরোধী হিসেবে সুপরিচিত। শহরবাসী ছিল সেক্যুলার, আসাদের সিরিয়ান আরব আর্মির বহু সাধারণ সৈন্য ও অনেক বড় বড় অফিসারের জন্ম দিয়েছে এই শহর। কিন্তু মতাদর্শিক ভিন্নতা কোনো কাজে আসেনি। আইসিস নিজ গতিতে কাজ করেছে, তার নিজস্ব ধারায় যুদ্ধ করেছে। ২০১৪ সালের জুনে মসুল দখলের পর অসংখ্য আমেরিকান ও সৌদিয়ান অস্ত্র তাদের হস্তগত হয়েছিল। সেগুলো ব্যবহার করে শহরটাকে একদম গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সালিস আইসিস

গোত্রশাসিত অঞ্চলে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সালিসিতেও আইসিস দক্ষতার ছাপ রেখেছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে তারা এক ঐতিহাসিক পুনর্মিলনে মধ্যস্থতা করেছিল। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর আলবু কামালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্র আল হাসসাউন ও আর রিহাবিয়্যিন প্রায়ই সংঘাতে লিপ্ত হতো। তাদের মাঝে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা 'ওয়ার অব রোজ' এর ঐতিহাসিক ৩০ বছরব্যাপী আলোচনার সঙ্গে তুলনীয়। মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণকারী এক আইসিস সদস্য আমাদের বলেছিল, 'আমরা জানতে পেরেছি দুই গোত্রের মাঝে অস্থিরতা চলছে, দুই পক্ষকেই ডাকি। তাদের মাঝে সমঝোতা করে দিই। উভয় পক্ষই এখন খুশি।'

আইসিসের শাসনাধীন অঞ্চলে তারা 'গোত্রীয় বিষয়াদি'তে আলাদা একজন আমির নিযুক্ত করেছিল, সৌদি নাগরিক দাইহাম আবু আবদুল্লাহ এই পদে নিয়োগ পেয়েছিল। তার দপ্তর ছিল কাইয়্যিমে। স্থানীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের অভিযোগ-অনুযোগ নিয়ে তার শরণাপন্ন হতো। বেশির ভাগই আসত নতুন দখলকৃত সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে। তার পদ ছিল অনেকটা ফেডারেল কোর্টের মতো। 'লোকেরা স্টেটের আস্থা অর্জনের জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নামত,' দার আজজুরের এক আইসিস সদস্য আমাদের বলছিল। সে মধ্যস্থতার জন্য আসা আনবারের এক

প্রতিনিধিদলের সঙ্গী হয়েছিল। 'তারা (আইসিস) এই অঞ্চলের নতুন শাসক। লোকজন নিজেদেরকে নেতা হিসেবে জাহির করতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যত শাসকই আসুক না কেন, এই অঞ্চলে গোত্রপ্রথাই শেষ কথা। আমাদের নেতারা তা জানত, তারা বেকুব নয়।'

যেসব এলাকায় গোত্রীয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, নিজ গোত্র কিংবা ভিন্ন গোত্র কর্তৃক, শান্তিরক্ষার জন্য তারা সেখানে বিদেশি যোদ্ধা ও বিদেশি নেতাদের মোতায়েন করত। বিদেশিদের গুরুত্ব এখানে পরিস্ফুট। সাদ্দাম আল জামাল তার নিজ শহর আলবু কামালের ১৭ জন স্থানীয়কে হত্যা করেছিল। ফলে আইসিস এই এলাকা পুনর্দখল করার পর তাকে এখানকার নেতৃত্ব প্রদান করেনি। পরিবর্তে তাকে ইরাক সীমান্তে একটি শরণার্থী শিবিরের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। সুহাইলিদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণকারী আল রাফদানকেও এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, তাকে রাক্কায় ট্রান্সফার করা হয়েছিল।

সোজা কথায়, আইসিস বাশার আল আসাদের পরিবর্তে সাদ্দাম হোসেনের কৌশল গ্রহণ করেছিল। গোত্রগুলোকে তাদের শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। আরেকটি সাহওয়ার সম্ভাবনা নস্যাৎ করতে গোত্রতোষণ নিজেদের যুদ্ধকৌশলের অংশ বানিয়ে নিয়েছিল। যেসব এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে গোত্র-দমন সম্ভব হয়নি, সেখানে তাদের গুরু সাদ্দাম হোসেনের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং নিজেদের সাবেক বাথ সদস্যদের অর্জিত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেছে- অনেকটা জায়গিরদারির মতো করে পরিকল্পনা সাজিয়েছে। সুতরাং ২০১৩ সালে আইসিস প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় বাগদাদি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই জনগণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : মুসলিম ও সিরিয়ান গোত্র!

২০১১ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পুনরুত্থানকাল থেকে এক গোত্রকে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে কিংবা একই গোত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করে। বিভাজন ও শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করে তারা নিশ্চিত করতে চেয়েছে যেকোনো বহিরাগত শত্রুর চেয়ে যেন সামাজিক ও গোত্রীয় দ্বন্দ্ব প্রকট থাকে। ফলে সামরিকভাবে আইসিসের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে গোত্রগুলোকে রাজি করানো বহুগুণ জটিল হয়ে ওঠে। কারণ কোনো গোত্রের কিছু সদস্য যদি সাহওয়াত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এর মানে হচ্ছে তারা নিজ রক্তের অপরাপর সদস্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে।

ইরাক ও সিরিয়ার শেখরা বেশ কয়েকবার এটি নিয়ে কথা বলেছে, তাদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছে। কার্নেজি এনডোনমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের ফ্রেডরিক ওয়হরি লেখেন, 'আইসিস এখন অনেক পরিণত ও সুসংহত শত্রু বলে প্রমাণিত হচ্ছে, শূন্য দশকে তাদের পূর্বপুরুষ একিউআইর চেয়ে। গোত্রগুলোকে

একই সাথে দমন ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য তারা চূড়ান্ত নির্মমতা ও কোমলাচরণ—উভয়টি ব্যবহার করছে। তাদের কৌশলের নিকট গোত্রীয় প্রবাদও ফেল মেরে যায় : গোত্রীয় কর্তৃপক্ষ অতিশয় চতুর, চূড়ান্ত মাত্রার সাম্প্রদায়িক, কখনো কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট, ফলে তারা অজেয়।'

ইরাকের সুন্নি-অধ্যুষিত এলাকাগুলোর অগ্নিগর্ভ বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকির পলিসি। আরও সোজা কথায়, ২০১৪ সালের প্রারম্ভে আনবারে পরিচালিত সামরিক অভিযান। যার সূচনা হয়েছিল সেখান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের পর। তাদের প্রত্যাহারের পর সেখানে রাজনৈতিক ও সামরিক বিদ্রোহ শুরু হয়। রাজনীতির কেন্দ্র ছিল বিক্ষোভকারীদের ক্যাম্পগুলো, আর সামরিক কেন্দ্র ছিল আনবারের মরু অঞ্চল। এই বিক্ষোভ ছিল প্রধানত মূলধারার ধর্মীয় নেতা ও গোত্রনেতাদের উত্থান। আইএসআই তখনো ব্যাকফুটেই ছিল।

জনগণের ক্ষোভকে আমলে নেওয়ার পরিবর্তে মালিকি বরং সাম্প্রদায়িক আগুন উসকে দেন। আনবারে পরিচালিত সামরিক অভিযানের ঘোষণাকালে তিনি একে হোসাইন ও ইয়াজিদের (হোসাইন রা. এর হত্যাকারী) বংশধরদের চিরন্তন লড়াই হিসেবে চিত্রিত করেন। ২০১৩ সালের ক্রিসমাস ডে-তে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেছিলেন। তাঁর ধ্বংসাত্মক ভুল হিসাব-নিকাশের কারণে নিজের প্রধানমন্ত্রিত্ব তো খুইয়েছেনই, সঙ্গে আনবারের দরজা আইসিসের প্রত্যাবর্তনের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন।

'সরকারের বোঝাপড়া শেষ হলে গোত্রনেতাদের হুঁশ আসবে। আসাদ আর মালিকি কীভাবে তাদেরকে কোণঠাসা করেছেন, সেটা বুঝতে পারবে,' আইসিসের মধ্যস্থতাকারী কর্মকর্তা আমাদের বলছিল। 'তারা আমাদেরই লোক, কিন্তু তাদের জানা উচিত নিজেদের স্টাইলে তারা এই নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবে না কখনো। এবার বুঝুক একমাত্র আমরা তাদের সহায়তা করতে পারি, শুধু আমরাই পারি তাদের নিরাপত্তা দিতে।'

তবে আইসিসের গোত্রীয় নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে—এটি ছিল একটি সাময়িক সরকারপদ্ধতি। নেহাত প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা সাময়িক সুবিধার জন্য কার্যকর। গোত্রগুলো পরিস্থিতির শিকার হয়ে আইসিসের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে, যেন নিজেদের এলাকা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়। মন্দের ভালো। মন থেকে তারা আইসিসের আদর্শ গ্রহণ করেনি কিংবা দল বেঁধে সবাই এতে যোগদানও করেনি। কারণ তারা জানত, এই শাসন স্থায়ী নয়। ছোট ছোট গোত্রগুলো আইসিসে যোগ দিয়েছিল ক্ষমতার রাজনীতির কারণে, খিলাফাহ কিংবা তাকফিরিজমের প্রতি তাদের কোনো মুগ্ধতা ছিল না।

চতুর্দশ অধ্যায়

আদ দাওলা : ইসলামিক স্টেটের গোপন শাখা

সিরিয়ান সীমান্তবর্তী দক্ষিণ তুরস্কের এক ফাইভস্টার হোটেলে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় এসেছিলেন, স্যানলিউরফা হোটেলে, এটি উরফা নামেও পরিচিত, ত্রিশের কোঠার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, আইসিসের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভালো জানাশোনা ছিল। আমাদের এক লিংক থেকে তাঁর কথা বলা হয়েছিল। তিনি নিজেকে একজন ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিলেন, আইসিসের অস্থায়ী হাসপাতালে কাজ করেছেন। ইসলামিক স্টেট, মধ্যপ্রাচ্য এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন শুনতে তাঁকে আগ্রহী মনে হচ্ছিল। মন দিয়ে তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, পাশে বসা তাঁর এক তরুণ সহকারীও ছিল।

আবু আদনান কথা শুরু করলেন। একদম পরিষ্কার ভাষা ও শব্দে। বললেন তিনি শুধু একজন ডাক্তারই নন, 'আমনি'ও বটে। আইসিসের সিকিরিটি অফিসার। তাঁর পেশা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অস্বীকার করেন, তবে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে এটা বলেন যে তাঁর মতো ডজন ডজন লোক আছে, যারা সিরিয়ার বাইরে আইসিসের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, বেশির ভাগই প্রতিবেশী দেশগুলোতে। 'মুমিন এক গর্তে দুবার পতিত হয় না,' হজরত মোহাম্মদ সা.-এর এই বাণী উদ্ধৃত করেছিলেন তিনি।

'আমরা শত্রুদেরকে আমাদের ওপর চরবৃত্তি করতে দিতে পারি না,' তিনি বলছিলেন। 'যেকোনো জিনিসের ভিত্তি ও খুঁটি হচ্ছে ইনফরমেশন। আমাদের সীমানার বাইরে কী ঘটছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারে আমরা তা খুঁজছি। আমাদের ভূখণ্ডের বাইরেও আমাদের উপস্থিতি বজায় রাখতে হবে। এর সবই করতে হবে আমাদের স্টেটের ক্ষতি না করে। সুতরাং এসব কাজে নিয়োজিত কর্মীদের নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও বিশ্বস্ত হতে হবে।'

আমনিয়াত তথা সিকিউরিটি ইউনিট হচ্ছে আইসিসের ইন্টেলিজেন্স ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিভাগ। এ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছেন ইরাকি সাবেক মুখাবারাত অফিসাররা, যাঁরা এখন আইসিসের বিভিন্ন পদে রয়েছেন। সাদ্দামের ইন্টেলিজেন্স অফিসার আবু আলি আল আনবারির নেতৃত্বে পরিচালিত হতো আমনিয়াত। আইসিসের ভূখণ্ডে তাদের দায়িত্ব ছিল ওয়ান্টেড

আসামিদের গ্রেপ্তার অভিযান চালানো এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর তদন্ত পরিচালনা করা।

আমনিয়াতের কাজকর্ম সম্পর্কে খুবই কম জানা যায়। এমনকি স্থানীয় পর্যায়েও তারা আইসিসের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদাভাবে কাজ করত, যেমন ধর্মীয় শাখা, সামরিক শাখা এবং খিদমাতুল মুসলিমিন বা মুসলিম সেবা সংস্থা। আইসিসের শারয়ি' (ধর্মীয়) শাখার একজন সদস্য আবু মুয়াবিয়া আশ শারয়িও নিশ্চিত করেছেন যে আইসিসের স্থানীয় অঙ্গসংস্থাগুলো আলাদা আলাদা ও স্বতন্ত্র ছিল। 'প্রতিটি শাখা আলাদা আলাদা,' আবু মুয়াবিয়া বলছিলেন। 'আমি জানি না সামরিক অফিসাররা কী করেন বা কী জানেন। তাঁরাও জানেন না একজন "আমনি"র নিকট কী তথ্য রয়েছে।'

আইসিসের ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণ তাদের 'রাষ্ট্রীয়' ভাবমূর্তি তৈরিতে, একটি দক্ষ আমলাতন্ত্র সৃষ্টিতে এবং যেকোনো সরকারের সঙ্গে টেক্কা দিতে সহায়তা করেছে। অনুপ্রবেশ ও গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারে তারা অতি-সতর্ক ছিল, তাদের হাইকমান্ড এ নিয়ে অবসাদে ভুগত। এ ছিল পূর্বসূরি বাথ পার্টির অবদান। বাহ্যত যদিও আইসিসে যোগদান ও সদস্যপদপ্রাপ্তি নুসরা ও অন্য দলগুলোর চেয়ে তুলনামূলক সহজ এবং নমনীয় ছিল, কিন্তু আঞ্চলিক নেতৃত্ব থেকে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য ব্যাপক বিস্তৃত ও বহুস্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা-চাদর বিছিয়ে রেখেছিল। আবু আদনানের ভাষায়, 'আমাদের দুশমনরা অতি চালাক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে "স্টেটও" শক্তিশালী, এতটাই শক্তিশালী যে তাদের যেকোনো আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে পারবে। যেসব এলাকায় তারা আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা এখনো সেখানে আছি। তবে সব সময় দৃশ্যমান থাকতে হবে, প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।'

স্যানলিউরফা হোটেলে আবু আদনানকে দেখে বোঝার কোনো উপায়ই ছিল না যে তিনি একটি তাকফিরি সংগঠনের সদস্য, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কালো পোশাকে কয়েক মাইল দক্ষিণেই যারা অবস্থান করছে। তিনি ছিলেন ক্লিন শেভড, আধুনিক পোশাক পরিহিত। আবু বকর বাগদাদির চেয়ে মুহাম্মদ আত্তানের সাথেই তাঁর সাদৃশ্য ছিল বেশি। আলোচনা চলাকালে তিনি তাঁর মোবাইল ফোনে বেশ কিছু ছবি দেখান। রাক্কা, উত্তর হাসাকা ও আলেপ্পোতে আইসিস নেতাদের সঙ্গে তাঁকে পোজ দিতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর ভাষ্যমতে, সিকিউরিটি অফিসারদের তাঁদের সিনিয়রিটি অনুযায়ী বিভিন্ন দক্ষতার প্রমাণ দিতে হয়। সামরিক প্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, গণসংযোগ ও আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাক্টিভিটিসহ আরও অনেক। সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে আইসিসে যোদ্ধা সরবরাহের জন্য তাঁর একটি গোপন নেটওয়ার্ক

ছিল। তারা তুর্কি কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় কাজ করত এবং আবু আদনানের মতোই যেকোনো পশ্চিমা শহরে অনায়াসে মিশে যেতে পারত।

ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারের গবেষক ক্রিস হার্মারের ভাষায়, 'আইসিসের চলাচল অবিশ্বাস্য রকম ক্ষিপ্র।' যেসব শহরে আপাতদৃষ্টিতে তাদের উপস্থিতির নামগন্ধও ছিল না, সহসাই সেখানে কীভাবে তাদের বিস্ময়কর উত্থান হলো, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'তাদের গোপন স্লিপার সেল রয়েছে, যারা গোপনে লোক বাছাই করত। জুনে মসুলে আমরা এমনটাই দেখতে পেয়েছি। তাদের কাছে সেসব লোকের একটা তালিকা ছিল, শহর দখলের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাদেরকে তারা হত্যা করতে যাচ্ছে।'

আইসিস কীভাবে ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে কুপোকাত করেছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন মাইসার হোসাইন। হামার সাহলুল গাবের এই প্যারামেডিক বলেন, 'সাহলুল গাব ও শাহশাবু পাহাড়ে আমাদের ৫৮০ জন যোদ্ধার একটি দল ছিল। তাদের অনেকেই আইসিসের স্লিপার সেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিল। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের এই আনুগত্যের কথা তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি। কারণ অঞ্চলটি ছিল এফএসএর সাকুরুল গাব ব্রিগেডের দখলে। সাকুরুল গাবের সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। তাই তারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে সাহস করেনি।'

হোসাইনের তথ্যমতে, যে দলটি আইসিসের আনুগত্য গ্রহণ করেছিল, তারা আল ফারুক নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে তাদেরকে জাবহাতুশ শাম নামে ডাকা হয়। 'যখন তারা আল ফারুক ছিল, তখন তাদের সঙ্গে আমি কাজ করতাম। পরবর্তী সময়েও প্যারামেডিক হিসেবে তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমাকে অফার দেয়। আমি দাড়ি রেখেছিলাম, গোঁফ ছেঁটে ফেলেছিলাম। অনলাইন-অফলাইনে তাদের পক্ষে কথা বলতাম, তাই তারা আমাকে এই অফার দিয়েছিল। বলেছিল, "আমরা এখন প্রস্তুত। এই অঞ্চলের দখল নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি এখন।"'

আইসিস ফ্রি সিরিয়ান আর্মি থেকে সদস্য সংগ্রহ করত। অন্যান্য মূলধারার বিদ্রোহী দলকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করত। তাদের বর্তমান পলিসি হচ্ছে, যেসব যোদ্ধা এফএসএ, আহরার আশ শাম কিংবা নুসরার হয়ে আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা আইসিসে যোগ দিলে শীর্ষপদে প্রমোশনের সম্ভাবনা প্রবল।

আবু বিলাল ছিল এফএসএর একজন ডোনার। আইসিস তার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। সে এফএসএর সাবেক যোদ্ধা ওবাইদিয়া আল হিন্দাওয়ির ঘটনা শুনিয়েছে আমাদের। প্রকাশ্য আনুগত্য ঘোষণার আগে তিন থেকে ছয় মাস সে গোপনে আইসিসের হয়ে কাজ করেছিল। এই সময়ে স্থানীয় ডোনারদের থেকে অর্থ

সংগ্রহ করেছিল, যাদের প্রত্যেকেই এফএসএর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আল মুহাসসানের একজন তিউনিসিয়ান কমান্ডারের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ হতো। এই আল মুহাসসানেই আইসিস গোত্রনেতাদের দলে ভেড়াচ্ছিল, ওবাইদিয়ার মাতুল ছিল সেখানে।

'আইসিসের সঙ্গে তার গোপন আঁতাতের সময়টুকুতে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানের অংশগ্রহণ পরিকল্পনায় সে ভেটো দিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের উচিত এসব থেকে নিজেদের দূরে রাখা। সে একাই ফ্রি সিরিয়ান আর্মির সদস্য ও তার সাবেক কলিগদের আইসিসে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার দুই ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল, যারা ব্রিগেডের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। তারপর সে ব্রিগেডের নেতৃত্বে আসে। সহসাই সে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। বলে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই কিংবা তার গাড়ি নষ্ট। পুরোটাই ছিল ছলনা, মূলত সে বহু আগে থেকে আইসিসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল।'

আইসিসের সঙ্গে তার যোগসাজশের সংবাদ একটি দল জানত—আন নুসরা। আবু বিলালের ভাষ্যমতে, এই অঞ্চলে সবচেয়ে ভালো ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা ছিল তাদের। 'এপ্রিল কিংবা মে মাসের দিকে নুসরা ওবেইদিয়ার বাড়িতে হানা দেয়। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন ছিল—কেন? নুসরা বলেছিল, সে আইসিসের পান্ডা। মানুষকে সে এতে যোগদানের জন্য পয়সা বিলি করছিল। অবশ্য সে পালাতে পেরেছিল। রাক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে আল মুহাসসানে ফিরে সে আইসিসের প্রতি নিজের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। জুনে আইসিস দার আজজুরের বুসাইরা শহর দখলে নেয়, এর দুই দিন আগে তারা সুহাইলি শহরে নুসরার শক্ত ঘাঁটি দখল করে নেয়। সেখানে ওবেইদিয়া আইসিসের পতাকা উত্তোলন করে, নিজের একটি চেকপয়েন্ট গড়ে তোলে, পাশাপাশি সমস্ত স্লিপিং সেল জাগিয়ে তোলে।' পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে শাইতাত গোত্রনেতাদের হত্যায় ওবেইদিয়া আল হিন্দাওয়ি জড়িত ছিল।

হাসাকার সাংবাদিক জাকারিয়া জাকারিয়ার ভাষ্যমতে, নুসরার ভেতরে আইসিসের অনুপ্রবেশ ছিল অসাধারণ। জুনের শুরুতে যখন নুসরা সদস্যরা আইসিসে যেতে চেয়েছে, তারা বলেছিল, উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো। 'আইসিস যখন জনসম্মুখে ঘোষণা দিল, দেখা গেল অর্ধেক সদস্যই তাদের দলে! বাকিরা হয়তো তুরস্কে পালিয়ে বেঁচেছিল কিংবা আইসিসে যোগ দিয়েছিল।'

এফএসএ দখল

আলেপ্পো থেকে মাত্র ২৬ মাইল দক্ষিণে আল বাব অবস্থিত। গত গ্রীষ্মে এটি ফ্রি সিরিয়ান আর্মির দখলে এসেছে। এখন আলেপ্পো অবরোধে তাদের ব্যাকআপ ঘাঁটি

হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ক্রমেই আলেপ্পো সরকার বাহিনীর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। এই বইয়ের লেখকদ্বয়ের একজন বারি আবদুল লতিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, ২০১২ সালের জুনের শেষ দিকে, রমজান মাসে। যখন সে আলেপ্পোর আল বাব ও বাব আল হাদিদ কোয়ার্টার থেকে রিপোর্টিং করছিল। সাত্তার একজন বিপ্লবপন্থী অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে বিদেশিদের কাছে খুবই পরিচিত ছিল। তার ব্যক্তিত্বও ছিল ক্যারিশম্যাটিক, কিন্তু সে ছিল অ্যাড্রেনিল আসক্ত।

একদিকে সে যেমন সরকারে সুখোই বিমান আর অ্যাটাক হেলিকপ্টারের পিছু ছুটতে ভালোবাসত, অপরদিকে ছদ্মবেশী পশ্চিমা সাংবাদিকদের সিরিয়ার যুদ্ধকবলিত এলাকায় নিয়ে যেত, যেখানে সাংবাদিক প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আমাদেরকেও সে-ই নিয়েছিল। আমাদের পরিদর্শনের একদিন আগেও সে আহত হয়েছিল। সালাদিনের স্থলযুদ্ধে স্নাইপারের গুলি লেগেছিল। সেটি তখন আলেপ্পোর স্ট্যালিনগ্রাদে পরিণত হয়েছিল। বম্বিং আর ২৪ ঘণ্টা অবিরাম গোলার আঘাতে শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

২০১২ সালে আল বাবে রমজান মাস আসাদবিরোধী আন্দোলনে নতুন স্বপ্ন জাগিয়েছিল। শহরের এফএসএ যোদ্ধাদের বেতন আসত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে। কারণ তারা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। তখন এফএসএতে দুর্নীতি কিংবা ঘুষ-উৎকোচের কোনো হদিস দেখা যায়নি, যা পরবর্তী সময়ে তাদের চরিত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শহরের অদূরে অবস্থিত আল খতিব ব্রিগেডের যোদ্ধারা শান্তির ঝলকানি দেখাচ্ছিল, শান্তির প্রতীক দেখিয়ে ছবি তুলত। (আল খতিব নামে সিরিয়াজুড়ে অসংখ্য ব্রিগেড ছিল। হামজা আল খতিব ছিল ১৩ বছরের এক বালক, ২০১১ তে সে সরকার বাহিনীর হাতে নিহত হয়। ব্রিগেডগুলো তার নামে গড়ে ওঠে।)

ফলে আল বাবের সিভিল সোসাইটি প্রতিজ্ঞার ভারে ন্যুব্জ হয়ে গিয়েছিল। সরকারি বাহিনী আল বাবের হাসপাতালটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী ও প্রফেশনাল ডাক্তাররা এক মসজিদের বেজমেন্টে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল গড়ে তোলেন। কর্মরত ডাক্তাররা অতি সতর্কতার সঙ্গে এখান থেকে সেবা নেওয়া রোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করতেন। এই তালিকায় সাধারণ জনগণ, ফ্রি সিরিয়ান আর্মির সদস্য, এমনকি সরকারি সৈন্যও ছিল। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে, এতে ছিল কিছু শাবিহা সদস্যও! রাত যখন ঘনিয়ে আসত, শহরের অলিগলিতে ধর্মীয় পল্লিগুলো পৌরসভায় পরিণত হতো। সে এক ভীষণ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। কারণ বিদ্রোহীদের হাতে শহরটির পতনের পর এখানে সব ধরনের সরকারি সেবা বন্ধ হয়ে যায়। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়।

এফএসএ যোদ্ধারা তাদের কালাশিনকভ নামিয়ে রেখে ঝাড়ু আর ময়লার বস্তা হাতে তুলে নিত। তাদের সঙ্গে থাকত সাদা দস্তানা পরিহিত স্বেচ্ছাসেবীরা। সাদা মোটরবাইকে চড়ে তারা চক্কর দিত, দেখতে অনেকটা বড়সড় হেয়ার ড্রয়ারের মতো লাগত।

'এখানকার সন্ত্রাসীরা কই?' সরকারকে ব্যঙ্গ করে লতিফ প্রশ্ন করেছিল। সরকার প্রচারণা চালাচ্ছিল, যারা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকে আল কায়েদা সদস্য, সন্ত্রাসী। তবে সন্ত্রাসীরা এসেছিল এক বছর পর। বর্তমানে তুরস্কে বসবাসরত এবং আরএম টিমের একজন গবেষক হিসেবে কর্মরত লতিফ কীভাবে আইসিস আল বাবে এসেছিল, গোটা শহর পদানত করেছিল, শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল তার স্মৃতিচারণ করেছে। আরএম টিম হচ্ছে একটি সিরিয়ান গবেষণা ও মানবিক সংস্থা। 'তারা নিজেদের "স্টেট" ঘোষণার পর, আল কায়েদা থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার পর, মুক্তাঞ্চলজুড়ে অ্যাক্টিভিস্টদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। ২০১৩-এর আগস্টে তারা প্রথমবারের মতো আল বাবে পা রাখে। আমি দেখেছিলাম। তারা এফএসএর কিছু "খারাপ" ব্যাটালিয়ন দখল করে নেয়।'

কিসে ব্যাটালিয়নগুলোকে 'খারাপ' বানিয়েছিল? লতিফের জবাব—তারা ছিল চোর। তারা বেশ কিছু সিভিলিয়ানকে কিডন্যাপ করেছিল, মুক্তিপণ দাবি করেছিল। 'দায়েশ (আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়া ফিল ইরাক ওয়াশ শাম—আইএসের আরবি নাম) তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রথম দিকে সাধারণ জনতা দায়েশকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারা তখনো জানত না আল বাব নিয়ে তাদের ছিল ভিন্ন প্রজেক্ট, ভিন্ন পরিকল্পনা।'

সরকারি বাহিনী কখনোই আল বাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ করেনি। লতিফের বর্ণনা অনুযায়ী হাসপাতালের পাশেই একটি স্কুল হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে আংশিক কর্মোপযোগী করে তোলা হয়েছিল। সেই হামলায় ১২ জন প্যারামেডিক নিহত হয়েছিল। তাকফিরিদের উপস্থিতি শহরের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলছে—এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শহরবাসী আইসিসসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। 'তিন-চার দিন বিক্ষোভ চলার পর ফ্রি সিরিয়ান আর্মি দায়েশের সঙ্গে আলোচনায় বসে, তাদেরকে শহর ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করে।

'তারা সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে শহরের উপকণ্ঠেই ঘাঁটি গাড়ে, শহরের নাকের ডগায়, খুবই কাছ দিয়ে ঘুরঘুর করতে থাকে আর প্রতিদিনই নতুন নতুন "খারাপ" এফএসএ গ্রেপ্তার করতে থাকে। তখনো তারা কোনো অ্যাক্টিভিস্টকে গ্রেপ্তার করেনি, তবে অনেককেই হুমকি দিয়েছিল—বিশেষত আমাকে। শহরের প্রত্যেক বাসিন্দা প্রায় প্রতিদিন ফেসবুকে আমাকে

জিজ্ঞেস করত, আমি এখনো মুক্ত আছি কি না। আমি বিপদে আছি মর্মে প্রতিদিনই তারা আমাকে সতর্ক করে দিত। দায়েশ আমার খোঁজে এল বলে!'

রাক্কার পূর্ণ দখল নেওয়ার পর আইসিস আল বাবে শক্তি কেন্দ্রীভূত করে। শহরের বাইরে অবরোধ তৈরি করে। এফএসএ, আহরার আশ শাম ও নুসরার সঙ্গে তাদের সরাসরি সংঘর্ষ চলতে থাকে। 'দুই দলের কারও তখন পর্যাপ্ত জনশক্তি ছিল না,' লতিফ বলছিল। তখনো পর্যন্ত এফএসএ ছিল প্রভাবশালী বিদ্রোহী গ্রুপ। তাদের দেড় হাজারের মতো যোদ্ধা ছিল আল বাবে। এসব যোদ্ধার অনেককেই সংগ্রহ করা হয়েছিল পার্শ্ববর্তী মিনবিজ ও আলেপ্পো থেকে, যা পরবর্তী সময়ে আহরার অনুসরণ করে, অতঃপর নুসরাও। আল বাবকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে আইসিস সরকারি কৌশল অবলম্বন করে—অনাহার। শহর থেকে শহরের বাইরে তারা গম চুরি করে নিচ্ছিল অনবরত, এফএসএর দায়িত্ব ছিল এই হরিলুট বন্ধ করা, নয়তো ইতিমধ্যেই অনাহারের কবলে পড়া জনসাধারণ না খেতে পেয়ে মারা যাবে। আলেপ্পোর সবচেয়ে বড় দল লিওয়া আত তাওহিদের আল বাব হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায় আইসিস। ২১ জন মারা যায়—লতিফ বলছিল।

'এর পরপরই সরকারি বাহিনী হেলিকপ্টার নিয়ে হামলা চালায়। শহরের কেন্দ্রস্থলে শুধু সিভিলিয়ানদের বেছে বেছে হত্যা করে। দায়েশ এই হামলার সুবিধা নিয়ে শহরে ঢুকে পড়ে। সরকারের তৈরি করে দেওয়া সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।' লতিফের ভাষ্যমতে, আসাদ ছিলেন চরম ধুরন্ধর। তিনি শহর আক্রমণের মাধ্যমে এই বার্তা দেন যে আইসিস আর সরকার একই। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এফএসএর সঙ্গে গৃহযুদ্ধ বাধানো।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে যখন সিরিয়ায় ছোট সাহওয়া শুরু হয়, দায়েশ আল বাবের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে স্নাইপার মোতায়েন করে। তারা জনসাধারণ কিংবা বিদ্রোহী সবাইকে টার্গেট করতে শুরু করে। লতিফ বলছিল, 'তারা প্রত্যেককেই গুলি করছিল। দায়েশ যখন শহরের এক-চতুর্থাংশ দখল করে নিয়েছে, আমি তখন আল বাবের দক্ষিণ পাশে মিডিয়া অফিসে ছিলাম। হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কোনো শব্দই পাওয়া যাচ্ছিল না। সমস্ত লড়াই বন্ধ হয়ে যায়।

'আমরা অফিস বন্ধ করে ঘরে ফিরে যাই। রাত তখন আনুমানিক ১১টা। শহরে কী ঘটছে তা দেখার জন্য একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম। লিওয়া আত তাওহিদ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে! শহরে কোনো সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল না। তারা সবাই কোথায় গেল, আমি জানি না।' শহরের আশপাশে আহরার আশ শামকে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু ভেতরে নয়। 'সকাল পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার রাত। রাত চারটার দিকে আহরারের যোদ্ধারা মেশিনগান বসানো গাড়ি নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। এর দেড় ঘণ্টা পর তাদের তিনটি ট্রাক, সব কটি ছিল

গুলি ও রকেটবোঝাই, শহর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তাদের এক কমান্ডার আসে, আমি যে সেনাদলের সঙ্গে ছিলাম তাদেরকে চেকপয়েন্ট ছেড়ে চলে যেতে বলে। এটিই ছিল শহরের শেষ চেকপয়েন্ট। সবাই তখন আলেপ্পোর উদ্দেশে রওনা দিয়ে দিয়েছে।'

ভোরে আইসিস গোটা শহরের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

যে সেফ হাউসে লেখকদ্বয়ের একজন অবস্থান করেছিলেন, তা ছিল লতিফের এক বন্ধুর বাড়ি। একজন বিদ্রোহী যোদ্ধা, নাম আবু আলি। সে তার স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে আমার পরিবারে রেখে যায়। আইসিস আবু আলির বাড়ি দখল করে নেয়। তার পরিবার চার-পাঁচ মাসের মতো আল বাবে ছিল। এখন তারা আলেপ্পোতে, তার সাথেই। তবে লতিফের পরিবার এখনো আল বাবে থাকে।

আইসিসের শাসনামল

লতিফ বলে, আইসিস প্রথম দিকে সিভিলিয়ানদের মন জয় করে নেয়। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যেসব কাজ স্বেচ্ছাসেবী ও এফএসএ করত, সেগুলোর কিছু কিছু তারা নিজের কাঁধে তুলে নেয়। তারা ভাঙা রাস্তা মেরামত করে। রাস্তার পাশে ফুলের চারা রোপণ করে। বাগান তৈরি করে। স্থানীয় স্কুলগুলো মেরামত করে। কিন্তু অল্প কদিনের মধ্যেই তারা শরিয়া ল' বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। মহিলাদের 'দ্য দায়েশ ক্লথ' নামে পরিচিত পোশাক পরতে বাধ্য করে, যা ছিল মূলত একধরনের নিকাব। 'তারা হেয়ার ড্রেসারগুলো ব্যান করে দেয়। দাড়ি কামানোও নিষেধ। মেয়েদের পুরুষসঙ্গী নিয়ে সফরে যেতে হবে। স্মোকিং করা যাবে না। "শিশা"ও (হুঁক্কা) টানা যাবে না। তাস খেলা মানা। নামাজের সময় মসজিদে যেতে হবে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। নামাজের সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপ-সালাপ করা যাবে না। রিলিফ সেন্টারগুলোর প্রায় সবাইকে তারা কিডন্যাপ করে তুলে নিয়ে গেছে। এক মাস (নভেম্বর ২০১৪) আগে স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন পড়তে চাইলে দায়েশের মসজিদভিত্তিক স্কুলে পড়তে হবে।'

নির্যাতনও ছিল স্বাভাবিক বিষয়। এফএসএর সদস্যদেরকে তুলে নিয়ে যেত, অভিযোগ করত তারা বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার চর। আইসিসের নানান অপরাধের কথাও আল বাবের টাউন স্কয়ারে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিরশ্ছেদে বিভাজনের কথাও ছিল এতে। 'তারা স্কয়ারে হাত ও মাথা কাটত। আপনাদের হুকাহ প্লেসের কথা মনে আছে?' লতিফ আল বাবের বিখ্যাত ক্যাফে সেন্টারের কথা বোঝাচ্ছিল। ২০১২ সালে যেখানে সে গণতান্ত্রিক ও মুক্ত সিরিয়ার রূপকল্প পেশ করেছিল। 'এখন সেটি শিরশ্ছেদের স্থান। পাশাপাশি ক্যাফেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

আইসিসের আল বাব দখলের প্রথম মাসে সরকারি বাহিনী সেখানে কোনো আক্রমণ চালায়নি, তবে ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে সিরিয়ান এয়ারফোর্স পুনরায় ব্যারেল বোমা নিক্ষেপ শুরু করে। 'ফ্লাইং আইইডি' নামে পরিচিত এই বোমাগুলো ছিল সরকারি বাহিনীর ব্যবহৃত সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্রগুলোর একটি। একটিমাত্র এয়ারস্ট্রাইকেই ৬২ জন সিভিলিয়ান হত্যা করেছে। লতিফ বলেছে, এয়ারফোর্স আল বাবের প্রধান সড়কে ব্যারেল বোমা নিক্ষেপ করেছিল, অথচ আইসিসের কোনো অবস্থানে আক্রমণ করেনি।

প্রতিক্রিয়ায় আইসিস পূর্বাঞ্চলে সরকারি বাহিনীর স্থাপনায় সিরিজ আক্রমণ চালায়। যেমন দার আজজুরের তাবকা এয়ারবেজ, রাক্কার দ্য ডিভিশন ১৭-এর বেজ এবং হাসাকায় রেজিমেন্ট ১২১-এর ঘাঁটি। মধ্য ও উত্তর ইরাকে বিমান হামলার পর আইসিসের সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান গতি পায়। লতিফের মতে, 'সরকার চায় আল বাব আইসিসের দখলে থাকুক। শহরেরর মাত্র ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমেই আসাদবাহিনীর ঘাঁটি, কিন্তু তারা কখনোই আল বাব দখলের চেষ্টা করেনি। যখনই সরকার উত্তর আলেপ্পোর কোথাও হামলা চালায়, আইসিসও সেখানে উদয় হয়। সরকার ও আইসিস একই সময়ে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির ওপর হামলা চালায়, তবে আলাদাভাবে। আইসিসের আল বাব ও রাক্কা দখলের মাঝে সরকার নিজের প্রভূত কল্যাণ দেখতে পায়। এদের উপস্থিতি ছাড়া যৌথ বাহিনী সিরিয়া আক্রমণে রাজি হবে না। বিপ্লবের শুরুতে সরকার তার ক্ষমতা হারায়। হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধারে তার সিরিয়ায় সন্ত্রাসী গ্রুপের উপস্থিতি দরকার।

'এখন পশ্চিমে অনেকেই হাউকাউ করছে যে মধ্যপ্রাচ্যে আসাদই একমাত্র শক্তি যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়ছে। সিরিয়ার প্রধান খেলোয়াড় এখন সন্ত্রাসীরা। দায়েশ, নুসরা আর আসাদ!'

আইসিস বনাম আসাদ

সিরিয়ার বিদ্রোহীরা বিগত বছরগুলোতে যা বলে আসছিল, লতিফের বক্তব্যে সেসবের শুধু সমর্থনই পাওয়া যায়নি, বরং সরকার-অনুগতরাও পরে এগুলো স্বীকার করেছে। বিরোধীদের দাবি ছিল, আইসিস আর আসাদ অঘোষিত মিত্র। তাদের শত্রুও অভিন্ন—ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ও ইসলামিস্ট বিদ্রোহীরা। তাবাকা এয়ারবেজ, ডিভিশন ১৭ এবং রেজিমেন্ট ১২১ কে ধ্বংস করতে আইসিস নিনাওয়া ও আনবারে পরাজিত ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্স থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি, ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত আসাদ আইসিসের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালানো থেকে বিরত ছিলেন। জুনে আইসিস মসুল দখল করে নেয়। যদিও আসাদ প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিলেন যে তাঁর সর্বাত্মক লড়াই শুধু আইসিসের বিরুদ্ধেই। তাঁর শত্রুরা সবাই আইসিস। মসুল পতনের পর তাঁর সামনে কাউন্টার টেরোরিজমের অংশীদার হিসেবে পশ্চিমাদের সঙ্গে জোট বাঁধার নতুন সুযোগ আসে। সিরিয়ার যুদ্ধবিমানগুলো রাক্কার আইসিস ঘাঁটিগুলোতে বোম্বিং শুরু করে, কিংবা বিশ্বকে বোঝায় যে তারা এটা করছে।

'তারা জুন পর্যন্ত আইসসিসের হেডকোয়ার্টারে কোনো হামলা চালায়নি, পরে চালিয়েছে, শুধু ঘাঁটি ফাঁকা তা নিশ্চিত হওয়ার পরই,' ইরাকি কুর্দিশ ইন্টেলিজেন্স প্রধান মাসরুর বারজানি ২০১৪ সালের আগস্টের শেষ দিকে গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সেসবের খেসারত এখন সবাই মিলে দিচ্ছি।'

ডিভিশন ১৭ দখলের পর তারা পঞ্চাশের অধিক সিরিয়ান সৈন্যকে হত্যা করে। কয়েকজনের শিরশ্ছেদ করে। ভূলুণ্ঠিত কাটা মাথাগুলোর ভিডিও ধারণ করে। লন্ডনভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের রামি আবদেল রহমান এজেন্সি ফ্রান্স প্রেসকে (এএফপি) বলেন, 'এটি খুবই পরিষ্কার যে আইসিস তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। এত দিন তারা দখলকৃত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করেছে। এখন তারা ছড়িয়ে পড়ছে। সরকারবিরোধী লড়াইয়ে তাদের উদ্দেশ্য সরকার পতন নয়, নিজেদের সীমানা বৃদ্ধিকরণ।'

খোদ আসাদপন্থীরাও সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তায় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। ২০১৪ সালের গ্রীষ্মে আইসিসের পূর্বমুখী অভিযানে প্রতিরোধের অবস্থা দেখে সরকারপক্ষের অনেক অ্যাক্টিভিস্ট নিজ পক্ষের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। এক ভিডিওতে তাঁরা অভিযোগ করেন, তাবকা এয়ারবেজে সরকার যা করেছে, একদম পরিষ্কার গাদ্দারি। তবে সমালোচনার পর ধড় ঘাড়ে থাকার নিশ্চয়তার জন্য সমালোচনার যৌক্তিকতা এবং এটা যে সরকারের কল্যাণকামিতার অংশ, তা বোঝানোর প্রয়োজন হয়। সে সুযোগ এনে দেয় হাফিজ আল আসাদের একটি উক্তি। ভিডিওতে তাঁরা সেটি জুড়ে দেন, 'আমি চাই না ভুল হচ্ছে দেখা সত্ত্বেও কেউ চুপ থাকুক।'

ভিডিওতে দেখা যায়, সিরিয়ান অফিসাররা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিরক্ষাকৌশল নিয়ে কথা বলছেন। উপস্থাপক ব্যাখ্যায় বলছেন, তাঁদেরকে প্রতারিত করা হয়েছে। তাঁদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল গুলি ও অন্যান্য সরঞ্জামভর্তি তিনটি হেলিকপ্টার পথে আছে। দেখা গেল, একটিমাত্র কপ্টার পৌঁছেছে, যাতে কোনো সরবরাহ তো ছিলই না, উল্টো এয়ারবেজের প্রধান আদেল ইসা ও তাঁর প্রধান তিন জেনারেল এতে করে পালিয়ে যান।

এটি ছিল আইসিস এয়ারবেজে আক্রমণের মাত্র ১৮ ঘণ্টা পূর্বে। ভিডিওতে সিরিয়ার তথ্যমন্ত্রী উমরান আল জুবাইকে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও এর পরবর্তী ফলাফল নিয়ে ভয়ানক মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। আসাদের কাজিন দুরাইদ আল আসাদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়, যাতে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রী, চিফ অব স্টাফ, বিমানবাহিনী প্রধান, তথ্যমন্ত্রীসহ তাবকা সামরিক ঘাঁটির পতনে জড়িত প্রত্যেককে পদচ্যুত করার দাবি জানাচ্ছি।' ভিডিওর শেষ কথা হচ্ছে, 'আমাদের বুলেটের নয়টি গাদ্দারদের দিকে, আর একটি শত্রুর দিকে তাক করা।'

মিনিস্ট্রি অব রিকনসিলিয়েশনের সিরিয়ান কর্মকর্তা এলিয়া সামান প্রকাশ্যে তদন্ত করে দেখিয়েছেন যে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিরিয়ান এয়ারফোর্স অনুপস্থিত ছিল। অথচ তখন বাগদাদির লোকজন ইরাক থেকে নব-উদ্যম আর সদ্য প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করছিল। অবশ্য তিনি আইসিসের সঙ্গে সরকারের কোনো ধরনের আঁতাত কিংবা যোগসাজশের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের এনা বার্নার্ডের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন, সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো প্রতিরোধ করা দামেস্কের 'অগ্রাধিকার' তালিকায় ছিল না। সিরিয়ান সেনাবাহিনীকে না মেরে আইসিস বরং এফএসএ ও ইসলামিক ফ্রন্টের সদস্যদের হত্যা করছে—এই দৃশ্যে আসাদসহ সবাই অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। অবশেষে সরকার যখন আইসিসের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শুরু করে, লতিফের ভাষায়, মিলিশিয়ার চেয়ে নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষই মেরেছে বেশি।

আইসিস যোদ্ধা খালিদও বার্নার্ডকে বলেছে, 'বিমান হামলার বেশির ভাগই ছিল সাধারণ মানুষের ওপর, আমাদের হেডকোয়ার্টারে নয়। আল্লাহর শোকর।'

মিনবিজ

আইসিসের উত্থানের পেছনে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে আসাদ সরকারের তীব্র উপেক্ষা। পাশাপাশি, লতিফের ভাষায়, এফএসএর 'মন্দ' ব্যাটালিয়নগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গুটিবাজি করেও তারা উপকৃত হয়েছে। একিউআইর উত্থানের প্রাথমিক দিনগুলোতে আইমান আল জাওয়াহিরি জারকাবিকে শুধু নিষ্ফল শিয়া হত্যার বিষয়েই উপদেশ দেননি, আল কায়েদা-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে কার্যকর ইসলামি সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

'এটি অতীব প্রয়োজনীয় যে ক্ষমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদের মন জয় করা এবং সরকারব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,' ২০০৫ সালে

জাওয়াহিরি তাঁর ফিল্ড কমান্ডারকে দেওয়া চিঠিতে লিখেছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল মূলত ধীরে ধীরে জিহাদি 'সফট পাওয়ারের' বিস্তার ঘটানো।

শিয়াদের বিষয়ে জাওয়াহিরির মতামত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেও ইসলামি সরকারের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে আইসিস তাঁর উপদেশে কিছুটা কর্ণপাত করেছিল। এর প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র ছিল মিনবিজ।

আলেপ্পো, রাক্কা ও তুর্কি সীমান্তের মাঝামাঝি অবস্থিত কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এই শহরের বাসিন্দা ছিল দুই লাখ। ২০১২ সালের নভেম্বরে সরকারি বাহিনী শহরটি ত্যাগ করে। শহরের অধিবাসীরা পৌর প্রশাসন গড়ে তোলে, নিজেদের শাসনব্যবস্থা ঠিক রাখার লক্ষ্যে। অতি শিগগিরই শহরটি বিপ্লবের প্রতীক হয়ে ওঠে। আসাদ-উত্তর সময়ে হযবরল অবস্থা তৈরি হবে না—এর প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। যদিও এই সুখের সংসার টিকেছিল মাত্র এক বছর। সেক্যুলার ও ন্যাশনালিস্ট বিদ্রোহী দলগুলোর আচরণ ছিল লুটেরা আর মাফিয়া গ্যাংস্টারদের মতো। সিরিয়াজুড়ে এই অভিযোগ ছিল অত্যন্ত তীব্র। ফলে কঠোর ইসলামি দলগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, কারণ তারা শৃঙ্খলা ও সততার জন্য তুলনামূলক বেশি প্রসিদ্ধ। এই তালিকায় আন নুসরাও ছিল।

নুসরার প্রায় সব বিদেশি যোদ্ধা আইসিসে যোগ দেওয়ার পর তারা ২০১৩ সালের এপ্রিলে এই শহরে ঘাঁটি স্থাপন করে। অন্য সশস্ত্র দলগুলোর পাশাপাশি তারাও সক্রিয় হয়। তুলনামূলক ছোট কিন্তু ৫০ সদস্যের একটি ভয়ানক দল ছিল তাদের। এই ঘাঁটি থেকে তারা চুপেচাপে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করে। তাদেরকে 'মাদাফা' বা নিজেদের সভাস্থলে আসার আমন্ত্রণ জানাত। এই অঞ্চল নিয়ে বাগদাদির ব্যাপক বিস্তৃত ইসলামিক প্রজেক্টের সঙ্গে স্থানীয়দের পরিচিত করে তুলতে শুরু করে।

স্থানীয় দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিরসন, অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানে নিজেদের কার্যক্রম শুরু করে। শহরে যেহেতু কোনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ছিল না, তাই তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ পরিচালনা করার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে আইসিসের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, নিয়মিত ও সঙ্গোপনে। বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের গোপন মজুদ গড়ে তুলছিল। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যস্থতা তুলনামূলক কম স্বচ্ছ ও অধিক কঠোর হয়ে উঠছিল।

তারা এফএসএ সদস্যদের গ্রেপ্তার করে বিদ্রোহী দলগুলোর প্রতিষ্ঠিত শরিয়া কমিশনের নিকট হস্তান্তর করত না। সেক্যুলার অ্যাক্টিভিস্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করত। যে সম্পদে তাদের হাত পড়ত, সেটি দখলে নিয়ে নিত। এবং সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে অবশিষ্ট জনগণকে 'কিনে' নিচ্ছিল। সাধারণত ফ্রন্টলাইন থেকে তারা দূরে থাকত। পরিবর্তে এফএসএ ও অন্য ইসলামিক দলগুলোর সঙ্গে

কৌশলগত চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। সরকারি চেকপয়েন্ট কিংবা সামরিক স্থাপনায় আত্মঘাতী হামলার বিনিময়ে তারা সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দলগুলোর সঙ্গে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগাভাগির চুক্তি করত। এ ক্ষেত্রে তারা আত্মঘাতী হামলাকারী সরবরাহ করত, যারা ভিবিআইইডি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হতো।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে আইসিসের মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতা এবং নগরসেবায় তাদের একক কর্তৃত্ব নিয়ে অন্য গ্রুপগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। তারা মিনবিজের কুর্দিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গোটা অঞ্চলকে পিকেকে ও পিওয়াইডি মুক্ত করা ঘোষণা দেয়। সিরিয়ার কুর্দি সংখ্যালঘু এলাকায় এই দুটি দলই ছিল তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র গ্রুপ। অক্টোবরে মিনবিজের বিদ্রোহী গ্রুপগুলো আইসিসের ময়দা কারখানা দখল করে নেয় এবং তাদেরকে বলে শহরের জনগণের সমস্যা নিরসনে সামরিক ও শরিয়া কাউন্সিলকে পাশ কাটিয়ে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে যখন আলেপ্পো ও ইদলিবে বিদ্রোহী গ্রুপগুলো আইসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মিনবিজের স্থানীয় ফোর্সগুলো আইসিসের ঘাঁটি দখল করে নেয় এবং তাদের সৈন্যদের হত্যা কিংবা বন্দী করে।

যা-ই হোক, শহরের অনেক স্থানীয় বাসিন্দার সঙ্গে লেখকদের কথা হয়েছে। তারা আইসিসের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ও তাদের উৎখাতে ব্যাথাতুর। 'জনগণ আইসিসের ভালো বৈ মন্দ কিছু দেখেনি। যদিও আমরা তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ পছন্দ করতাম না,' শহরের অধিবাসী শাদি আল হাসসানের ভাষ্য। 'আমরা এটাও জানতাম, যারা আইসিসকে উৎখাতে যুদ্ধ করছে, তারা এই অঞ্চলের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।' ইদলিব ও উত্তর আলেপ্পো থেকে আইসিসের পশ্চাদপসরণের পর পূর্ণ জিঘাংসা নিয়ে মিনবিজে পুনরাগমনের পথ তৈরি হয়।

রাক্কা ও উত্তর-পূর্ব আলেপ্পো থেকে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে তারা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এবং বিলম্ব না করে পুরোমাত্রায় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, যা শহরের অধিবাসী ও বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের মুগ্ধ করে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্য যে আইসিসের ভয়ংকর নির্মমতা দেখে সিরিয়ানরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করে। এতে যোগ দিতে কিংবা নিদেনপক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

তাদের জনশক্তি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। কেউ ছিল যোদ্ধা, কেউ নিরাপত্তা কর্মকর্তা, চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী, শরিয়া কোর্টের বিচারক এবং বেকারি সাপ্লাইয়ারসহ আরও নানাবিধ পেশা। স্থানীয় জনগোষ্ঠী এসব পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক সুবিধা পেয়েছে এবং দুই শাসনের পার্থক্য অতি দ্রুত অনুভব করতে পেরেছে।

আইসিস শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেছে। তাদের বিচারপ্রক্রিয়া ছিল খুবই দ্রুত, কেউ শাস্তির বাইরে ছিল না। এমনকি তাদের নিজেদের যোদ্ধারাও নয়। তাদের আরোপিত কঠোর নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করলে তাৎক্ষণিক সাজা হতো। ফলে কিডন্যাপিং, চুরিচামারি, চাঁদাবাজি রাতারাতি উধাও হয়ে যায়। আইমান আল মিতয়িব মিনবিজেরই একজন বাসিন্দা। ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে সে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে। তার ভাষ্যমতে, 'এখানে তাদের কর্মকাণ্ডের কোনো চূড়ান্ত সমর্থন যেমন নেই, তেমনি বিরোধিতাও নেই। মানুষ ইসলামিক স্টেটকে ভালোবাসে তাদের সততা ও কর্মপদ্ধতির জন্য, এফএসএর দুর্নীতিবাজ গ্রুপগুলোর তুলনায় তারা ঢের ভালো। ফলে বেশ কিছু এফএসএ গ্রুপও আইসিসে যোগ দিয়েছে।'

মিনবিজের মতো অন্যান্য শহরেও আইসিসের উত্থান একই পদ্ধতিতে হয়েছে। বিশেষত, যেখানে এফএসএ গ্রুপগুলো দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৩ সালের নভেম্বরে পক্ষত্যাগী একজন সিরিয়ান সেনাসদস্য গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন, আইসিস প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাটালিয়ন দখল ও নিজেদের অধীন ভূখণ্ডে ভাইরাসের মতো আচরণ করে। 'তারা প্রথমে কোনো একটি দুর্বল ইউনিটে আক্রমণ চালাবে, এই অভিযোগে যে তাদের কমান্ডার একজন দস্যু ও লুটেরা। তারা একই সময়ে একটির বেশি দলের সঙ্গে লড়াই করে না।' তিনি আরও বলেন, তারা যদি কোনো শহরে একবার ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে তো ধীরে ধীরে বহির্মুখী সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে। আশপাশের শহর-গ্রাম নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

হাসসান যাজরা, আইসিসের হাতে নিহত প্রথম বিদ্রোহী নেতাদের একজন। তিনি ছিলেন গুরাবা আশ শামের নেতা। বিপ্লবের আগে একজন তরমুজ ব্যবসায়ী ছিলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভেও অংশ নিয়েছিলেন। পরে পুরোদস্তুর বিপ্লবী বনে যান। তাঁর সামরিক কর্মকাণ্ডের অর্থ জোগানের জন্য চুরি করতেন। যাজরার শোকগাথায় উরওয়া মাকবাদ নামের এক সাংবাদিক লেখেন, 'আলেপ্পো হাসসান যাজরাকে চেনে চোর হিসেবে। নিয়মিত আর্মি অ্যাটাকের মুখেও সে দেড় বছরে তার পোস্ট ছাড়েনি। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ফসল ছিল সে, যে ক্রমাগত অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে একজন সামরিক নেতায় পরিণত হয়। যুদ্ধের পুরো সময়টায় এটিই ছিল সাধারণ দৃশ্য।' ২০১৩ সালের নভেম্বরে আইসিস তাঁকে তাঁর ছয় সহযোদ্ধাসহ হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আইসিস যে বার্তা দিতে চেয়েছে—যারা বিপ্লবকে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের জন্য ব্যবহার করে, কিংবা বিপ্লবের মূল বার্তাচ্যুত হয়, তারা আসাদের মতোই ভয়ংকর। যদিও মৃত যাজরার সুখ্যাতি বা

কুখ্যাতি নির্ভর করে আপনি কাকে জিজ্ঞেস করছেন তার ওপর। আইসিসের মতে, তাঁর মৃত্যু ছিল ন্যায়বিচারের জন্য অত্যাবশ্যক। যাজরার বিচারের পরপরই আইসিসের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে। এবং এর পর থেকে তারা বিদ্রোহী অধ্যুষিত এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি আরও বেশি করে জানান দিতে শুরু করে।

সরকার পরিচালনা ছিল তাদের একটি সফল কৌশল। সফল সরকারব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই আইসিসে যোগ দেয়, তাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অথবা নিদেনপক্ষে নিজেদের এলাকায় তাদের উপস্থিতির বিরোধিতা করেনি। যেহেতু এটি আইসিসের অস্তিত্ব ও উপস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, তাই এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অকল্পনীয় নৃশংসতা সত্ত্বেও তারা কীভাবে মানুষের মন জয় করে নিল, কীভাবে তাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিল।

সিরিয়ান বিদ্রোহীরা যখন দেশজুড়ে বিভিন্ন এলাকা নিজেদের দখলে নিচ্ছিল, অরাজকতা স্বাভাবিক ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে। স্থানীয় জনগণও সরকারের কবল থেকে মুক্তির মূল্য হিসেবে এসব বিশৃঙ্খলা মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে এফএসএর কয়েকটি গ্রুপ চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল, কিন্তু দাবি করত সরকারি বাহিনী এসব ঘটাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলার আরও অবনতি হয়, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে স্থানীয়দের মূল মাথাব্যথাই ছিল এই অরাজকতা।

এফএসএর কিছু গ্রুপ ফ্রন্টলাইন থেকে নিজেদের সরিয়ে পুরোপুরি পয়সা কামানোর ধান্দায় আত্মনিয়োগ করে। দলাদলি, মুনাফাখোরি আর অযোগ্যতা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে শুরু করে। ২০১২ সালের শেষ দিকে ইসলামিস্টদের পায়ের নিচে মাটি জমতে শুরু করে। কারণ সরকার পরিচালনা হোক কিংবা যুদ্ধ পরিচালনা, এফএসএর 'ইতর' মিলিশিয়াদের চেয়ে তারা অধিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। দেশজুড়ে বিদ্রোহী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ইসলামিস্টদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে।

তারা শরিয়া কমিটি গঠন করে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের দেখভাল শুরু করে এবং সরকার-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করে। কিছু কিছু এলাকায় নুসরা শরিয়া আইন বাস্তবায়ন বেগবান করার লক্ষ্যে অন্যান্য ইসলামি দলের সঙ্গে একত্রে কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে এই ব্যবস্থা টেকসই হতে পারেনি। ইসলামিক দলগুলো বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী থেকে অর্থনৈতিক অনুদান গ্রহণ করত। স্বভাবতই দাতাগোষ্ঠী চাইত তাদের প্রদত্ত অর্থ যেন তাদের পছন্দমাফিক ব্যয় হয়। ফলে বিভেদ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

আদর্শিক ব্যবধানও শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা এবং কার্যকর নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলার একটি অন্তরায় ছিল। তা ছাড়া ইসলামি গ্রুপগুলো স্থানীয় সমাজের

সঙ্গে বাঁধা ছিল। শরিয়া আইন বাস্তবায়নের জন্য জনমতের প্রয়োজন হতো, জনগণের সম্মতিতেই কেবল তারা এটি করতে পারত। বিশেষত, যখন শক্তিশালী আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ কিংবা প্রভাবশালী পরিবার জড়িত থাকত, তখন জটিলতা আরও বাড়ত। আইসিসের উত্থানের আগ পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিল আন নুসরা। তারাও কখনো কখনো স্থানীয় প্রভাবশালী পরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। নুসরা ও অন্য ইসলামিস্ট গ্রুপগুলো তাই জনবিচ্ছিন্নতা এড়ানোর লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পিছু হটত।

এ ক্ষেত্রে আইসিসের নীতি ছিল বিপজ্জনক। আইন বাস্তবায়নে তারা ছিল অবিচল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ জন্য কখনো কখনো তারা প্রভাবশালী স্থানীয় শক্তির বিরুদ্ধে যেতেও পরোয়া করেনি। এমনকি যখন এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সিরিয়ায় আইসিসের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তখনো তারা নীতির সঙ্গে আপস করেনি। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির সময়টুকুর কথা বলা যায়। তারা নিজেদের শরিয়া কমিশন ব্যতীত অন্য কোনো কমিশনকে কখনো সহ্য করেনি, স্বীকৃতিও দেয়নি। যেকোনো মূল্যে তারা একক প্রশাসন ধরে রাখার পক্ষে ছিল। 'যদি আপনি এফএসএ কমান্ডার হোন, আপনার সিভিলিয়ান আত্মীয়স্বজন থাকে, তো এফএসএ ও অন্য বিদ্রোহী গ্রুপ মধ্যস্থতা গ্রহণ করবে,' বলছিলেন হাসসান আস সাল্লাউম, আঙ্কারায় বসবাসরত ইদলিবের একজন সাবেক বিদ্রোহী কমান্ডার। আইসিস যখন গৌণ খেলোয়াড় ছিল তখনকার কথা বলছিলেন। 'কিন্তু আইসিস পুরোপুরি ভিন্ন ধাতুর। আপনি যদি কোনো এফএসএ কমান্ডারের বিরুদ্ধে নালিশ করেন, তারা সোজা গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তারা কোনো ধরনের মধ্যস্থতার ধার ধারবে না। ফলে মানুষ নিজেদের অভিযোগ নিয়ে আইসিসমুখী হতে শুরু করে। জনগণই তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান জানায়। বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে শুরু করে। এফএসএর এসব করার মুরোদ নেই। আইসিস সেটাই করত, যেটা আপনি চান। ফলে আপনি তাদের পক্ষে বলতে শুরু করবেন। আমি যদি আমার কোনো সৈন্যকে আঘাত করতাম, সে তাদের নিকট চলে যেত। তারা তাকে অস্ত্র, বেতন এমনকি হাতখরচও দিত।'

যখন তারা কোনো শহর দখল করত, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করত। যেকোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জনসম্মুখে অস্ত্রবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করত। তাৎক্ষণিকভাবে তারা স্থানীয় জনসাধারণকে নিরস্ত্র করত, প্রথমে ভারী অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করত। যেসব সিরিয়ান এফএসএর শাসনাধীনে ছিল, তারা এই পরিবর্তনকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

'আপনি আলেপ্পো, রাক্কা, দার আজজুর এমনকি ইরাকেও একা একা ড্রাইভ করে চলে যেতে পারবেন, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না,' দার আজজুরের একজন বাসিন্দা বলছিল। 'অথচ পূর্বে অবস্থা ছিল যত্রতত্র বিভিন্ন তল্লাশিচৌকিতে আপনাকে থামানো হবে, একে ঘুষ, ওকে তেল দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।'

যারা পরিবহন খাত, ব্যবসা কিংবা তেলক্ষেত্র অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করত, তাদের ভোগান্তি ছিল কল্পনাতীত। সব সশস্ত্র দল গঠিত হয়েছিল তেলক্ষেত্র দখল, যাতায়াত-শুল্কারোপ, তেল ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা প্রদান, চোরাচালানে সহায়তা কিংবা যেকোনো মূল্যে পয়সা কামানোর ধান্দায়। লাগাতার গোলাগুলি, ঢালাও হত্যাকাণ্ড, কিডন্যাপিং, চাঁদাবাজি ছিল অধিকাংশ এলাকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কোনো ব্যক্তি যার সশস্ত্র গ্রুপগুলোতে কোনো আত্মীয় আছে, সে কাউকে হত্যা করলে, নিহতের পরিবারের বিচার পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না, যদি না অন্য কোনো শক্তিশালী সশস্ত্র দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকে। তাদের মাধ্যমে সে শরিয়া কোর্টে সুবিচারের আবেদন জানাতে পারত।

আইসিসের আগমনে পরিস্থিতি ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রথম দিকে তো জনগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। কখনো কখনো আনন্দের আতিশয্যে আবেগ প্রকাশে বাঁধনহারা হয়ে যেত। 'বিগত ২০ বছরে এত নিরাপদ আমরা কখনো বোধ করিনি,' দার আজজুরের এক বৃদ্ধ চাচা বলছিলেন। 'গোলাগুলির শব্দ শুনতে হচ্ছিল না। অমুককে মেরে ফেলেছে, এই হয়েছে, সেই হয়েছে এসবের কিছুই আর শোনা যাচ্ছিল না। কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই যেখানে খুশি ভ্রমণ করতে পারছিলাম।' তবে কদিন বাদে তারা তাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু আগের মতো আইসিসের প্রশংসায় অত পঞ্চমুখ হয়নি।

নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে সবচেয়ে বেশি যে প্রশংসাটা আইসিস পেয়ে থাকে—দায়িত্বশীলতা। এফএসএ কিংবা অন্য ইসলামিস্ট গ্রুপগুলোর বিপরীতে আইসিসের নিকট কোনো অভিযোগ এলে তারা সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোল গ্রুপ পাঠিয়ে দিত অভিযুক্তকে উপস্থিত করতে। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ কবেকার সেটা বিবেচ্য নয়। কয়েক বছর আগের মামলা হলেও একই অ্যাকশন। এ ধরনের কেসে জড়িত এক বাসিন্দা আমাদের বলেছেন, যথাযথ কাগজপত্র থাকলে তারা মামলার সমাধান করে দিত। আলবু কামালের অধিবাসী রিফাত আল হাসসান তার এক আঙ্কেলের ঘটনা শুনিয়েছে। এই ভদ্রলোক স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর প্রতারণার ফলে লাখ লাখ সিরিয়ান পাউন্ড খুইয়েছিলেন। সেটা বিপ্লব শুরু হওয়ারও কয়েক বছর আগের ঘটনা। আলবু কামালের দখল আইসিসের হাতে আসার পর তারা সেই প্রতারক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। আত্মসাৎ করা সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আইসিস সদস্য এমনকি কমান্ডারদের ওপরও আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তাদের বেশ কিছু সদস্য ও কমান্ডার সাজার মুখোমুখি হতে হয়েছে অবৈধ আয় কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে। তারা ২০১৪ সালের নভেম্বরে দার আজজুরের এক কমান্ডারকে হত্যা করে আত্মসাৎ ও ডাকাতির অভিযোগে। আইসিসের দাবি অনুযায়ী সেই কমান্ডার মুরতাদ আখ্যায়িত করে কিছু নাগরিকের বাড়ি লুণ্ঠন করেছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য এলাকায়ও একই রকম ঘটনা শোনা গিয়েছে। ইরাকি সীমান্ত শহর আল কাইয়িমের বাসিন্দা ইমাদ আল রাবি, ২০১৪ সালের আগস্টে আইসিসের আনুগত্য গ্রহণ করেছিল। সে আমাদের বলেছে, ১০ জন আইসিস সদস্যের বিচার হয়েছিল চোরাকারবারিদের থেকে জব্দকৃত তামাক বিক্রির অভিযোগে।

'যখন তারা মাদক-তামাক বিক্রির দোকানে অভিযান চালাত, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলত না। কোনো বাড়িতে অভিযান চালালে সেখান থেকেও মাদক চুরি করে নিয়ে আসত। ইসলামিক স্টেট এটা টের পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। সেই ১০ জনের কেউই তামাক সেবন করত না, তারা শুধু বিক্রি করত,' রাবির ভাষ্য।

এসব নীতির কারণে আইসিস যথাযথ আইন প্রয়োগকারী হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছিল। পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি সামাজিক ইউনিট থেকে সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল—বিপ্লব থেকে যেসব সিরিয়ানের মোহমুক্তি ঘটেছিল, আসাদ সরকারের অধীনে শান্তি ও নিরাপত্তার কথা স্মরণ করে যারা বিলাপ করত। দ্বিতীয় গ্রুপ হচ্ছে এফএসএ ও ইসলামিস্টরা, যাদের কোণঠাসা করে রেখেছিল। ফলে অন্যদের পাশাপাশি এসব হতাশাবাদীর নিকটও আইসিসের শাসন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

'সরকার ভুল করেছে এবং বারবার সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছে,' বলছিলেন হাসাকার গাসসাম আল জুমা। 'এফএসএ-ও এসব ভুলের পুনরাবৃত্তি করছিল এবং তাদেরকে থামানোর মতো কেউ ছিল না। কিন্তু আইসিস যখন ভুল করত, সে ভুলের পুনরাবৃত্তি হতো না। আপনি গিয়ে অভিযোগ করলেই হবে। যদি কেউ আপনার অভিযোগে সাড়া না দেয়, তবে সোজা অপরাধীর কমান্ডারের নিকট চলে যাবেন, আপনার কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে, সব সময়। যদি আপনি সঠিক হয়ে থাকেন।'

ইরাকেও অ্যাওয়াকেনিং কাউন্সিল গঠনের আগে আইসিস যেসব ভুল করেছিল, সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করেছে। তাদের প্রধান কৌশলই ছিল মানুষের মন জয় করে নেওয়া, স্থানীয় নেতাদের সমর্থন আদায় করা। মসুল পুনরুদ্ধারের পর আইসিস রাস্তায় ভারী টহল পরিহার করেছিল। তাদের সৈন্যদের

খুব একটা দেখা যেত না রাস্তায়। সেখানকার অধিবাসীদের বর্ণনামতে, ইরাকি বাহিনী মসুল ত্যাগ করার পর প্রথম সপ্তাহে রাস্তায় যেসব সৈন্যকে দেখা গেছে, তারা বেশির ভাগই ছিল পার্শ্ববর্তী এলাকার।

মসুলসহ অন্যান্য শহরেও আইসিস স্থানীয় প্রশাসনকে নিজেদের কাজ নিজেরা সমাধা করতে দিয়েছে। বিশেষত, যেখানে তারা ছিল তুলনামূলক নিরাপদ কিংবা লোকবলের ঘাটতি ছিল। রাস্তাঘাটে আইসিসের অনুপস্থিতি মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছে, ইরাকি শহরগুলোতে বেশি। তবে সিরিয়ান শহরগুলোতে তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে এই নীতি থেকে কিছুটা বিচ্যুত হতে হয়েছে। কারণ সেখানে পরস্পরবিরোধী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর উৎপাত ছিল প্রচণ্ড। এ ক্ষেত্রে তারা বরং সেসব গ্রুপে থাকা নিজেদের স্লিপার সেল থেকে উপকৃত হয়েছে। পাশাপাশি আইসিসের ভয়ংকর নির্মমতার কুখ্যাতি তাদের জন্য শাপেবর হয়েছে। শাসনের প্রথম দিনগুলোতে শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছে।

'মানুষ আইসিসের ভয়েই সোজা হয়ে যেত, কারণ তারা আসার আগেই তাদের "সুখ্যাত" পৌঁছে যেত,' কাইয়িম শহরের আল রাবি বলছিল। 'প্রথম দিকে জনগণ তাদের থেকে দূরে দূরে থাকত। কিন্তু একবার যদি তাদের সঙ্গে মিশত, মসজিদ কিংবা অন্যত্র, তাদের সঙ্গে "খুবই" স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। তাদের আত্মনিবেদন মানুষ খুব ভালোবাসত, তাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করত, যদিও তাদের সংগঠনের অংশ ছিল না এরা। আইসিস শুধু সেখানেই হস্তক্ষেপ করত, যেখানে প্রয়োজন। এ ছাড়া স্থানীয় জনতাই বেশি দৃশ্যমান ছিল।' যেসব এলাকায় আইসিসের লোকবল দরকার, সেখানে এখনো তাদের এই নীতি বহাল আছে।

মসুল দখলের পর স্থানীয় প্রশাসনকে অঙ্গীভূত করতে তারা নতুন কৌশল গ্রহণ করে, যদিও এখনো একে নির্ভরযোগ্য মনে করে না। এর নাম দিয়েছে 'মুনাসসির' বা সাপোর্টার। আইসিসের স্থানীয় যোদ্ধাদের বলা হতো আনসার আর বিদেশি যোদ্ধাদের মুহাজিরিন। মুনাসসিররা আইসিসের সদস্যপদ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়াই তাদের আনুগত্যের শপথ নিতে পারত।

মুনাসসিররা সাধারণত নগর পুলিশ, পৌরসভার ছোটখাটো দায়িত্ব পেত। এসব দায়িত্বকে আইসিস বলত খিদমাতুল মুসলিমিন। এই নীতির ফলে আইসিস অতিমাত্রায় দৃশ্যমান হওয়া ছাড়াই শাসন পরিচালনা, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি এবং স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উসকে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পাশাপাশি যুদ্ধের সময় ফ্রন্টলাইনে রিজার্ভ হিসেবে এসব সদস্যকে মাঝেমধ্যে ব্যবহার করত। যেমনটা ঘটেছিল কাবোনে, রাক্কার বাসিন্দাদের ভাষ্য অনুযায়ী।

তবে স্থানীয় শক্তিগুলোকে যৎসামান্য সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত সামরিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আইসিসের হাতেই থাকত। অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ ও দক্ষ সরকারব্যবস্থার সমন্বয়ের ফলে আইসিসের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিদ্রোহের আগ্রহ ছিল কম, প্রতিবন্ধকতা ছিল বেশি। বিশেষত, যখন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য কোনো বিকল্প না থাকে। ফলে যেকোনো বহিঃশক্তির পক্ষে আইসিসের দখলকৃত ভূমি পুনর্দখল করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল, পাশাপাশি শূন্যস্থান পূরণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জোট বাঁধাও ছিল মুশকিল।

সর্বত্র এবং কোথাও নয়

সামরিক শক্তি হিসেবে খুব বেশি দৃশ্যমান না হওয়ার প্রবণতার পাশাপাশি আইসিস দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাইক্রোম্যানেজমেন্টেও (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দায়িত্ব গ্রহণ) যথাসম্ভব অনাগ্রহী ছিল। ফলে স্থানীয় শক্তি ও তাদের সহযোগীরাই দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করত। কোনো শহর দখলের পর আইসিস সাধারণত যে কাজটা সর্বপ্রথম করত—হুদুদ স্কয়ার প্রতিষ্ঠা। এখানে তারা শরিয়া আইনের সাজা বাস্তবায়ন করত। যেমন শিরশ্ছেদ, বেত্রাঘাত ও হাত কর্তন। বারি আবদুল লতিফের ভাষ্যমতে, আল বাবে এই জায়গাটা ছিল টাউন স্কয়ারে, বন্ধ করে দেওয়া হুকা ক্যাফের ঠিক বিপরীত পাশে।

এরপর তারা শরিয়া কোর্ট, পুলিশ বিভাগ ও সিকিউরিটি অপারেশন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করত। শরিয়া পুলিশ বিভাগের নাম ছিল হিসবাহ। শরিয়া আইনের প্রয়োগেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা বাজার তদারকও করত। বিশেষত, শহরের কেন্দ্রস্থলে এরা খুব সক্রিয় ছিল। আইসিসের এলাকাগুলো—ওলায়াত (প্রদেশ, ইরাক ও সিরিয়ায় মোট ১৬টি ওলায়াত ছিল) ও কাওয়াতি (ছোট শহর)-এ বিভক্ত ছিল। প্রতিটি কাওয়াতিতে একজন সামরিক কমান্ডার, এক বা একাধিক নিরাপত্তা কমান্ডার, একজন সাধারণ আমির নিয়োগ দেওয়া হতো, যাদের ওয়ালির (প্রাদেশিক গভর্নর) নিকট জবাবদিহি করতে হতো।

প্রতিটি শহরের প্রধান আমিরকে তাঁর শাসিত এলাকায় থাকতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। যেমন মিনবিজ, আল বাব ও দার আজজুরের আংশিক নিয়ে গঠিত হয়েছিল ওলায়াত আল খাইর বা খাইর প্রদেশ। এর আমির সাধারণত রাক্কা কিংবা হাসাকার শাদ্দাদিতে বসবাস করতেন। ওলায়াতুল ফুরাতের (সিরিয়ান শহর আলবু কামাল ও ইরাকি কাইয়িম শহর নিয়ে গঠিত) ওয়ালি ইরাকে বসবাস করতেন, সিরিয়ায় কদাচিৎ ভ্রমণ করতেন। ইরাকি ওলায়াতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা।

রাক্কা আর মসুল ছিল তাদের রাজধানী। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রতিনিধিদল তাদের দখলকৃত বিভিন্ন প্যালেসে দেখা করত। আইসিস সদস্যদের জনসম্মুখে যথাসম্ভব কম অস্ত্র প্রদর্শন করার দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো। যেমন মিনবিজে তারা বাজেয়াপ্ত করা কিছু বাড়িতে নিজেদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখত। তল্লাশিচৌকিগুলোতে ছোট ছোট দল দায়িত্ব পালন করত, প্রায়ই শিক্ষনবিশ সদস্য, যারা এখনো বেসিক ট্রেনিং সমাপ্ত করেনি।

তারা কখনো নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করলে শহরের স্থানীয় ও বিদেশি যোদ্ধাদের একত্র করত। রিজার্ভ হিসেবে পাশের এলাকা থেকে সৈন্যদের নিয়ে আসত। সিকিউরিটি অপারেশনগুলোতে 'প্রতিবন্ধকতা নীতির' অংশ হিসেবে অতিরিক্ত শক্তির প্রদর্শন ছিল আইসিসের হলমার্ক। এই সর্বত্র-কোথাও-নয় নীতির দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, এর ফলে স্থানীয় শক্তিগুলো আইসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিবাস্বপ্ন দেখতে সাহস পেত না, কারণ তারা স্থানীয়দের নিজেদের কাজ নিজেরা করার সুযোগ দিত। দ্বিতীয়ত, দ্বন্দ্ব নিরসনে তাদেরকে প্রধান উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আইসিস-নিয়ন্ত্রিত এলাকার অধিবাসীদের মাঝে আইসিসের বিরুদ্ধে অভিযোগের চেয়ে নিজেদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ছিল প্রাত্যহিক বিষয়। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দাবিও আসত যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে বিদেশি যোদ্ধারা অধিক নিয়মানুবর্তী ও সদাচারী। তারা অন্যান্য গ্রুপের সদস্যদের অস্ত্র রাখার অনুমতি দিত, যতক্ষণ তারা শুধু ফ্রন্টলাইনে সেই অস্ত্র ব্যবহার করত। যারা আইসিস থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্য গ্রহণ করত, তারা আইসিস আমিরের নিকট জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে সর্বনিম্ন কর্মঘণ্টা বেঁধে দেওয়া ছিল, যা পূরণ করতে হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিতির মানে ছিল অস্ত্র ত্যাগ। অন্যান্য সশস্ত্র গ্রুপের সদস্যদেরও একই নীতি অনুসরণ করতে হতো, যদি তারা নিজেদের এলাকা শাসন করতে চায়। ফালুজা ও সিরিয়ার সদ্যবিজিত এলাকাগুলোতে শর্ত তুলনামূলক কঠিন : আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা। 'প্রথমে আইসিস চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে কঠিন শর্তারোপ করে,' দার আজজুরের একজন এফএসএ যোদ্ধা বলছিল। ২০১৩ সালে প্রাদেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে সে বলেছে, 'তোমরা যদি দার আজজুর বিমানবন্দর নিয়মিত সচল রাখতে না পারো, তবে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে।' স্থানীয়দের নিরস্ত্রীকরণ আইসিসের গ্রহণযোগ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এফএসএর সময়ে অস্ত্র ক্রয় ও বহন ছিল প্রয়োজনীয় কাজ। নয়তো নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি আর লাগামহীন চুরি-ডাকাতির ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত অসম্ভব ছিল। হাসাকার একজন অধিবাসীর ভাষ্য, 'প্রত্যেকেই অস্ত্র

বহন করত—শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই। আপনার যদি অস্ত্র না থাকে, তবে বাজারে হাঁটতে পারবেন না, সব সময় ভীত থাকতে হবে। ছোটখাটো কোনো ঝামেলায় জড়ালেও আপনি "শ্যাষ"।' শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টের ভয় কাজে লাগিয়ে, সামাজিক পতন রোধে আইসিস নিজেদের একমাত্র বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। অন্য সব সরকারের মতো তারাও অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা নিজেদের মাঝে সীমিত করতে পেরেছিল।

তাকফিরিনোমিক্স

আইসিস তাদের কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারব্যবস্থার সঙ্গে ওয়ার ইকোনমির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল। এফএসএ ও ইসলামিস্ট গ্রুপগুলো পূর্ব সিরিয়ার তেলক্ষেত্রগুলো দখল করে রেখেছিল। আয়ের কিছু অংশ তারা বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখত, যেমন স্কুল পরিচালনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ, পানি, খাদ্য ও অন্যান্য সেবা। কিছু কিছু শহর ও গ্রামে এসব সেবার অবনতি হয়েছিল। কারণ আইসিস তেল বিক্রির টাকা স্থানান্তরে বিঘ্ন ঘটাত। তারা চাচ্ছিল ইরাক-সিরিয়ায় তাদের অধিকৃত এলাকায় একক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। ফলে তেলসমৃদ্ধ এলাকাগুলোর স্থানীয় যুদ্ধনেতারা ব্যর্থ হতে শুরু করে। কেননা তারা ছিল অতিমাত্রায় স্থানীয়, নিজ এলাকার বাইরে তাদের কোনো দখল ছিল না। স্থানীয় যুদ্ধনীতির একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এটি।

অন্য বিদ্রোহী দলগুলোর বিপরীতে আইসিস তাদের দখলকৃত এলাকায় স্থানীয় পৌরকর্মীদের কাজ করতে বাধ্য করত। যেখানে অন্যরা সরকার থেকে বেতন-ভাতা নিয়ে ঘরে বসে থাকত, কোনো কাজ ছাড়াই বেতন ভোগ করত। 'এখন রাস্তাঘাট সব ঝকঝকে। আগে ৭০ ভাগ সরকারি চাকুরে কাজে যোগ দিত না,' এফএসএর সঙ্গে কাজ করা দার আজজুরের সাবেক এক মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টের ভাষ্য। 'তারা শনিবারে চিরাচরিত ছুটির দিন বাতিল ঘোষণা করেছে, পরিবর্তে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন নির্ধারণ করেছে।'

বাজার তদারকি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইসিসের সফলতার আরেকটি কারণ। জেলেদের ডিনামাইট ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জাজিরার বাসিন্দাদের যুদ্ধের অস্থিরতা কাজে লাগিয়ে নতুন জমি দখলে সাবধান করে দিয়েছে। বিশেষত, সিরিয়ান মরুভূমিতে। যেখানে তারা প্রতিবেশীদের জায়গা দখল করে ঘরবাড়ি আর ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তুলছিল। তেল ও তেলজাত পণ্য, বরফ, ময়দা ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে লাভের পরিমাণ নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল আইসিসের দখলে যাওয়ার আগে এখানে বিপুল তেল উত্তোলন হতো। প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার ব্যারেল। ব্যারেলপ্রতি দাম ছিল দুই হাজার পাউন্ড, বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ১১ ডলার। স্থানীয় যেসব পরিবার তেল শোধনাগারে কাজ করত, তাদের ব্যারেলপ্রতি বেতন ছিল ২০০ লিরার মতো, এক ডলারের একটু বেশি। এই এলাকা আইসিসের দখলে যাওয়ার পর তারা প্রতি লিটার তেলের দাম নির্ধারণ করে দেয় ৫০ পাউন্ড ৩০ সেন্ট।

আবাসিক এলাকার আশপাশে তেল শোধনাগার স্থাপন নিষিদ্ধ করে। নয়তো বাজেয়াপ্ত করার আশঙ্কা ছিল। ফলে অনেক পরিবার তাদের তেল ব্যবসা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তবে সামগ্রিকভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ফলে সম্পদ ও সেবায় যে ঘাটতি ছিল, তাতে কিছুটা ভারসাম্য আসে। গালফ রাষ্ট্রগুলো থেকে আসা ভর্তুকিও কিছু কিছু পরিবারকে বিদ্যুৎ উৎপাদন-যন্ত্র ও উপজাত হিসেবে তেল উৎপাদনে সহায়তা করেছে। আইসিস-নিয়ন্ত্রিত এলাকার যেসব সদস্য গালফ রাষ্ট্রগুলোতে বসবাস করত, আগে তারা মাসে একবার রেমিট্যান্স পাঠাত, এখন দুবার পাঠাচ্ছে।

কোয়ালিশন বাহিনীর বিমান হামলা শুরু হওয়ার আগে তেল বিক্রি ছিল আইসিসের আয়ের অন্যতম উৎস। সিরিয়া-ইরাকে প্রতিদিন প্রায় ১-২ মিলিয়ন ডলার আয় করত। বিমান হামলা শুরুর পর তাতে ভাটা পড়ে। তবে এখনো পার্শ্ববর্তী তুরস্ক-জর্ডান ও ইরাক-সিরিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য এলাকায় তেল সরবরাহ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এই হামলার ফলে আইসিসের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। কারণ, আইসিস আরও অনেক উৎস থেকে উপার্জন করতে পারে, জনসাধারণ পারে না। পাশাপাশি নাগরিক সেবায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। বিশেষত, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে যেমন গ্যাস সিলিন্ডার। 'আমার হিসাব অনুযায়ী বিমান হামলার ফলে তাদের ক্ষতির পরিমাণ ৫ পার্সেন্ট,' এফএসএর সাবেক মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টের তথ্য অনুযায়ী। সে এখনো দার আজজুরে আছে। 'এর প্রথম ধাক্কাটা লেগেছে তেলের ওপর। খাবারের অভাব নেই। বেশির ভাগই আসে ইরাক ও তুরস্ক থেকে। তার পরও যদি আপনার মনে হয় মূল্য বেশি, তো সব সীমান্ত খোলা। চাইলে আনবারে চলে যেতে পারেন। আমি সবকিছু এখনো স্বাভাবিকই দেখছি।'

তাদের তেলের বাজার অনেক পর্যবেক্ষককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। যদিও ডেরিক হার্ভি এই তালিকায় নেই। তাঁর ভাষ্য, 'আমি এ বিষয়টা খুব ভালো জানি যে নব্বইয়ের দশকে জাতিসংঘের অবরোধ ফাঁকি দেওয়ার জন্য সাদ্দামের যেসব অফিসার কাজ করেছে, তাদের প্রায় সবাই এখন আইসিসে। মানুষ বলছে, তারা এখন ব্যারেলপ্রতি ৩৫ ডলার বিক্রি করছে। আমাদের বম্বিং ছিল মূলত কিছু স্থানীয়

রিফাইনারিতে। যদি এই দামেই তারা বিক্রি করে, তবে এটা এখনো আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে ৫০-৫৫ ডলার কম। কিন্তু এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয়- এসব তেল বিক্রি করে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়ারা। আইসিসের শীর্ষ নেতৃত্ব সেখান থেকে মাসোহারা পায়। ব্যারেলপ্রতি তাদের ভাগ প্রায় ২০-২৫ ডলার। তবে এই তথ্য খাতা-কলমে নেই, তাই সবাই জানে না। বুঝতেও পারে না। এই অর্থ যায় পিরামিডের সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকা কিছু নেতার পকেটে। দার আজজুরের যোদ্ধারা এটি নাও জানতে পারে।'

সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা গালফ দেশগুলো থেকে আসা রেমিট্যান্স আর স্থানীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে শিখে গেছে। এমনকি বিপ্লবের আগে থেকেই। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেকেই কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে। কারণ জ্বালানি তেল দজলা-ফুরাতের বহু মাইল দূরের খেতে সেচ প্রদান করাতেই ব্যয় হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরুর পর তেলের মূল্যহ্রাস 'এগ্রোবিজনেস' তথা কৃষি-ব্যবসায় স্ফীতি ঘটিয়েছে। চোরাচালান আর গৃহপালিত পশু বিক্রিও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। আইসিস যখন জাজিরার নিয়ন্ত্রণ নেয়, সেখানকার অধিবাসীরা সরকারি ভর্তুকি ছাড়াই নিজদের অর্থে সেচের তেল আর বিদ্যুৎ কিনতে সক্ষম ছিল।

জার্মানির ফরেন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বিএনডি আইসিসের তেল বিক্রির আয়ের অতিমূল্যায়নের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। কারণ জনকল্যাণমূলক কাজে একটা বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়, নিজেদের ভূখণ্ডে খরচ করতে হয়। কিন্তু হার্ভির মত হচ্ছে, এসব তেল বিক্রির বেশির ভাগ টাকাই আইসিসের পকেটে যায়। কারণ তারা বেশ কিছু খাতে জনগণ থেকে ট্যাক্স আদায় করে, অথচ সেবাগুলো তারা দেয় না, দেয় মূলত আসাদ সরকার, যেমন বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ।

অন্যান্য ইসলামিস্ট গ্রুপের বিপরীতে, যারা সরকারপ্রদত্ত সেবাগুলো জনগণকে বিনামূল্যে সরবরাহ করত, আইসিস এগুলোতে ট্যাক্স বসিয়েছে, যেন তারা নিজেদের সেবা বর্ধিত করতে পারে। নতুন সেবা প্রদান করতে পারে। তাদের আয়ের আরেকটি উৎস হচ্ছে জাকাত। সেখান থেকেও মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড পেয়ে থাকে। অমুসলিম, বিশেষত খ্রিষ্টানদের থেকে আইসিস কিছু অর্থ পেত। ধনীদের ওপর ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ, মধ্যবিত্তদের জন্য এর অর্ধেক। বাস্তুচ্যুত, ওয়ান্টেড ও আইসিসের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তারা সেগুলো দখল করে নিত। এটিও তাদের আয়ের একটি উৎস। জনসাধারণকে নিরস্ত্রীকরণ পলিসির অংশ হিসেবে তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে থাকে। দাতাদের অনুদানও তাদের ট্রেজারির যৎসামান্য প্রয়োজন মেটায়। ধনী

সদস্যরাও অনেক অনুদান দিয়ে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি খাত হচ্ছে গনিমত। এটি তাদের আয়ের অনেক বড় ও নির্ভরযোগ্য উৎস।

ইরাকের তিনটি সেনা ডিভিশনকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার পর আইসিস মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম হস্তগত করে। এটি ২০১৪ সালের আগস্টের ঘটনা। এ ছাড়া সিরিয়ান সরকার ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সামরিক সরঞ্জাম, অবকাঠামো ও নগদ অর্থের বিপুল মজুদ দখল করে তারা। পুরাতত্ত্বের ব্যবসা ছিল আয়ের আরেকটি লোভনীয় খাত। তুরস্কে আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দেওয়া একজন বলেছে, তার কাজিন পুরাতাত্ত্বিক ব্যবসা করে আইসিস আমলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। সে মারির পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ থেকে বিভিন্ন স্ট্যাচু ও কয়েন চুরি করে সেগুলো তুরস্কে চালান করত। মারি শহরটি আলবু কামাল থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে।

পরিশিষ্ট

আইসিস কর্তৃক জেমস ফোলির শিরশ্ছেদের ভিডিও বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হওয়ার কদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের চাপে ইরাকের স্বৈরশাসক নুরি আল মালিকি পদত্যাগ করেন। বাহ্যত তাঁর রাজনৈতিক অদক্ষতার ফলে আইসিসের উত্থান ঘটেছে। এ জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে এসেছেন দাওয়া পার্টির ৬২ বছর বয়সী হায়দার আল আবাদি, লন্ডনে নির্বাসনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তিনি।

নুরির পরিবর্তে আবাদির ক্ষমতারোহণ উন্নতি হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। সে সময় আমরা ইরাকের বেশ কিছু সুন্নির সঙ্গে কথা বলি, তাঁদের কেউই এই আশা করতেন না যে আবাদি মালিকির চেয়ে ভিন্ন কিছু করবেন বা করতে পারবেন। কারণ হচ্ছে, ইরাকের জাতীয় রাজনীতির তীব্র সাম্প্রদায়িক বিভক্তি, সঙ্গে বাগদাদের ওপর ইরানের সীমাতিরিক্ত প্রভাব। নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর একদম প্রথম দিকের একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, তিনি আইসিসকে মোকাবিলায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা চান, সুন্নিদের দৃষ্টিতে এই মিত্রতার সূচনা ২০০৩ সালে। তাই তাঁর এই বক্তব্য ভালো কিছুর লক্ষণ ছিল না।

'মার্কিনিরা আমাদের প্রস্তাব দিয়েছে, ইরাককে ইরাকবাসীর হাতে ছেড়ে দাও,' সামি আল আসকারি, সাবেক ইরাকি এমপি ও মালিকির উপদেষ্টা, রয়টার্সকে বলেছেন। 'কিন্তু ইরানিরা বলেনি যে ইরাক ইরাকবাসীর হাতে ছেড়ে দাও, তারা বলছে ইরাককে আমাদের হাতে ছাড়ো।' বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের এক নম্বর পৃষ্ঠপোষক দেশটি এখন নিজেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বশেষ দুর্গ হিসেবে পেশ করছে। কুদস ফোর্সের কমান্ডার এখন শুধু শ্যাডো মিলিশিয়া আর স্পেশাল ফোর্স তৈরির তত্ত্বাবধানই করছে না, যাদের কাজ হচ্ছে মার্কিন সৈন্য আর অগণিত সুন্নি সিভিলিয়ান হত্যা। বরং এখন দামেস্কের ভয়ংকর খুনি সরকারকে সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে। ফিলিপ স্মিথের মতে, চরম ধর্মীয় গোঁড়ামিসম্পন্ন, আমেরিকাবিরোধী, ভয়াবহ রকম সাম্প্রদায়িক প্রায় পঞ্চাশোর্ধ শিয়া মিলিশিয়া গ্রুপ ইরাকে সক্রিয়।

এখন নতুন করে পট তৈরি করা হচ্ছে। সোজা কথায়, ২০০৪ সালে জারকাবি যে সাম্প্রদায়িক পবিত্র যুদ্ধের খোয়াব দেখেছিলেন, তা এখন দুই দেশে একই সঙ্গে খেলা হবে। ইরাকের একজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তার ভাষ্য, 'আমি খুব একটা আশাবাদী নই। একক রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য ইরাকের সামনে এটি সর্বশেষ সুযোগ।'

আল আবাদির জাতীয় ঐক্যের আহ্বান সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক রক্তপাত চলমান ছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্যমতে, আইএসএফ এবং শিয়া মিলিশিয়ারা ২০১৪ সালের ৯ জুন পর্যন্ত ছয়টি গ্রামে মোট ২৫৫ জন সুন্নিকে হত্যা করেছে। ১০ তারিখ মসুলের পতন হয়েছে। তাদের মাঝে আটজনের বয়স ছিল ১৮-এর নিচে। সেই বছরের ২২ আগস্ট দিয়ালার মুস'আব বিন উমায়ের মসজিদ আক্রমণ হয়। আইসিস আগেই ভেবেছিল, সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াই হবে সেখানে। আইএসএফ ও আসইয়াব আহলিল হকের সদস্যরা সিভিলিয়ান পোশাকে এই আক্রমণ চালিয়েছিল। ডজন ডজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

আল আবাদি মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মুহাম্মাদ আল গাব্বান। তিনি বদর অর্গানাইজেশনেরও সিনিয়র নেতা। যার মানে হচ্ছে, এই কুখ্যাত খুনি ডেথ স্কোয়াড পুনরায় আবার দেশজুড়ে ক্ষমতা পেতে যাচ্ছে, পুলিশ বাহিনীর চেয়েও বেশি।

ইরাক হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গবেষক ইরিন ইভার্সের ভাষ্যমতে, 'পরবর্তী সময়ে বদর বাহিনী কিডন্যাপিং, হত্যা, সুন্নিদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, সেগুলোতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোটা গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়ার অভিযোগও এসেছে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পথ পরিষ্কার করছে। এসব খুনির হাতে বর্তমানে দেশের যতটুকু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়।'

আইসিসের বিরুদ্ধে ইরাকের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণে সুলেইমানি জড়িত ছিলেন। অক্টোবরে আইসিস জুরফ আছ ছখর শহর থেকে বিতাড়িত হয়। বাগদাদের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দজলা উপত্যকার একটি শহর। এখানে সাত হাজার ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যকে পাশাপাশি কুদস ফোর্স ও লেবানিজ হিজবুল্লাহর সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রদান করত। গোটা অভিযানটা ছিল সুলেইমানির পরিকল্পনা।

২০১৪ সালের নভেম্বরে শিয়া-অধ্যুষিত তুর্কমান শহর আমেরলিতে আইসিসের কয়েক মাসের অবরোধ ভাঙার জন্য অভিযান চালায় আসাইব আহলিল হক, কাতাইব হিজবুল্লাহ। শহরটির জনসংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। আকাশপথে তাদেরকে কভার দিয়েছে মার্কিন যুদ্ধবিমান। মজার বিষয় হচ্ছে, কাতাইব হিজবুল্লাহ মার্কিন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠন। শহর পুনর্দখলের অল্প কিছুক্ষণ পরই হাস্যোজ্জ্বল সুলেইমানি আমেরলিতে ক্যামেরাবন্দী হন।

আরও দেখা যায়, কাতাইব হিজবুল্লাহর দখলে রয়েছে মার্কিন আব্রাম ট্যাঙ্ক। ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্সকে দেওয়া আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র শুধু আইসিসের হাতেই

যাচ্ছে না, অন্যরাও ভাগ পাচ্ছে, তা নিশ্চিত হয়েছিল। ইরাক-সিরিয়ায় বিগত সাত মাসে মার্কিন বিমান হামলার অর্জন কী?

পেন্টাগনের ভাষ্যমতে, আইসিসের হাতে থাকা ২০টি তেল শোধনাগারের মধ্যে ১৬টি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের অর্থের জোগান দিত। ড. হিশাম আল হাশিমির মতে, ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ আইসিস তাদের তেল থেকে অর্জিত অর্থের ৯০ ভাগ হারিয়েছে, ইরাকে ১১টি অস্ত্রগুদামের নয়টি, সিরিয়ায় ১০টির মাঝে তিনটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অসাধারণ এই প্রাপ্তির পাশাপাশি ছিল বিমান হামলায় আইসিসের ৩০ নেতার মৃত্যু।

এদের মাঝে ডজনখানেক ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যেমন বাগদাদির ডেপুটি আবু মুসলিম আত তুর্কমানি, মসুলের গভর্নর রিদওয়ান তালেব আল হামদানি এবং সালাদিন, ফালুজা, নিনাওয়া প্রদেশের সামরিক কমান্ডাররা। আল আবাদি দাবি করেছে, আল কাইয়িম শহরে বিমান হামলায় খোদ বাগদাদি আহত হয়েছেন। ওয়াশিংটনের ভাষ্যমতে, আইসিস প্রায় সাত হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড হারিয়েছে।

এটা প্রায় নিশ্চিত যে আইসিসের ঝটিকা আক্রমণের সোনালি যুগ শেষ হয়ে গেছে। ইরবিল দখলে তারা এখন কোনো হুমকি নয়, বাগদাদের জন্য তো নয়ই। এখন তারা প্রতিরক্ষা কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত। 'সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এখনো যে বিষয়টি আমার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সর্বদাই আইসিসের কৌশলগত পরিকল্পনা ছিল,' বলছিলেন ক্রিস হার্মার। 'সময়ে সময়ে দেখা গিয়েছে, তারা এক স্থানে বেশি সক্রিয় তো অন্যত্র নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কখনোই তারা দীর্ঘ মেয়াদে আত্মরক্ষামূলক পজিশনে ছিল না। সাময়িকভাবে যদিও আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করেছে, যেমন তারা মসুল ড্যামের দখল নিয়েছে আবার হারিয়েছেও। বাইজি তেল শোধনাগার কবজা করেছে, আবার বেদখল হয়ে গেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন কি আইসিস হারিয়ে যাচ্ছে? হেরে যাচ্ছে? না।'

তাদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে শত্রু-সীমান্তে। সিরিয়া-ইরাকজুড়ে নিজেদের প্রধান ভূকৌশলগত কেন্দ্রগুলোতে আইসিস এখনো তেমন সংকটে পড়েনি। যেমন সিনজার ও বাইজি কুর্দিদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাকুবা ও দুলুইয়াহ হচ্ছে বাগদাদের প্রবেশপথ, ফলে এটি ইরাকি সিকিউরিটি ফোর্স ও শিয়া মিলিশিয়াদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এসব শহর থেকে তাদেরকে জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে—রিকনসিলিয়েশন প্রোগ্রামের ভাইস প্রেসিডেন্ট আয়াদ আলাবির ভাষ্য। সতেরো শ বার বিমান হামলা সত্ত্বেও আইসিসের অগ্রযাত্রা থেমে নেই। বিশেষত, যেসব এলাকায় তাদের জনসমর্থন রয়েছে কিংবা সেখানকার সুন্নি জনগণ আইসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ভীত অথবা অনিচ্ছুক। অপারেশন ইনহেরেন্ট

রিজলভ পরিচালনার দুই মাস পরও আইসিস হিত শহর দখল করে নিয়েছে। যেখানে ২০০৫ সালে অ্যাডাম সাচ স্থানীয় সাহওয়ার ঝলক দেখতে পেয়েছিল। আনবারের বহু গ্রাম-পল্লিও তাদের দখলে চলে যাচ্ছে।

এক দশক আগে ডেরিক হার্ভি দেখিয়েছিলেন মিশ্র-সাম্প্রদায়িক এলাকাগুলো, যেমন বাগদাদ থেকে জিহাদিদের বের করতে পারার অর্থ এই নয় যে তারা পরাজিত হয়েছে কিংবা তাদের অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আল বাব, মিনবিজ, জারাবলুস, রাক্কা, দক্ষিণ হাসাকা, তাল আফার, কাইয়িম ও রামাদির প্রধান কেন্দ্রের আশপাশের এলাকায় আইসিস এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে শাসন পরিচালনা করছে। এবং নিকট ভবিষ্যতে এসব এলাকার ভেতর থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে সেই সম্ভাবনাও অতি ক্ষীণ। হাদিসা, আমিরিয়া, ফালুজার সুন্নি গোত্রগুলো আইসিস বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি, উল্টো আইসিস প্রশ্নে নিজেরাই লড়াইয়ে নেমে গেছে। ফলে আরেকটি অ্যাওয়াকেনিং বা সাহওয়ার সম্ভাবনাও তিরোহিত।

আল হাশিমির মতে, ইরাকে আইসিস ১০ ভাগ ভূখণ্ড হারিয়েছে, তবে সে ক্ষতি তারা সিরিয়ায় ৪ ভাগ ভূখণ্ড নতুন করে দখল করার মাধ্যমে পুষিয়ে নিচ্ছে। যদিও মার্কিন কর্মকর্তাদের মুখে আপনি এসব শুনতে পাবেন না। 'সিরিয়া কৌশলে কোনো পরিবর্তন আসেনি,' ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র অ্যালিস্টার বাস্কি ২০১৪ সালের নভেম্বরে বলেছেন। 'যেহেতু আমাদের প্রধান ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হচ্ছে আইসিসকে ইরাক থেকে উৎখাত করা, আমরা এবং আমাদের কোয়ালিশন বাহিনী সিরিয়াতেও বিমান হামলা চলমান রাখব, যেন সেখানে তারা ঘাঁটি গাড়তে না পারে এবং তাদের শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য।' বলা বাহুল্য যে তারা সিরিয়ায় ইতিমধ্যেই স্বর্গ গড়ে তুলেছে এবং অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভ শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়মিত তারা আরও অধিক শক্তি প্রদর্শন করে যাচ্ছে। দেশটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি এখন তাদের দখলে।

এমনকি সিরিয়া-তুরস্কের সীমান্ত শহর কাবোনে তিন মাসের তীব্র মার্কিন বিমান হামলা সত্ত্বেও তারা শহরের একাংশের নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। ওয়াশিংটনের দৃষ্টিতে শহরটি কৌশলগতভাবে যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জয়-পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে। আইসিস-সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো দীর্ঘমেয়াদি—এ কথা যারা আগেই বুঝতে পেরেছিল তাদের পরিণতি সুখকর হয়নি। ২০১৪ সালের অক্টোবরে ডিফেন্স সেক্রেটারি চাক হেগেল ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে দুই পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, এতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিরিয়ানীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী মাসের শেষ

দিকে তাঁকে ডিফেন্স সেক্রেটারি পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। কারণ তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, আসাদকে মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের লাগাতার ব্যর্থতা আইসিসের লাভের পাল্লাই শুধু ভারী করবে, আসাদকেও লাভবান করবে। আসাদ সরকারের সদস্যদের সম্পর্কে ওবামা প্রশাসনের মত ছিল—সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। তাদের মূল্যায়ন অবশ্য সঠিক ছিল।

'সবচেয়ে অ্যামেজিং বিষয় হচ্ছে, আমরা একই ভুল বারবার করে যাচ্ছি। শুধু ইরাকে নয়, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যে,' আলি খিদিরি আমাদের বলছিলেন। 'আমি সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তাদের দেখেছি, কবার এয়ারস্ট্রাইক হলো, সেসব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ "টুইট" করে সময় নষ্ট করতে। এসব সংখ্যায় কার কী আসে-যায়? সুন্নিরা ক্রমাগত ব্যাপকহারে কট্টরপন্থার দিকে ঝুঁকছে। কাউন্টার টেরোরিজম স্ট্র্যাটেজি আইসিসের নিকট মার খেয়ে যাচ্ছে। ইরাকে দেখতে পাচ্ছি, সিরিয়াতেও এমনই দেখব।'

অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল বেড়েই চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানগুলো সিরিয়ার আইসিস অবস্থানে বোম্বিং শুরু করতে না করতেই আমেরিকার মদদপুষ্ট বিদ্রোহী দলগুলো এই অভিযানের একদেশদর্শিতা নিয়ে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে। 'এই বিদেশি আগ্রাসনে একমাত্র লাভবান হবে আসাদ সরকার। বিশেষত, যখন তাকে পদচ্যুত করার কার্যকর কোনো কৌশল অনুপস্থিত,' ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে হারাকাত হাজম নামের টুইটার অ্যাকাউন্টের পোস্ট। 'গত শুক্রবার প্রথমবারের মতো আসাদবিরোধীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পুড়িয়েছে,' সিরিয়ায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেছেন। ওবামা প্রশাসনের সিরিয়া পলিসির প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছেন। সময়টা ছিল ২০১৪ সালের অক্টোবর।

সিরিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু শুধু আইসিসই ছিল না, জাবহাতুন নুসরাও ছিল। ইদলিবের কাফর দারিয়ান শহরেও যুক্তরাষ্ট্র বিমান হামলা চালিয়েছে। শহরটি মূলত সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল। মার্কিনিদের যুক্তি হচ্ছে, তারা মূলত আন নুসরার সাব-ইউনিট খোরসান গ্রুপের এক সামরিক স্থাপনার ওপর হামলা চালাতে চেয়েছিল। তাদের আরও অভিযোগ, এই খোরাসান গ্রুপ নাকি 'পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুতে' হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল!

এসব কর্মকাণ্ড সিরিয়ানদের মার্কিনবিরোধী ক্রোধ বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই করেনি। বিদ্রোহীদের একজন মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট বলেছে, 'যদি এই হামলা সরকারি স্থাপনার ওপর হতো, তাতে এই বিশাল সংখ্যক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হতো, তবু আমরা না-হয় সান্ত্বনা নিতাম যে এরা দেশের মুক্তির জন্য বলি হয়েছে।' এই হামলার ফলে আন নুসরাও লাভবান হয়েছে। তারা আইসিসের সঙ্গে

জোট বেঁধে স্থানীয়ভাবে অনেক আক্রমণ চালিয়েছে মার্কিন সমর্থিত বিদ্রোহীদের ওপর। মার্কিন সমর্থিত এসব গ্রুপের ব্র্যান্ডিংও হয়ে গেছে—পেন্টাগনের ভাড়াটে খুনি।

আইসিসের মোকাবিলায় প্রতিবছর পাঁচ হাজার বিদ্রোহী যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মার্কিন পরিকল্পনা ২০১৫ সালের বসন্ত নাগাদ শুরু হয়নি, কিন্তু এর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে পড়তে শুরু করেছে। তবে এটা সত্য যে আইসিসের সঙ্গে নুসরার আনুষ্ঠানিক গাঁটছড়া বাধার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। আইসিস আন নুসরাকে আহ্বান জানিয়েছে সিরিয়ায় 'ক্রুসেডার', যৌথ শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার। পাশাপাশি পশ্চিমে আল কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলার সাম্প্রতিক কার্যক্রমকে উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছে।

২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি সাইদ ও শরিফ কোচি নামের ফরাসি দুই ভাই শার্লি হেবদোতে আক্রমণ চালিয়েছে, সাংবাদিক ও কার্টুনিস্টদের হত্যা করেছে। দুই দিন পর ভ্রাতৃদ্বয়ের এক অনুসারী, আহমেদ কুলিবালি, একই শহরে হাইপারক্যাশার সুপারশপে আক্রমণ চালিয়ে চারজনকে হত্যা করেছে। ফ্রেঞ্চ পুলিশ পরে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

কোচি ভ্রাতৃদ্বয় একিউআইর এক শাখার সঙ্গে জড়িত ছিল, যাদের কাজ ছিল বিপ্লবের শুরুর দিকে লোকবল সরবরাহ করা। জারকাবির মতোই তারা সর্বপ্রথম এক মসজিদে, তারপর জেলখানায় কট্টরপন্থার দীক্ষা পেয়েছে। তারা আল মাকদিসি অধ্যয়ন করেছে। জারকাবির দলে যোগ দেওয়ার আগেই শরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কুলিবালিও জারকাবির স্থলাভিষিক্ত আল বাগদাদির আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছিল।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছে, ইউরোপ এবং পর্যায়ক্রমে আমেরিকার পথঘাট দুই জিহাদি গ্রুপের প্রতিযোগিতার রক্তাক্ত রঙ্গভূমিতে পরিণত হচ্ছে কি না—একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আগ্রাসনের ১১ বছরেরও অধিক সময় পর এখন নতুন বিদ্রোহ জেগে উঠেছে, যারা বহুমুখী যুদ্ধে পারঙ্গম, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম ও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সাদ্দাম ও জারকাবির যৌথ উত্তরসূরি—আইসিস নিজেদের সংগ্রামকে বিশ্ব-ইতিহাসের আলোকে বৈধতা প্রদানে অতীতের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা মৃত্যু ও ইসলামের প্রাচীন শৌর্য—দুটোরই স্বপ্ন দেখায়। হাজার হাজার মানুষ এতে যোগ দিতে উন্মুখ, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক এদের পীড়নে বিমুখ।

আর্মি অব টেরর আমাদের সাথেই থাকবে, নিঃসন্দেহে।